রুশদেশের উপকথা

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

Русские народные сказки

ИЗДАТЕЛЬСТВО "РАДУГА"
МОСКВА

রুশদেশের উপকথা

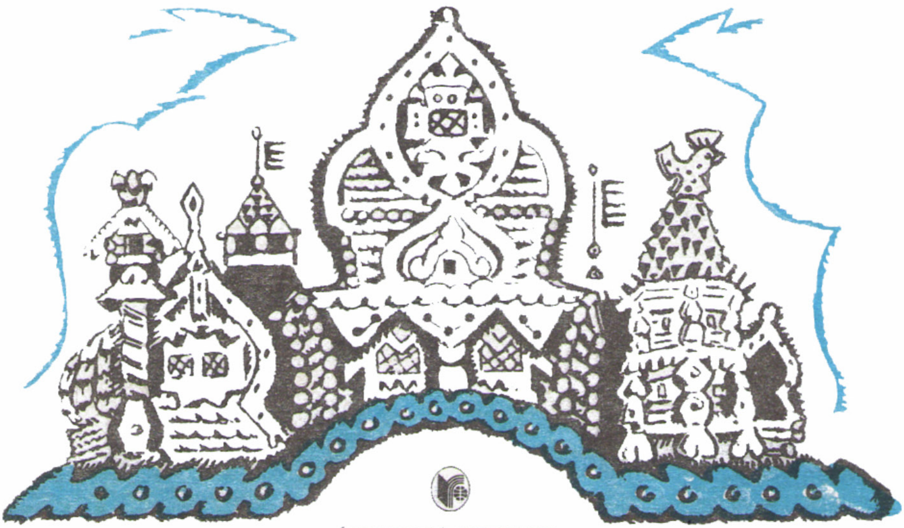

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: সুপ্রিয়া ঘোষ

সম্পাদনা: ননী ভৌমিক

চিত্রাঙ্কন: ত. আ. মাভ্রিনা ও ক. ভ. কুজ্নেৎসভ

অঙ্গসজ্জা: ত. আ. মাভ্রিনা

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

На языке бенгали

RUSSIAN FOLK TALES

In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Р $\frac{4803000000-422}{031(05)-86}$ без объявления.

ISBN 5-05-001557-X

সূচী

ভূমিকা ৭
গোল রুটি ১৩
সীম বীচি ১৮
হলদে-ঝুটি মোরগটি ২১
শেয়াল আর নেকড়ে ২৬
শেয়াল আর সারস ৩০
কেঠো পা ভালুক ৩২
চাষী আর ভালুক ৩৫
শীতের বাসা . . . ৩৭
সেয়ানা চাষী ৪৩
সাত-বছুরে ৪৮
কুড়ুলের জাউ ৫৩
যমরাজ আর সৈনিক ৫৫
গপ্পী-বৌ ৬৯
জমিদারের সঙ্গে কাঙালের ভোজন ৭৪
অভাব ৭৭
বরফ-বুড়ো ৮৪
রাজহাঁস আর ছোট মেয়ে ৮৯
হাভ্রোশেচ্কা ৯৩
আলিওনুশকা বোন আর ইভানুশকা ভাই ৯৭

ব্যাঙ রাজকুমারী ১০২
যাদুকরী ভাসিলিসার কথা . ১১১
ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত ১৩০
সিভ্‌কা-বুর্কা ১৪১
রাজপুত্র ইভান আর পাঁশুটে নেকড়ে ১৪৯
অ-জানি দেশের না-জানি কী ১৫৮
ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান ১৮১
মাছের আজ্ঞায় ২০৮
নিকিতা কজেম্যাকা ২১৯
ইলিয়া মুরমেৎসের প্রথম অভিযান ২২২
ইলিয়া মুরমেৎস আর শিসে-ডাকাত সলভেই . . ২২৭
দব্রীন্যা নিকিতিচ আর জ্মেই গরীনীচ ২৩৩
আলিওশা পপোভিচ ২৪৩
মিকুলা সেল্যানিনভিচ ২৪৮

ভূমিকা

তোমরা যখন ছোট ছিলে, খুব ছোট, যখন লিখতে পড়তে কিছুই শেখনি, তখন মা ঠাকুরমার কোলে বসে রূপকথা শুনতে নিশ্চয়ই খুব ভালবাসতে।

এখন তোমরা বড় হয়েছ। তবু সেই তোমাদের প্রিয় রূপকথার ভদ্র ও নির্ভয় আর হাসিখুশি সব বন্ধু নায়কদের সঙ্গে যোগ হয়ত একেবারে হারিয়ে ফেলোনি। বইয়ের পাতায় ছবির পর্দায় বা রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই তাদের সঙ্গে দেখা হয়।

বড়ো হয়ে তোমরা জেনেছ, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব রূপকথা আছে। বিভিন্ন দেশের রূপকথার মধ্যে যেমন মিল অনেক তেমনি তফাৎও প্রচুর। ভারতীয়, ইংরেজী, রুশী, জার্মান, ফরাসী, চীনে রূপকথার পার্থক্য খুব সহজেই ধরা যায়। কেননা সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং যে দেশে গল্পগুলি জন্মলাভ করে পুরুষানুক্রমে হাতবদলের ফলে বর্তমান আকৃতি লাভ করেছে, রূপকথায় যে সব কিছুর সুস্পষ্ট ছাপ থেকে যায়। ছোটবেলায় তোমরা নিজেরাই যে সব রূপকথা শুনেছ, আমার তো মনে হয় তোমরা যখন অনেক বড় হবে, তখন তোমাদের ছেলেমেয়েদেরও সেই সব রূপকথাই শোনাবে।

রুশদেশের লোকেরা অসংখ্য গাথা, নীতিকথা, সূক্ষ্ম হেঁয়ালি আর চমৎকার চমৎকার রূপকথা রচনা করেছে।

এই সব কাহিনী পড়তে পড়তে দেখবে, যারা কাহিনী বলছে তাদের কেউ থাকে দুরন্ত নদীর পাড়ে, কেউবা বিস্তীর্ণ স্তেপ অঞ্চলে, কারও বাস সুউচ্চ পাহাড়ে, কারওবা ভীষণ গহন বনে।

এই সব কাহিনীর বেশির ভাগই যখন প্রথম বলা হয়েছিল, তারপর বহু শতাব্দী পার হয়ে গেছে। যারা কাহিনী বলেছে তারা তাদের পছন্দমত, তাদের ইচ্ছানুসারে এদিক ওদিক বাড়িয়ে নতুন কিছু যোগ করে নতুন রূপ দিয়েছে। কাহিনীগুলো যত পুরোনো হয়েছে, ততই বেশি মনোগ্রাহী হয়েছে, আর তাদের শিল্পগুণও বেড়েছে। শত শত বছর ধরে লোকেরা মেজে ঘসে তুলির নানা টানে এদের একেবারে নিখুঁত করে তুলেছে।

এই সব কাহিনীর মধ্যে এমন সব কাব্য রসের পরশ আছে যার টানে রুশদেশের বড় বড় সাহিত্যিক, শিল্পী অথবা সঙ্গীতজ্ঞ এ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। রুশদেশের বিখ্যাত কবি আলেক্সান্দ্র সের্গেয়েভিচ পুশকিন (১৭৯৯—১৮৩৭) তাঁর বুড়ী দাইমার কাছে এসব কাহিনী শুনতে খুব ভালবাসতেন। পুশকিন বলেছেন, ‘কী অপরূপ এই রূপকথা! প্রত্যেকটি যেন এক একটি কবিতা।’

রুশদেশের উপকথায় যেমন বিষয়বৈচিত্র্য তেমনি প্রকাশবৈচিত্র্য। রুশী শিশুরা জীবজন্তুর গল্প অনেক জানে। এই জীবজন্তুর গল্পগুলো অনেককাল আগে শিকারীরা রচনা করেছে, তারা বনের জীবজন্তুকে ভাল করে চিনেছিল, দেখেছিল তাদের প্রত্যেকেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব আছে। এই গল্পগুলি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে নীতিকথার মতো। তাতে রূপকের আকারে মানুষের লোভ, ধূর্তামি, নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতি নানা দোষ ও দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

সবচেয়ে কাব্যময় আর আনন্দের হল রূপকথাগুলো। এরা আমাদের অপরূপ কল্পনার জগতে নিয়ে যায়। মনে হয় এই সব রূপকথার ভিত্তি কেবল কল্পনা আর স্বপ্ন। অমঙ্গলের বাহনদের সঙ্গে এই সব রূপকথার যে বীর নায়করা যুদ্ধ করেছেন, তাঁরা কেউই সাধারণ জগতের নিয়মে বাঁধা নন। কিন্তু তবু এই সব কিছুর ভিতরে মানুষের সত্যিকার স্বপ্ন ফুটে উঠেছে। এই রূপকথাগুলির বীর নায়কেরা লোকপ্রচলিত আদর্শের মূর্তি। তাঁরা সবসময়ই নির্ভীক, দুঃসাহসী, মহৎ অমঙ্গলকে তাঁরা জয় করবেনই। রুশ কাহিনীকাররা খুব ভালোবাসেন ঘরোয়া গল্প ও চুটকি।

এইসব উপকথা যে কালে জন্ম নিয়েছে তখন মালিকরা তাদের গোলাম চাষীদের নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারত। বিক্রী করতে পারত, সৈন্যদলে পাঠাতে পারত, কিম্বা ইচ্ছা হলে একটা শিকারী কুকুরের সঙ্গে বদল দিতে পারত। কিন্তু তবুও দেখা যায় গরীব চাষী ও সৈন্যরা সবসময় তাদের নিষ্ঠুর লোভী নির্বুদ্ধি প্রভু আর তার খামখেয়ালী স্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত জব্দ করে ছেড়েছে।

এই বইটিতে তোমরা এই সব গল্পই পড়বে।

এছাড়া কয়েকটি বীলীনাও পড়তে পাবে। প্রাচীন রুশ মহাকাব্যগুলি এই নামে অভিহিত। এদের একটা অদ্ভুত ধীর ছন্দ আছে। এখনও সোভিয়েতের সুদূর উত্তরের কোন কোন লোকেরা এই সব গাথা গেয়ে বেড়ায়। এই সব বীলীনায় বলা হয়েছে রুশ বীর বগাতীরদের কথা, যারা তাদের মাতৃভূমিকে সাহসের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে রক্ষা করে এসেছে।

উপকথা পড়তে ছোটদের চেয়ে বড়রাও কিছু কম ভালবাসে না। কারণ এইসব গল্পের ভাষার সৌন্দর্য, নায়কদের মোহনীয়তায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না তাদের মর্মবাণীতে—কেননা এই সব গল্প দেশকে ভালবাসতে শেখায়, সাধারণ মানুষের শক্তিতে আস্থা রাখতে বলে, উন্নত ভবিষ্যত এবং মন্দের উপর ভালর জয়ের প্রত্যয় গড়ে তোলে।

এ. পমেরান্ত্‌সেভা

রুশদেশের
উপকথা

গোল রুটি

এক ছিল বুড়ো আর এক বুড়ী।

একদিন বুড়ীকে বুড়ো ডেকে বলল:

'ও বুড়ী একবার হাঁড়িটা চেঁছে, ময়দার টিন ঝেড়ে বেছে দেখ না, একটু ময়দা পাস কিনা। একটা গোল রুটি করে দিবি?'

বুড়ী তখন একটা মোরগের পাখনা নিয়ে বসে গেল। হাঁড়ি চেঁছে, ময়দার টিন ঝেড়ে, কোনরকমে দু'মুঠো ময়দা বের করল।

ময়ান দিয়ে বুড়ী ময়দাটুকু ঠাসল। তারপর সুন্দর গোল একটা রুটি তৈরী করে, ঘিয়ে ভেজে, রেখে দিল জানলার ওপরে জুড়বার জন্যে।

গোল রুটি আছে, আছে, হঠাৎ গড় গড় গড়—গড়াতে শুরু করল—জানলা থেকে বেঞ্চি, বেঞ্চি থেকে মেঝে, মেঝে থেকে গড়িয়ে দরজার কাছে এসে একলাফে চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে সোজা বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি পেরিয়ে উঠোন, উঠোন পেরিয়ে ফটক, চলল তো চললই।

গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক খরগোসের সঙ্গে। খরগোস বলল:

'গোল রুটি, গোল রুটি, তোকে আমি খাব!'

গোল রুটি বলল, 'খাস না খরগোস, বরং গান গাই শোন্:

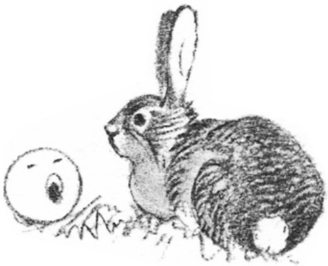

ছোট্ট গোল রুটি,
চলছি গুটিগুটি,
গমের ধামা চেঁছে,
ময়দার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,
ঘি দিয়ে ভেজে,
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই।
বুড়ো পেল না,
বুড়ী পেল না,
খরগোস, তুইও পাবি না!'

খরগোস চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলে গেল বহুদূর।

গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক নেকড়ের সঙ্গে।

'গোল রুটি, গোল রুটি, তোকে আমি খাব!'

'পাঁশুটে নেকড়ে, খাস না, গান গাই শোন্:

ছোট্ট গোল রুটি,
চলছি গুটিগুটি,
গমের ধামা চেঁছে,
ময়দার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,

ঘি দিয়ে ভেজে,
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই।
বুড়ো পেল না,
বুড়ী পেল না,
খরগোস পেল না,
ওরে নেকড়ে, তুইও পাবি না!'

নেকড়ের চোখের পলক পড়তে না পড়তেই গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলে গেল বহুদূর।

গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক ভালুকের সঙ্গে।

'গোল রুটি, গোল রুটি, তোকে আমি খাব!'

'ওরে ট্যারা-থাবা ভালুক, আমায় খাওয়া তোর কম্ম নয়!

ছোট্ট গোল রুটি,
চলছি গুটিগুটি,
গমের ধামা চেঁছে,
ময়দার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,
ঘি দিয়ে ভেজে,
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই।
বুড়ো পেল না,
বুড়ী পেল না,
খরগোস পেল না,
নেকড়ে পেল না,
ভালুক, তুইও পাবি না!'

ভালুকের চোখের পলক পড়তে না পড়তেই গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলে গেল বহুদূর।

গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক শেয়ালের সঙ্গে।

'গোল রুটি, গোল রুটি বল্ তো, গড়িয়ে গড়িয়ে চললি কোথায়?'

'চলেছি রাস্তা বেয়ে।'

'তা বেশ, কিন্তু একটা গান শুনিয়ে যা না ভাই!'

গোল রুটি গান সুরু করল:

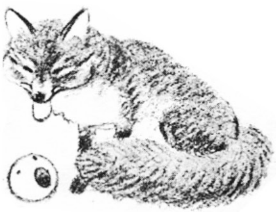

'ছোট্ট গোল রুটি,
চলছি গুটিগুটি,
গমের ধামা চেঁছে,
ময়দার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,
ঘি দিয়ে ভেজে,
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই।
বুড়ো পেল না,
বুড়ী পেল না,
খরগোস পেল না,
নেকড়ে পেল না,
ভালুক পেল না;
সেয়ানা শেয়াল, তুইও পাবি না!'

শেয়াল বলল, 'বা! খাসা গান! কিন্তু দুঃখের কথা কী বলব ভাই, কানে ভাল শুনতে না পাই! এক কাজ কর্, আমার নাকে বসে, গান ধর্ কষে।'

এক লাফে শেয়ালের নাকে চড়ে বসল গোল রুটি। তারপর জোর গলায় গান ধরল।

শেয়াল তবু আবার বলে:

‘গোল রুটি, গোল রুটি, একটু বসে জিভের ’পরে, শেষবারটি শুনিয়ে দে রে।’

গোল রুটি এক লাফে গিয়ে বসল একেবারে শেয়ালের জিভের ওপর — ব্যস্ — শেয়ালও অমনি খেয়ে ফেলল।

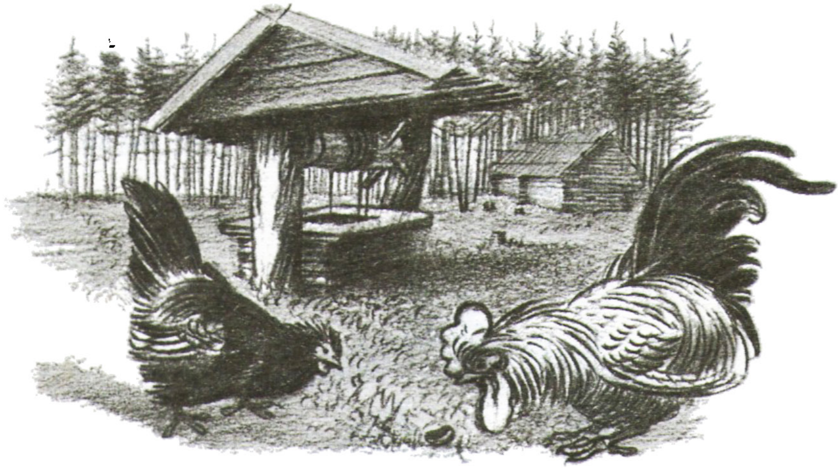

সীম বীচি

এক ছিল মোরগ আর মুরগী। খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে মোরগ, খুঁটে তুলল সীমের বীচি।

'কক্-কক্-কক্, গিন্নী, বীচি খাবি আয়!'

'কক্-কক্-কক্, মোরগ, তুই-ই খা!'

সীমের বিচি খেলে মোরগ কিন্তু গলায় গেল আটকে। তখন মোরগ-গিন্নীকে ডেকে বলল:

'গিন্নী, নদীকে গিয়ে বল আমায় একটু জল দিতে।'

মোরগ-গিন্নী দৌড়োল নদীর কাছে।

'নদী, নদী, একটু জল দাও না? মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে গেছে।'

নদী বলল:

‘আগে লাইম গাছের কাছে যাও, একটা পাতা চেয়ে আনো, তবে জল দেব।’

মোরগ-গিন্নী দৌড়োল লাইম গাছের কাছে।

‘লাইম গাছ, ও লাইম গাছ, একটা পাতা দাও না? পাতা নিয়ে নদীকে দেব, নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে, মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে গেছে।’

লাইম গাছ বলল:

‘আগে চাষীমেয়ের কাছে যাও, একগাছি সুতো চেয়ে আনো, তবে পাতা দেব।’

মোরগ-গিন্নী ছুটল চাষীমেয়ের কাছে।

‘চাষীমেয়ে, চাষীমেয়ে, একগাছি সুতো দাও না? সুতো নিয়ে লাইম গাছকে দেব, তবে লাইম গাছ পাতা দেবে। পাতা নদীকে দেব, তবে নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে, মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে গেছে।’

চাষীমেয়ে বলল:

‘আগে চিরুনিওয়ালার কাছে যাও, একটা চিরুনি নিয়ে এস, তবে সুতো দেব।’

মোরগ-গিন্নী ছুটল চিরুনিওয়ালার কাছে।

‘চিরুনিওয়ালা, ও চিরুনিওয়ালা, একটা চিরুনি দাও না? চিরুনি দেব চাষীমেয়েকে, তবে চাষীমেয়ে সুতো দেবে। সুতো দেব লাইম গাছকে, তবে লাইম গাছ পাতা দেবে। পাতা দেব নদীকে, নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে, মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে গেছে।’

চিরুনিওয়ালা বলল:

‘আগে রুটিওয়ালার কাছে যাও, একটা রুটি এনে দাও, তবে পাবে চিরুনি।’

মোরগ-গিন্নী ছুটল রুটিওয়ালার কাছে।

‘রুটিওয়ালা, ও রুটিওয়ালা, আমায় একটা রুটি দাও না? রুটি নিয়ে চিরুনিওয়ালাকে দেব, তবে চিরুনিওয়ালা চিরুনি দেবে। চিরুনি দেব চাষীমেয়েকে, তবে চাষীমেয়ে সুতো দেবে। সুতো দেব লাইম গাছকে, তবে

লাইম গাছ পাতা দেবে। পাতা দেব নদীকে, নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে, মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে গেছে।'

রুটিওয়ালা বলল:

'আগে কাঠুরের কাছে যাও, জ্বালানি কাঠ এনে দাও, তবে রুটি দেব।'

মোরগ-গিন্নী ছুটল কাঠুরের কাছে।

'কাঠুরে, ও কাঠুরে, একটু জ্বালানি কাঠ দাও না? জ্বালানি দেব রুটিওয়ালাকে, তবে রুটিওয়ালা রুটি দেবে। রুটি দেব চিরুনিওয়ালাকে, তবে চিরুনিওয়ালা চিরুনি দেবে। চিরুনি দেব চাষীমেয়েকে, তবে চাষীমেয়ে সুতো দেবে। সুতো দেব লাইম গাছকে, তবে লাইম গাছ পাতা দেবে। পাতা দেব নদীকে, নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে, মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে গেছে।'

মোরগ-গিন্নীকে কাঠ দিল কাঠুরে।

মোরগ-গিন্নী কাঠ নিয়ে গেল রুটিওয়ালার কাছে। রুটিওয়ালা রুটি দিল। রুটি পেয়ে চিরুনিওয়ালা চিরুনি দিল। চিরুনি পেয়ে চাষীমেয়ে সুতো দিল। সুতো পেয়ে লাইম গাছ পাতা দিল। পাতা পেয়ে নদী মোরগের জন্যে একটু জল দিল।

মোরগ জল খেল। সীম বীচি নেমে গেল।

মোরগ ডেকে উঠল:

'কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ!'

হলদে-ঝুঁটি মোরগটি

এক বেড়াল, এক শালিক আর এক হলদে-ঝুঁটি মোরগটি। ছিল তারা একই বনে, একই কুঁড়েয়। বেড়াল?শালিক গভীর বনে চলে যায় কাঠ আনতে, মোরগ বাড়ীতে থাকে একা। বেরবার আগে ওরা মোরগকে সাবধান করে দেয়:

‘আমরা দূরে চলে যাচ্ছি। তুই ঘর দোর দেখিস। কিন্তু সাবধান টুঁ শব্দটি করবি না। আর শেয়াল এলে জানলা দিয়ে আবার মাথা বের করিস না।’

শেয়াল যেই দেখে বেড়াল আর শালিক বেরিয়ে গেছে, অমনি মোরগের জানলার নীচে গিয়ে গান জোড়ে:

'হলদে ঝঁুটি, হলদে ঝঁুটি,
বাহারে মোর মোরগটি,
তেল-চক্-চক্ তোমার গা,
রেশমী তোমার দাড়ীটা,
জানলা দিয়ে মুখ বাড়াও,
মটরশুঁটি নিয়ে নাও।'

গান শুনে মোরগ যেই মুখ বের করেছে, অমনি শেয়াল খ্যাঁক করে ধরে নিয়ে চলল নিজের গর্তে।

ছোট্ট মোরগ চীৎকার করে কাঁদতে লাগল:

'শেয়ালে নিল ধ-রে
গহন বন পা-রে,
খর নদীর ধা-রে,
খাড়া পাহাড় ঘু-রে...
ও শালিক, ও বেড়াল রে,
আয় না বাঁচা মো-রে!'

মোরগের কান্না কানে যেতেই বেড়াল আর শালিক শেয়ালের পেছনে ছুটল। মোরগকে ছিনিয়ে আনল শেয়ালের হাত থেকে।

আবার বেড়াল আর শালিক কাঠ কাটতে গেল। আবার মোরগকে সাবধান করল:

'দেখ বাপু মুরগীর পো, আজ আবার যেন মুখ বের করিস না। আজ আমরা আরও দূরে যাব, হয়ত তোর ডাক শুনতেই পাব না।'

বেড়াল আর শালিক বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, অমনি শেয়াল বাড়ীর কাছে গিয়ে গান ধরল:

'হলদে ঝুঁটি, হলদে ঝুঁটি,
বাহারে মোর মোরগটি,
তেল-চক্-চক্ তোমার গা,
রেশমী তোমার দাড়ীটা,
জানলা দিয়ে মুখ বাড়াও,
মটরশুঁটি নিয়ে নাও।'

মোরগ কিন্তু চুপটি করেই বসে রইল। তাই শেয়াল ফের গান ধরল:

'ছেলেমেয়েরা এ পথ দিয়ে দৌড়ে গিয়েছে,
দৌড়ে যেতে গমগুলো সব ছড়িয়ে পড়েছে।
মুরগীর দল খুঁটে খুঁটে খেতে লেগেছে,
মুরগীর দল মোরগদের বাদ দিয়েছে...'

মোরগ জানলা দিয়ে মুখ বের করে বলল:

'কক্ কক্ কক্! বাদ দেবে কেন?'

আর অমনি শেয়াল ওকে খ্যাঁক করে ধরে নিয়ে চলল নিজের গর্তে। মোরগ চীৎকার করে কান্না জুড়ল:

'শেয়ালে নিল ধ-রে
গহন বন পা-রে,
খর নদীর ধা-রে,
খাড়া পাহাড় ঘু-রে...
ও শালিক, ও বেড়াল রে,
আয় না বাঁচা মো-রে!'

মোরগের কান্না কানে পৌঁছতেই শালিক আর বেড়াল শেয়ালের পিছনে ছুটল। বেড়াল মাটিতে ছোটে, শালিক বাতাসে ওড়ে... শেয়ালকে ধরে বেড়াল আঁচড়ায়, শালিক ঠোকরায়, কেড়ে নিল মোরগকে।

দিন যায়, ফের আবার শালিক বেড়াল গভীর বনে কাঠ কাটতে যাবার জন্যে তৈরী হল। যাবার আগে মোরগকে ওরা অনেক সাবধান করে দিল:

'শেয়ালের কথা শুনিস না, মুখ বের করিস না। আজ আমরা আরও দূরে যাব। চেঁচালে শুনতেও পাব না।'

এই বলে শালিক আর বেড়াল বনে কাঠ কাটতে চলে গেল অনেক দূরে। এদিকে শেয়ালও এসে জানলার নীচে বসে বসে গান ধরল:

'হলদে ঝুঁটি, হলদে ঝুঁটি,
বাহারে মোর মোরগটি,
তেল-চক্-চক্ তোমার গা,
রেশমী তোমার দাড়ীটা,
জানলা দিয়ে মুখ বাড়াও,
মটরশুঁটি নিয়ে নাও।'

মোরগ তবু চুপ করে বসে রইল। তাই শেয়াল আর একটা গান ধরল:

'ছেলেমেয়েরা এ পথ দিয়ে দৌড়ে গিয়েছে,
দৌড়ে যেতে গমগুলো সব ছড়িয়ে পড়েছে।
মুরগীর দল খুঁটে খুঁটে খেতে লেগেছে,
মুরগীর দল মোরগদের বাদ দিয়েছে...'

তবু চুপটি করে বসে রইল মোরগটি। শেয়াল তাই ফের গান ধরল:

'লোকজনরা এ পথ দিয়ে চলে গিয়েছে,
যেতে যেতে বাদামগুলো ছড়িয়ে পড়েছে।
মুরগীর দল খুঁটে খুঁটে খেতে লেগেছে,
মুরগীর দল মোরগদের বাদ দিয়েছে...

মোরগ তখন জানলা দিয়ে মুখ বের করে বলল:

'কক্ কক্ কক্! বাদ দেবে কেন?'

ব্যস্! অমনি শেয়াল খ্যাঁক করে ধরে গহন বনের পারে, খর নদীর ধারে, খাড়া পাহাড় ঘুরে নিজের গর্তে নিয়ে গেল ওকে...

মোরগ যত ডাকে যত চেঁচায়, শালিক আর বেড়াল কিন্তু কিছু শুনতে পায় না। যখন বাড়ী ফিরল তখন দেখে মোরগ নেই।

শালিক আর বেড়াল তখন চলল শেয়ালের পায়ের দাগ ধরে ধরে। বেড়াল মাটিতে ছোটে, শালিক বাতাসে ওড়ে... শেষকালে তো শেয়ালের গর্তে পেঁছিল ওরা। বেড়াল বাজনা বাজিয়ে গান আরম্ভ করল:

'ত্রিম্ ব্রিম বাজনদার,
বোল তুলেছে সোনার তার...
শেয়াল-বোন কি আছে ঘরে
গুটি সুটি কোটর জুড়ে?'

গান শুনে শেয়াল ভাবল, "কে রে এত ভাল বাজনা বাজায়, এমন মিষ্টি করে গায়! দেখি তো!"

গর্ত ছেড়ে বাইরে এল শেয়াল। অমনি শালিক আর বেড়াল শেয়ালকে ধরে একেবারে মারণ আর ঠোকন। শেয়ালও ভোঁ ভোঁ দৌড়।

শালিক আর বেড়াল তখন মোরগকে চুপড়ির মধ্যে বসিয়ে বয়ে নিয়ে এল বাড়ীতে।

তারপর থেকে তারা সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল, এখনো করছে।

শেয়াল আর নেকড়ে

এক ছিল বুড়ো আর এক বুড়ী। একদিন বুড়ো বুড়ীকে বলল:

'বুড়ী, কটা পিঠে করে দে। আমি ততক্ষণ ঘোড়া স্লেজে জুতে ফেলি। মাছ ধরতে যাব।'

অনেক মাছ ধরল বুড়ো। একেবারে মাছে ভরা স্লেজ। বাড়ী ফেরার পথে হঠাৎ দেখে এক শেয়াল: পুঁটলির মতো গুটিয়ে রাস্তায় শুয়ে।

স্লেজ থেকে নেমে বুড়ো গেল শেয়ালের কাছে, শেয়াল কিন্তু একটুও নড়ে না, মড়ার মত পড়ে রইল।

''কপাল ভালো! বুড়ীর গরম কোটের কলার করা যাবে খাসা।''

এই ভেবে বুড়ো শেয়ালটাকে স্লেজে চাপাল, নিজে চলল আগে আগে।

শেয়াল দেখল এই সুযোগ। চুপিচুপি স্লেজ থেকে একটি একটি করে মাছ ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। একটার পর একটা, ফেলে আর ফেলে।

সব মাছ ফেলা হয়ে গেল। শেয়ালও সুট্ করে নেমে গেল।

বাড়ীতে পেঁছেই বুড়ো চীৎকার করে বুড়ীকে ডাকল:

'বৌ, তোর কোটের কলারের জন্যে চমৎকার একটা জিনিস এনেছি!'

বুড়ী তো স্লেজের কাছে গিয়ে দেখে—কিছুই নেই, মাছ না, কলার না, একেবারে ফাঁকা। বুড়ীর সে কী বকুনি!

'ওরে আহাম্মক, ওরে মুখপোড়া, আমাকে নিয়ে রগড়!'

বুড়োর তখন খেয়াল হল শেয়ালটা তো তাহলে মরা ছিল না। ভারি আফশোস হল, কিন্তু কী আর করে! যা হবার সে তো হয়ে গেছে।

এদিকে শেয়াল তো তার রাস্তার সব কটা মাছ একসঙ্গে জড় করে ভোজে বসেছে।

এমন সময় এক নেকড়ে এসে হাজির।

'এই যে দাদা, খেতে বসেছ দেখছি, অতিথ বরণ করো!'

'আমি খাচ্ছি আমার, ভাগ নেই তোমার।'

'দাও না একটা মাছ!'

'নিজে ধরে খাও গে।'

'কিন্তু আমি যে মাছ ধরতে জানি না!'

'ফুঃ! আমি পারলে, তুমিও নিশ্চয়ই পারবে। নদীতে চলে যাও দাদা, বরফের গর্তে লেজ ঢুকিয়ে বসে বলবে: ''এই মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে পড়! এই মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে পড়!'' অমনি মাছও তোমার লেজ চেপে ধরবে। যত বসে থাকবে তত মাছ পাবে।'

নেকড়ে চলল নদীর পাড়ে। বরফের গর্তে লেজ ঢুকিয়ে জাঁকিয়ে বসে কেবলি বলতে থাকল:

'এই মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে পড়!
এই মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে পড়!'

আর শেয়াল নেকড়ের চারপাশে ঘোরে আর মন্তর পড়ে:

‘আকাশে মিটমিটে তারা তাকিয়ে,
নেকড়ের লেজখানা দে না জমিয়ে!’

নেকড়ে শেয়ালকে জিজ্ঞেস করল:
‘কী বিড়বিড় করছো, দাদা?’
‘তোমার জন্যেই করছি, লেজে অনেক মাছ উঠবে।’
এই বলে শেয়াল আবার ধুয়ো ধরল:

‘আকাশে মিটমিটে তারা তাকিয়ে,
নেকড়ের লেজখানা দে না জমিয়ে!’

সারা রাত অমনি বসে রইল নেকড়ে। লেজও ওর বরফে জমে গেল। ভোর নাগাদ নেকড়ে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু লেজ আর নড়ে না। ভাবল, “দ্যাখো, কত মাছই না ধরেছি — টেনে তোলাই দায়!”

এমন সময় একটি মেয়ে নদীতে এল জল নিতে। নেকড়ে দেখেই সে চীৎকার জুড়ল:

‘নেকড়ে, নেকড়ে! কে আছ, মারবে এস!’

নেকড়ে এদিক ঘোরে, ওদিক ঘোরে, তার লেজ কিন্তু ওঠে না। মেয়েটি তখন বালতি ফেলে রেখে বাঁকটা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মার মার নেকড়েকে, নেকড়ে মার খায় আর হাঁসফাঁস করে। করতে করতে যেই তার লেজটি খসে গেল, অমনি ভোঁ দৌড়।

মনে মনে নেকড়ে ভাবে, “দেখাচ্ছি দাঁড়াও শেয়াল ভায়া, এর প্রতিফল পাবে!”

শেয়াল এদিকে চুপিচুপি গিয়ে ঢুকেছিল ঐ মেয়েটির কুঁড়েঘরে। বারকোশে কিছু ময়দা ঠাসা ছিল। পেট পুরে তা সব খেয়ে, মাথায় কিছুটা মেখে শেয়াল গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল রাস্তায়। পড়ে পড়ে কোঁথায়।

নেকড়ে তাকে দেখে বলল:

'শেয়াল ভায়া, বেশ মাছ ধরা শিখিয়েছিলে যা হোক! এই দেখ আমার সারা গায়ে কালশিটে পড়ে গেছে...'

শেয়াল বলল:

'আরে দাদা, তোমার লেজটা না হয় নাই রইল, মাথাটা তো আছে। কিন্তু আমার যে মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এই দ্যাখো, পিটিয়ে পিটিয়ে ঘিলু বার করে দিয়েছে কেমন। হামাগুড়ি পর্যন্ত দিতে পারছি না।'

নেকড়ে বলল:

'তাই তো দেখছি ভায়া, আহা বেচারী! আমার পিঠে চড়ো, কোথায় যাবে আমি বয়ে নিয়ে যাই।'

শেয়াল তো তাই নেকড়ের পিঠে চেপে বসল। নেকড়ে তাকে বয়ে নিয়ে যায়।

নেকড়ের পিঠে চেপে চলেছে শেয়াল, আর গুনগুনিয়ে গাইছে:

'তাগড়া শেয়াল জাঁকিয়ে বসে
লেজ কাটাটার পিঠে!'

'গুনগুন করে কী বলছ, ভায়া?' নেকড়ে জিজ্ঞেস করল।

শেয়াল বলল:

'ও কিছু নয়। মন্তর পড়ছি। তোমার সব ব্যথা সেরে যাবে।'

এই বলে শেয়াল আবার গান ধরল:

'তাগড়া শেয়াল জাঁকিয়ে বসে
লেজ কাটাটার পিঠে!'

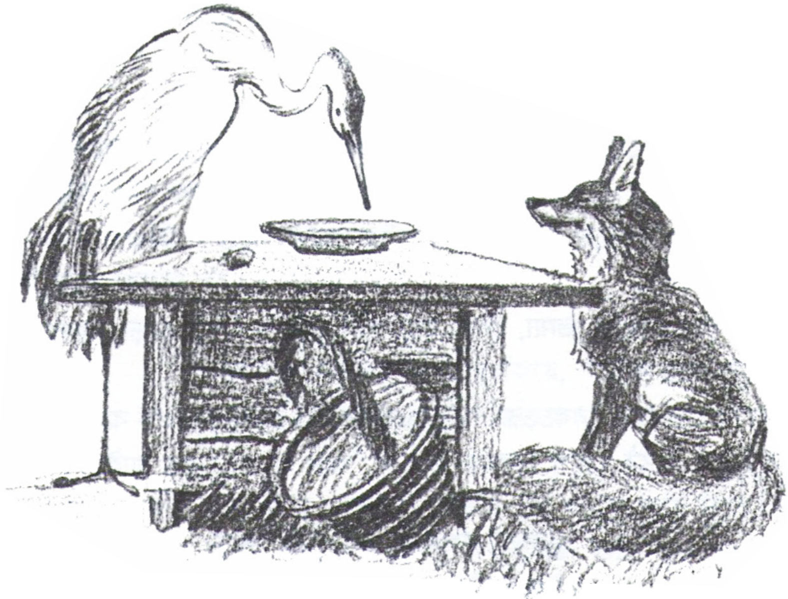

শেয়াল আর সারস

শেয়াল আর সারসে খুব ভাব।

একদিন শেয়াল ভাবল সারসকে নেমন্তন্ন করা যাক।

বলল, 'এসো সই, এসো আমার বাড়ীতে, নেমন্তন্ন রইল!'

সারস তো নেমন্তন্ন খেতে গেল। শেয়াল করল কি, সুজির পায়েস রান্না করে রেকাবে ঢেলে যত্ন করে অতিথিকে খেতে দিল:

'খেয়ে নাও সই, বন্ধু আমার, নিজে হাতে রান্না করেছি।'

সারস লম্বা ছুঁচলো ঠোঁট দিয়ে কেবলি ঠোকর মারে, কিছুই আর গলায় ওঠে না।

ইতিমধ্যে চেটেপুটে সব পায়েস নিজেই শেষ করে দিল শেয়াল।

খেয়ে দেয়ে বলল:

'কিছু মনে করো না সই, পাতে দেবার মতো আর কিছু নেই।'

সারস জবাব দিল:

'ঠিক আছে। ঢের খেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। এবার তুমি এসো আমার বাড়ী, একসঙ্গে খাওয়া যাবে।'

পরদিন শেয়াল গেল সারসের বাড়ী। সারস চমৎকার ঝোল রান্না করেছিল। লম্বা সরুমুখ একটা কলসিতে করে তা খেতে দিল শেয়ালকে:

'খাও সই, খেয়ে নাও! এই সব, আর কিন্তু কিছু নেই।'

কলসির মধ্যে শেয়াল মুখ ঢোকাতে চেষ্টা করল। এদিক থেকে এগোয়, ওদিক থেকে এগোয়, একবার চাটে, একবার শোঁকে, কিন্তু এক ঢোকও খেতে পারল না: কলসির মধ্যে মাথা আর ঢোকে না।

ঠোঁট ঢুকিয়ে সারস কিন্তু সব খেয়ে শেষ করে দিল।

বলল, 'কিছু মনে করো না সই, পাতে দেবার মতো আর কিছু নেই।'

শেয়াল দুঃখে মরে। ভেবেছিল সাতদিনের খাওয়া খেয়ে নেবে, তার বদলে ঘরে ফিরল থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। যেমন কর্ম তেমন ফল!

সেই থেকে শেয়াল সারসের বন্ধুত্ব ঘুচে গেল।

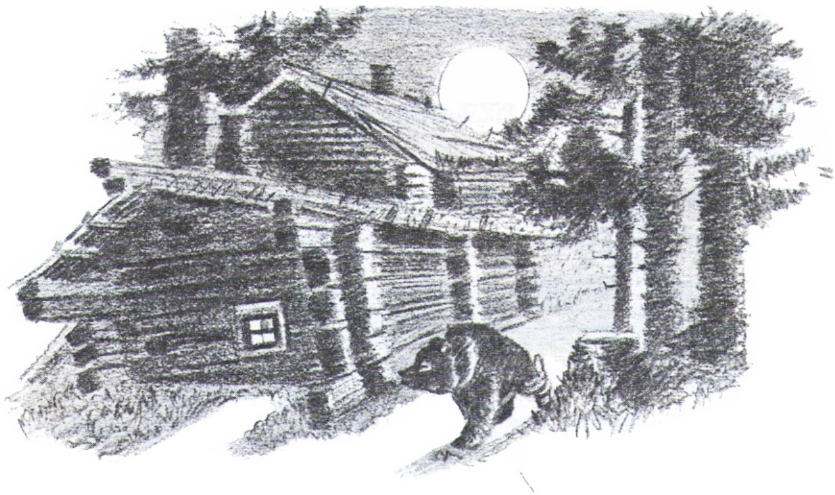

কেঠো পা ভালুক

এক ছিল বুড়ো আর ছিল এক বুড়ী।

বুড়োবুড়ী কিছু শালগম লাগিয়েছিল। ভালুক এসে তা চুরি করে খেত। বুড়ো ক্ষেত দেখতে গিয়ে দেখে, কে যেন শালগম উপড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছে।

বুড়ো বাড়ী এসে বুড়ীকে সব বলল। বুড়ী বলল:

‘কিন্তু কে একাজ করলে? মানুষ হলে শালগমগুলো উপড়ে নিয়ে পালাত। যত নষ্টের গোড়া ঐ ভালুকটারই কাজ। যা বুড়ো, চোরের ওপর নজর রাখিস।’

বুড়ো একটা কুড়ুল নিয়ে চলল, সারা রাত পাহারা দেবে। বেড়ার পাশে চুপটি করে পড়ে রইল বুড়ো। হঠাৎ দেখে, একটা ভালুক এসে শালগমগুলো উপড়াতে লাগল। তারপর বোঝা করে শালগম নিয়ে বেড়া টপকাতে যাবে...

অমনি বুড়ো লাফিয়ে উঠে কুড়ুল ছুঁড়ে ভালুকের একটা ঠ্যাং কেটে নিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

ভালুকটা ডাক ছেড়ে তিন পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বনের দিকে চলে গেল।

কাটা ঠ্যাংটা নিয়ে বুড়ো চলে এল বাড়ীতে। বলল:

'এই নে বৌ, রান্না করিস।'

বুড়ী সেটার ছাল ছাড়িয়ে সিদ্ধ বসিয়ে দিল। তারপর ছাল থেকে লোম ছাড়িয়ে নিয়ে ছালটা পেতে বসে, লোম পাকিয়ে পশম বানাতে লাগল।

বুড়ী পশম বোনে আর ভালুকটা এদিকে একটা কাঠের পা তৈরী করে বুড়োবুড়ীর ওপর শোধ তুলবে বলে বেরিয়ে পড়ল।

ভালুক হাঁটে, কাঠের পা খট্‌খটায়, নিজের মনে গজগজায়:

'গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ গুরুক,
আমি কেঠো পা ভালুক।
চারিদিকে সবে ঘুমিয়ে,
আমি চলি শুধু খুঁড়িয়ে।
বুড়ী হোথা ঐ জাগছে,
আমার গায়ের ছাল পেতে বসে
লোম দিয়ে সুতো কাটছে!
স্পর্ধা দেখছ বুড়ীটার!
আমারি পায়ের মাংস রাঁধছে,
বসে বসে খাবে বুড়ো তার!'

বুড়ী শুনতে পেয়ে বলে:

'বুড়ো, ও বুড়ো, দোরটা দিয়ে দে। ভালুক আসছে...'

ভালুকটা কিন্তু ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে। দরজা খুলে গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করে বলল:

‘গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ গুরুক,
আমি কেঠো পা ভালুক।
চারিদিকে সবে ঘুমিয়ে,
আমি চলি শুধু খুঁড়িয়ে।
বুড়ী হোথা ঐ জাগছে,
আমার গায়ের ছাল পেতে বসে
লোম দিয়ে সুতো কাটছে!
স্পর্ধা দেখছ বুড়ীটার!
আমারি পায়ের মাংস রাঁধছে,
বসে বসে খাবে বুড়ো তার!’

বুড়োবুড়ী তো ভয়ে মরে। বুড়ো মাচার ওপরে গামলার তলায় গিয়ে লুকিয়ে রইল। বুড়ী চুল্লির ওপর।

ভালুকটা ঘরে ঢুকে এখান খোঁজে সেখান খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে পা ফসকে একেবারে তলকুঠরিতে।

তখন পাড়াপড়শী সব দৌড়ে এসে মেরে ফেলল ভালুকটাকে।

চাষী আর ভালুক

এক চাষী একদিন বনে গেল শালগম বুনতে। চাষী লাঙল চালাচ্ছে, এমন সময় এক ভালুক এসে হাজির।

'চাষী, আমি তোর হাড় গুঁড়িয়ে দিই।'

'না ভালুকদাদা, হাড় গুঁড়িয়ে দিও না। তার চেয়ে বরং এসো আমরা দুজনে মিলে শালগম বুনি। আমি কেবল গোড়াটা নেব, তোমায় ডগাটা দেব।'

ভালুক বলল, 'তা বেশ, কিন্তু বাপু যদি ঠকাও, তাহলে আমার চোখে পড়লে আর নিস্তার পাবে না।'

এই বলে ভালুক চলে গেল ঘন বনের মধ্যে।

এদিকে শালগমগুলো বড় হল। শরৎকাল, চাষী চলল শালগম তুলতে। ভালুকটাও অমনি ঘন বন থেকে বেরিয়ে এল। বলল:

'শালগম ভাগ করো চাষী, আমার পাওনা দাও।'

'ঠিক আছে, ভালুকদাদা, গোড়া আমার, ডগা তোমার।'

চাষী ভালুককে কেবল পাতাগুলো দিল। আর নিজে শালগমগুলো গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে সহরে গেল বেচতে।

পথে ভালুকের সঙ্গে দেখা।

'কোথায় যাচ্ছ চাষী?'

'এই সহরে যাচ্ছি ভাই, গোড়াগুলো বেচতে।'

'দেখি, তোমার গোড়াগুলো খেতে কেমন?'

চাষী একটা শালগম দিল। ভালুক শালগমটা মুখে দিয়েই গর্জন করে উঠল:

'এ্যাঁ, তুমি দেখছি আমায় ঠকিয়েছ! গোড়াগুলো তোমার বেশী মিষ্টি। আমার বনে যদি আর কোনোদিন জ্বালানি কাঠ নিতে আসো রক্ষে রাখব না, হাড় গুঁড়িয়ে দেব।'

পরের বছর চাষী আবার ঠিক সেই জায়গাতেই চাষ করল। এবার শালগম নয়, রাই। রাই কাটার সময় হয়েছে। চাষী মাঠে গিয়ে দেখে ভালুক ঠিক হাজির।

বলল, 'এবার বাপু আর আমায় ঠকাতে পারছ না! ভাগ দাও আমার!'

চাষী বলল:

'যো হুকুম। তুমি, ভালুকদাদা, তাহলে গোড়াগুলোই নাও, আমি নেব কেবল ডগাটুকু।'

দুজনে মিলে ফসল তুলল ওরা। গোড়াগুলো সব চাষী দিয়ে দিল ভালুককে। নিজে গাড়ী ভরে রাই নিয়ে গেল বাড়ীতে।

ভালুক গোড়াগুলো চিবোয় আর চিবোয়, কিন্তু বাগে আর আনতে পারে না।

চাষীর ওপর হাড়ে হাড়ে চটে গেল ভালুক। সেই থেকে ভালুক আর চাষীর বনে না।

শীতের বাসা

এক ছিল বুড়ো আর বুড়ী। তাদের একটা ষাঁড়, একটা ভেড়া, একটা হাঁস, একটা মোরগ আর একটা শুয়োর।

বুড়ো একদিন বুড়ীকে বলল:

‘মোরগ পুষে কী আর লাভ হবে, বৌ? তার চেয়ে একটা পরবের দিন দেখে দিই জবাই করে!’

বুড়ী বলল, ‘ভাল কথা, তাই করা যাক।’

মোরগ কিন্তু শুনতে পেয়েছিল। তাই রাত হতেই মোরগ পালিয়ে গেল বনে। পরদিন সকালে বুড়ো আঁতিপাঁতি করে সব খুঁজল। মোরগের চিহ্নও নেই।

সন্ধ্যাবেলা বুড়ো বুড়ীকে আবার বলল:

‘দেখ বৌ, মোরগ তো পেলুম না; শুয়োরটাই মারি!’

বুড়ী বলল, 'তা শুয়োরটাই মার।'

শুয়োর শুনতে পেয়েছিল। রাত হতেই পালিয়ে গেল বনে।

বুড়ো আঁতিপাঁতি করে সব খুঁজল। শুয়োরের চিহ্নও নেই।

বলল, 'ভেড়াটাকেই কাটতে হবে দেখছি!'

'তাই কাট।'

ভেড়া সব শুনে হাঁসকে বলল:

'চল্ আমরা দুজনেই বনে পালাই। নয়ত তোকেও কাটবে, আমাকেও কাটবে।'

ভেড়া আর হাঁস দুজনেই চলে গেল বনে।

বুড়ো উঠোনে এসে দেখে ভেড়াও নেই হাঁসও নেই। বুড়ো আঁতিপাঁতি করে সব খুঁজল। কোথাও পেল না।

'কী অদ্ভুত, সব ক'টা জন্তু পালিয়েছে, ষাঁড়টা কেবল বাকি। শেষ অবধি ওটাকেই কাটতে হবে!'

'কী আর করা, তাই কাট।'

শুনে ষাঁড়ও পালিয়ে গেল বনে।

গ্রীষ্মকালে বনে থাকা তো বেশ সুবিধা। পলাতকরা বেশ আরামেই রইল। কিন্তু গ্রীষ্ম শেষ হয়ে শীত এল।

ষাঁড় গিয়ে ভেড়াকে বলল:

'কী বল ভায়া, শীতকাল তো এসে পড়ল। কাঠের একটা বাড়ী বানাতে হয়।'

ভেড়া জবাব দিল:

'আমার গায়েই তো পশমের কোর্তা আছে। শীতে আমার কিছুই হবে না।'

শুয়োরের কাছে গেল ষাঁড়।

'চল শুয়োর, একটা কাঠের বাড়ী বানিয়ে ফেলি!'

শুয়োর বলল, 'আরে ধ্যুৎ, পড়ুক না শীত কত পড়তে পারে — আমি পরোয়া করি না। মাটি খুঁড়ে তলায় ঢুকব; ব্যস্, বাড়ী ছাড়াই বেশ চলে যাবে।'

হাঁসের কাছে গেল ষাঁড়।

'হাঁস, ও হাঁস, চল একটা কাঠের বাড়ী বানাই!'

'বাড়ীতে আমার কাজ নেই। এক ডানা পেতে শোবো, আরেক ডানায় গা ঢাকব। হাজার বরফেও ঠান্ডা লাগবে না।'

ষাঁড় গেল মোরগের কাছে।

'আয় একটা কাঠের বাড়ী বানাই!'

'বাড়ীতে কী হবে, ফার গাছের তলায় বসেই শীতটা বেশ কেটে যাবে।'

ষাঁড় দেখল, গতিক খারাপ, নিজের পথ তার নিজেকেই দেখতে হয়।

'তোদের ইচ্ছে না থাকে তো বেশ, আমি নিজেই ঘর তুলব।'

ষাঁড় একাই কাঠ দিয়ে বাড়ী বানাল। চুল্লী জেবলে আগুন পোহায়, আরাম করে।

সে বছর ভয়ানক শীত পড়ল। শীতে শরীর জমে যায়। ভেড়া খুট্‌খুট্‌ করে ঘোরে, কিন্তু শরীর আর কিছুতেই গরম হয় না। শেষ পর্যন্ত গেল ষাঁড়ের কাছে।

'ব্যা!.. ব্যা!.. দরজা খোল, ঘরে ঢুকি!'

'না হে বাপু, সেটি হচ্ছে না, যখন তোকে সাহায্য করতে বলেছিলুম তখন বলেছিলি, গায়ে পশমের কোর্তা আছে, শীতকে পরোয়া করিস না।'

'ঢুকতে দে বলছি! নয়ত ঢুঁ মেরে দরজা ভেঙ্গে ফেলব, তাহলে তুইও ঠান্ডায় জমে যাবি।'

ষাঁড় ভাবে আর ভাবে: "ঢুকতেই দিই, নইলে জমিয়ে মারবে!"

বলল, 'বেশ, ভেতরেই আয়।'

ভেড়াটা ঘরে ঢুকে চুল্লীর সামনে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই দৌড়তে দৌড়তে শুয়োর এসে হাজির।

'ঘোঁত! ঘোঁত! ও ষাঁড়, ঘরে গিয়ে একটু গরম হয়ে নিই।'

'না হে বাপু, সেটি হচ্ছে না, যখন তোকে ঘর তুলতে ডেকেছিলুম তখন বলেছিলি, যতই শীত পড়ুক না, মাটি খুঁড়ে তলায় ঢুকবি।'

'ঢুকতে দে বলছি! নয়ত কোণগুলো সব খুঁড়ে খুঁড়ে বাড়ীটি তোর ধূলিসাৎ করে ছাড়ব।'

ষাঁড় ভাবে আর ভাবে: "বাড়ীটা দেখছি ধূলিসাৎ করে দেবে!"

বলল, 'তা ভেতরেই আয়।'

শুয়োর দৌড়ে ঢুকে সোজা মাটির নীচের গুদামঘরে গিয়ে আরাম করে জাঁকিয়ে বসল।

তারপর এল হাঁস।

'প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক! ষাঁড়, ও ষাঁড়, ঘরে ঢুকে একটু গরম হয়ে নিই!'

'না হে বাপু, ঢুকতে দেব না! তোর দু'দুটো ডানা। একটায় পেতে শো, একটায় গা ঢাকা দে। বাড়ী ছাড়াই তোর বেশ চলে যাবে।'

'ঢুকতে না দিলে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে যে শেওলা আছে সব টেনে ফেলে দেব। ফুটো দিয়ে হুহু করে তখন শীত ঢুকবে!'

ষাঁড় ভেবে ভেবে শেষপর্যন্ত হাঁসকেও ঢুকতে দিল। হাঁসটা ঘরে ঢুকে গিয়ে বসল দাঁড়ে।

একটু পরেই মোরগ এল ধেয়ে।

'কোঁকর-কোঁ! ও ষাঁড়, দরজা খোল, ঢুকতে দে!'

'না খুলব না, যা না ফার গাছের তলায় তোর কোটরে।'

'ঢুকতে দে বলছি! নয়ত চালের ওপর চেপে ঠুকরে ঠুকরে গর্ত করে দেব। হুহু করে শীত ঢুকবে তখন।'

মোরগকেও ঢুকতে দিল ষাঁড়। মোরগটা উড়ে গিয়ে বসল একটা কড়িকাঠের ওপর।

রইল ওরা একসঙ্গেই। পাঁচটিতে মিলে দিন কাটায়। নেকড়ে আর ভালুকের কানে গেল সে কথা। বলে:

'চল, আমরা গিয়ে সব কটাকে খেয়ে ফেলি, তারপর আমরাই থাকব ঐ ঘরটায়।'

এই বলে রওনা হল। নেকড়ে ভালুককে বলল:

'তোর গায়ে জোর অনেক, তুই আগে ঢোক।'

'না রে, আমি বড়ো ঢিলেঢালা, তুই চটপটে, বরঞ্চ তুইই আগে ঢোক।'

নেকড়েই ঢুকল বাড়ীর মধ্যে। ঢোকা মাত্রই ষাঁড়টা দুই শিঙের মধ্যে তাকে আটকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল। ভেড়াটা দৌড়ে এসে ঢু' মারে — দমাস্, দমাস্! আর মাটির নীচের গুদামঘর থেকে শুয়োরটা হাঁকে:

'ছুরিতে কুড়ুলে শান পড়ে,
জ্যান্ত খাব নেকড়েরে!'

হাঁস এসে চিমটি লাগায় নেকড়ের গায়ে, আর মোরগটা দাঁড়ে নেচে নেচে চ্যাঁচায়:

'সে আবার কী, রাখ ইয়ার্কি,
এইখানে দে আমায়,
ছুড়িও হেথা, দড়িও হেথা...
ঝুলিয়ে করি জবাই!'

হাঁকডাক শুনে ভালুক একেবারে চম্পট। নেকড়ে এদিকে ফোঁসে, ওদিকে ফোঁসে, কোনো রকমে শিং ফসকে পালিয়ে বাঁচে। ভালুককে গিয়ে বলে:

'বাব্বাঃ, যা বিপদে পড়েছিলাম! খুব জোর বেঁচে গেছি! পিটিয়ে প্রায় মেরেই ফেলেছিল... কালো কোট পরা একটা লোক আমায় মস্ত সাঁড়াশি দিয়ে ঠেসে ধরে দেওয়ালের সঙ্গে। তারপর ছাই রঙের কোট পরা বেঁটে একটা লোক এসে কুড়ুলের ভোঁতা দিক দিয়ে কী পিটুনি পিটলে। তারপর এল সাদা কোট পরা আরো বেঁটে একটা লোক। এসেই সাঁড়াশি দিয়ে চিমটি কাটতে লেগে গেল। আর দলের সবচেয়ে ক্ষুদেটা টক্‌টকে লাল জামা পরে কড়িকাঠের ওপর চ্যাঁচাতে লাগল:

"সে আবার কী, রাখ ইয়ার্কি,
এইখানে দে আমায়,
ছুরিও হেথা, দড়িও হেথা...
ঝুলিয়ে করি জবাই!"

আর তলকুঠরি থেকে কে যেন হাঁক দিলে:

"ছুরিতে কুড়ুলে শান পড়ে,
জ্যান্ত খাব নেকড়েরে!"'

তারপর থেকে নেকড়ে আর ভালুক কাঠের বাড়ীর ত্রিসীমানায় যায়নি।

আর ষাঁড়, ভেড়া, শুয়োর, হাঁস আর মোরগ বাস করে বাড়ীটায়, মনের আনন্দে দিন কাটায়।

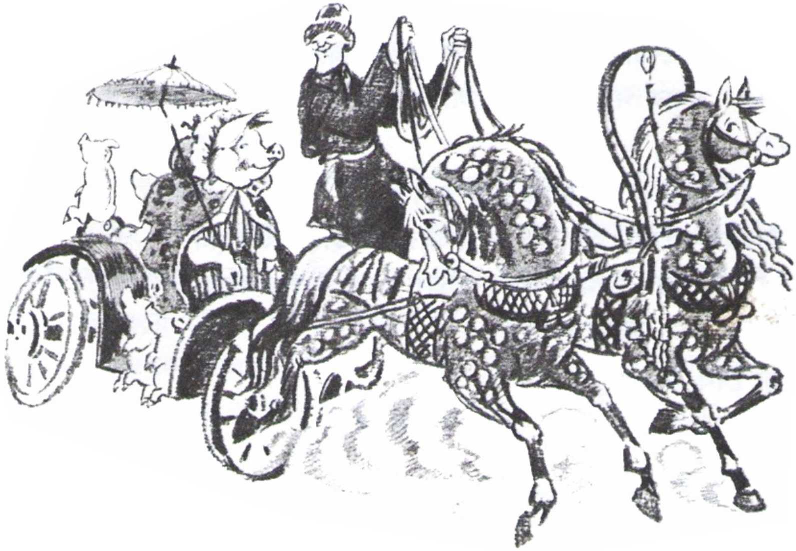

সেয়ানা চাষী

এক যে ছিল বুড়ী। তার দুই ছেলে। বড় ছেলে মারা গিয়েছিল। ছোট ছেলেও চলে গেল দূর দেশে। তারপর তিন দিনও হয়নি এক সৈনিক এসে হাজির হল বুড়ীর কাছে। বলল:

'আজ রাতটার মত থাকতে দেবে, ঠাকুমা?'

'এসো বাছা, এসো। তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'আমি হলুম নিখোঁজ। আসছি ঠাকুমা, সেই পরলোক থেকে।'

'দ্যাখো দিকি চাঁদ আমার, কী আর বলি, আমার ছেলেটিও মারা গেছে। দেখা হয়নি তার সঙ্গে?'

'দেখিনি আবার? আমি আর ও তো একই ঘরে ছিলুম।'

'বলো কী?'

‘ছেলে তোমার পরলোকে সারস চরায়, ঠাকুমা।’

‘আহা রে, বেচারা! খুবই কষ্টের কাজ বোধ হয়!’

‘কষ্ট আবার নয়, সারসগুলো যে কেবল কাঁটা ঝোপেই ঘুরে বেড়ায়, ঠাকুমা।’

‘জামাকাপড়ের টানাটানি নেই তো?’

‘টানাটানি নেই আবার! একেবারে ছন্নছাড়া অবস্থা।’

‘শোনো বাছা, আমার কাছে চল্লিশ হাত কাপড় আর দশটি রুবল্ আছে, তুমি নিয়ে যাও, ছেলেকে দিও।’

‘তা দেব, ঠাকুমা।’

দিন যায়, বুড়ীর ছোট ছেলে ফিরে এল।

‘কেমন আছো মা?’

‘তুই যখন বিদেশে ছিলি, তখন পরলোক থেকে নিখোঁজ এসেছিল আমার কাছে। তোর দাদার কথা কত বলল। একই ঘরে ছিল ওরা। ওর হাত দিয়ে আমি এক থান কাপড় আর দশটি রুবল পাঠিয়েছি।’

ছেলে বলে, ‘এই যখন ব্যাপার, তখন আমি চললুম! সারা পৃথিবী ঘুরে তোমার চেয়েও বোকা যদি কোনদিন পাই, তবেই ফিরব। নয়ত আর ফিরব না।’

এই বলে পথে নামল ছেলে।

এল সে জমিদারদের গাঁয়ে, থামল জমিদার বাড়ীর সামনে। উঠোনে একটা শুয়োর তার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে চরছে। তাই দেখে চাষী হাঁটু গেড়ে শুয়োরের সামনে কুর্নিশ করতে লাগল। জমিদার-গিন্নী ব্যাপারটা জানলা দিয়ে দেখতে পেয়ে দাসীকে ডেকে বলল:

‘যা তো, জিজ্ঞেস করে আয়, চাষী কেন কুর্নিশ করছে।’

দাসী গিয়ে জিজ্ঞেস করল:

‘ও চাষী, তুমি হাঁটু গেড়ে বসেছ কেন? আর শুয়োরকে কেন কুর্নিশ করছ?’

'মনিব-গিন্নীকে গিয়ে বল মা, তোমাদের এই শুয়োরটি হলেন আমার শালী, কাল আমার ছেলের বিয়ে, নেমন্তন্ন করতে এসেছি। শুয়োরটি হবেন বরকর্ত্রী, বাচ্চাগুলো বরযাত্রী, গিন্নীমা যেন অনুমতি দেন।'

জমিদার-গিন্নী শুনে বলল:

'আচ্ছা বোকা তো, শুয়োর আর তার ছেলেপুলেকে কিনা নেমন্তন্ন করছে বিয়েতে! ভালই হবে, সবাই হাসাহাসি করবে। এক কাজ কর্, শুয়োরটাকে আমার লোম-দেওয়া কোটটা পরিয়ে দে। আর দুটো ঘোড়া যুততে বলে দে গাড়ীতে। জাঁকিয়ে বিয়ের আসরে যেতে হবে তো।'

দুটো ঘোড়াকে লাগাম পরিয়ে গাড়ীতে যোতা হল। কাচ্চাবাচ্চা সমেত শুয়োর নিয়ে গাড়ীতে বয়ে দেওয়া হল চাষীকে। অমনি চাষীও উঠে বসে ঘরমুখো গাড়ী হাঁকাল।

জমিদারমশাই শিকারে গিয়েছিল, বাড়ী ফিরে দেখে গিন্নী একেবারে হেসে আটখানা।

'ওগো, শোনো শোনো, সে এক মজার ব্যাপার, তুমি দেখতে পেলে না। এক চাষী এসে আমাদের শুয়োরটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কুর্নিশ করছিল। বলে কিনা তোমাদের শুয়োরটি আমার শালী, তাই আমি এসেছি ওকে ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে। শুয়োর নাকি হবে বরকর্ত্রী আর বাচ্চারা হবে বরযাত্রী!'

জমিদার বলল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি! শুয়োরটা দিয়ে দিয়েছো তো?'

'হ্যাঁ গো, যেতে দিলাম শুয়োরটাকে, আমার লোম-দেওয়া কোটটা পরিয়ে গাড়ীতে দুটো ঘোড়া যুতে পাঠিয়েছি।'

'তা কোথায় থাকে চাষীটা?'

'তা তো জানি না!'

'দেখা যাচ্ছে তুমিই আস্ত বোকা, চাষীটা নয়!'

বৌ বোকা বনেছে দেখে জমিদারবাবু ভীষণ রেগে গেল। তক্ষুণি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এক লাফে ঘোড়ায় চেপে চাষীর পিছনে ধাওয়া করল। চাষীর কানে এল, পিছন পিছন কে যেন আসছে। অমনি গাড়ীটা ঘুরিয়ে ঘন বনের

মধ্যে নিয়ে গিয়ে রেখে এল। তারপর টুপিটা খুলে মাটিতে পেতে নিজে বসে রইল তার পাশে।

'ওহে দাড়িওয়ালা, এক চাষীকে এ পথে যেতে দেখেছো? সঙ্গে তার জোড়া ঘোড়ায় টানা গাড়ী, আর তাতে শুয়োর আর তার ছানাপোনা বসে,' জমিদারমশাই চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল চাষীকে।

'দেখিনি আবার, সে তো অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে।'

'কোন দিকে গেছে বলতে পারো? ধরতে চাই একবার লোকটাকে।'

'ধরা কঠিন। নানা মোড়, নানা বাঁক। পথ হারিয়ে ফেলবে গো! এদিককার পথঘাট বোধ হয় তেমন চেনা নেই না?'

'দেখো হে ভায়া, তুমিই না হয় আমার হয়ে চাষীটাকে ধরে এনে দাও।'

'না বাপু, তা হয় না। আমার টুপির নীচে একটা বাজপাখি আছে যে!'

'আমি না হয় বাজপাখিটা দেখব।'

'না গো, ছেড়ে দিয়ে বসবে, দামী পাখি। মনিব আমায় খেয়ে ফেলবে।'

'দাম কত পাখিটার?'

'তা শ' তিনেক রুবল্ হবে।'

'বেশ, উড়ে গেলে দাম দিয়ে দেব।'

'না বাবু, এখন তো বলছো, পরে কী হবে কে জানে।'

'বিশ্বেস হচ্ছে না; বেশ, এই নাও তিন শ' রুবল্, এবার তো আর ভয় নেই?'

টাকাটি নিয়ে বাবুর ঘোড়ায় চেপে বনের ভিতর ঢুকে গেল চাষী আর জমিদার বসে বসে চাষীর শূন্য টুপিটা পাহারা দিতে লাগল। জমিদার বসে আছে তো আছেই। অনেকক্ষণ কেটে গেল, সূর্য প্রায় অস্ত যায়, কিন্তু চাষীর আর দেখা নেই।

'দেখি তো একবার টুপিটা তুলে, সত্যিই পাখি আছে কিনা। যদি থাকে, তবে লোকটা ফিরে আসবে, আর যদি নাই থাকে তো অপেক্ষা করা বৃথা!'

এই ভেবে জমিদারমশাই টুপি তুলে দেখে ভোঁ ভাঁ। কোথায় বাজপাখি? কিছু নেই।

'হতভাগা! তাহলে এই চাষীটাই নিশ্চয়ই আমার গিন্নীকেও বোকা বানিয়েছে!'

রেগে মেগে থুথু করতে করতে জমিদারমশাই পায়ে হেঁটেই বাড়ীমুখো রওনা দিল। চাষী এদিকে বহু আগেই নিজের বাড়ী পৌঁছে গিয়েছিল। মাকে ডেকে বলল:

'শোনো মা, তোমার কাছেই ফিরে এলাম। দুনিয়ায় তোমার চেয়েও বোকা আছে। দেখো, এমনি এমনি মুফতে পেয়ে গেলাম তিনটে ঘোড়া, একটা গাড়ী, তিন শ' রুবল্ আর ছানাপোনাশুদ্ধ একটা শুয়োর।'

সাত-বছুরে

দুই ভাই যাচ্ছে। একজন গরীব আর একজন ধনী। দুজনেরই একটা করে ঘোড়া। গরীব ভাইয়ের মাদী ঘোড়া আর ধনী ভাইয়ের মদ্দা। এক জায়গায় থামল রাত কাটাতে।

রাত্রে গরীব ভাইয়ের ঘোড়া বাচ্চা দিল। বাচ্চাটা গড়িয়ে ধনী ভাইয়ের গাড়ীর নীচে চলে গেল। সকালে ধনী ভাই গরীব ভাইকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলে:

'ওঠ, ওঠ, দেখ, আমার গাড়ীটা কাল রাত্তিরে বাচ্চা দিয়েছে।'

গরীব ভাই উঠে বলে:

'গাড়ীর আবার বাচ্চা হবে কী? এ আমার ঘোড়াটার বাচ্চা।'

'তাহলে তো বাচ্চাটা তোর ঘোড়ার পাশেই শুয়ে থাকত।'

ব্যস্, লেগে গেল ঝগড়া। ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়াল। ধনী ভাই ঘুষ দিয়ে বিচারকদের হাত করে নিল। আর গরীব বেচারা কী করে—সত্যি কথাই তার একমাত্র সম্বল।

শেষ পর্যন্ত কথাটা রাজার কানে গেল।

রাজা দুই ভাইকে ডেকে পাঠালেন আর চারটে ধাঁধা দিলেন।

'পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর দ্রুতগামী কী, সবচেয়ে মোটা কী, সবচেয়ে নরম কী, আর সবচেয়ে মধুর কী?'

তিনদিন সময় দিলেন ভাবতে।

রাজা বললেন, 'চতুর্থ দিনে এসে উত্তর জানিয়ে যেও।'

ধনী ভাই ভাবে ভাবে, তারপর সইয়ের কথা মনে পড়তে তার কাছে গেল উপদেশ নিতে।

সই তাকে আদর করে ডেকে টেবিলে বসাল। এটা ওটা খেতে দিল, তারপর জিজ্ঞেস করল:

'এত মন খারাপ কেন গো?'

'আর বলো কেন, রাজা চারটি ধাঁধা দিয়েছেন; তিনদিন মোটে সময়; চারদিনের দিন উত্তর চাই।'

'শুনি কী ধাঁধা?'

'প্রথমটা হল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর দ্রুতগামী কী?'

'এ আবার একটা ধাঁধা হল! আমার স্বামীর এক বাদামী ঘোড়া আছে, এর চেয়ে জোরে চলে এমন কিছু সারা পৃথিবীতেই নেই। এক চাবুক লাগাও দেখবে দৌড়ে খরগোস পাকড়ে আনবে।'

'এইবার দ্বিতীয়টা, পৃথিবীতে সবচেয়ে মোটা কী?'

'দু'বছর বয়সের যে শুয়োরটাকে পালছি সেইটা। শুয়োরটা এখনই এত মোটা, যে পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে না।'

'এবার তবে তৃতীয়টা। পৃথিবীতে সবচেয়ে নরম কী?'

'এ তো জানা কথা, পালকের বিছানা। এর চেয়ে নরম কী আর কিছু ভাবতে পারো?'

'এবার তবে শেষটা। পৃথিবীতে সবচেয়ে মধুর কী?'

'আমার নাতি ইভানুশ্‌কা।'

'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন সই, খুব বুদ্ধি দিয়েছ, জীবনে ভুলব না।'

আর গরীব ভাইটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেল। বাড়ীর দরজায় তার সাত বছরের মেয়েটি তার জন্যে দাঁড়িয়ে। সংসারে গরীব ভাইয়ের ঐ মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নেই।

'কী হয়েছে বাবা, দুঃখু করছ কেন, কাঁদছ কেন?'

'দুঃখু না করে কী করি মা, না কেঁদে কী করি? রাজা আমায় চারটে ধাঁধা দিয়েছেন, সারাজীবনেও তার উত্তর দেবার সাধ্যি আমার নেই।'

'কী ধাঁধা বলো না?'

'তবে শোনো মা, পৃথিবীতে কোন জিনিস সবচেয়ে শক্তিশালী আর দ্রুতগামী; সবচেয়ে মোটা কী? সবচেয়ে নরম কী? সবচেয়ে মধুর কী?'

'বাবা, তুমি রাজাকে গিয়ে বলো সবচেয়ে শক্তিশালী আর দ্রুতগামী হল বাতাস। সবচেয়ে মোটা হল মাটি: যার বাড় আছে, যার প্রাণ আছে সবকিছুই আহার পায় মাটি থেকে। সবচেয়ে নরম হল হাত: লোকে যার ওপরেই শুয়ে থাক না কেন, সবসময় তার মাথার নীচে হাতটি রাখা চাই। আর ঘুমের চেয়ে মধুর কিছু পৃথিবীতে নেই।'

ধনী গরীব দু'ভাই এল রাজার কাছে। রাজা দুজনের উত্তরটাই শুনলেন। তারপর গরীব ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উত্তরগুলো তুমি নিজেই বের করেছো? না কেউ বলেছে?'

গরীব ভাই উত্তর দিল:

'মহারাজ, আমার একটি সাত বছরের মেয়ে আছে। সেই আমাকে বলেছে।'

'তোমার মেয়ের যদি এতই বুদ্ধি, তবে এই রেশমের সুতোটা নিয়ে গিয়ে তাকে দাও। কাল সকালের মধ্যেই আমায় যেন একটা নক্সী তোয়ালে বুনে দেয়।'

গরীব লোকটি সেই ছোট রেশমের সুতোটা নিয়ে মনের দুঃখে বাড়ী ফিরে গেল।

বলে, 'বিপদ হয়েছে মা, রাজা হুকুম করেছেন এই ছোট রেশমের সুতোটা দিয়ে তোমায় একটা তোয়ালে বুনে দিতে হবে।'

সাত-বছুরে বলে, 'দুঃখ করো না, বাবা।'

একটা ঝাঁটার কাঠি ভেঙ্গে নিয়ে বাবাকে দিয়ে বলে:

'রাজাকে গিয়ে বলো যেন ছুতোরমিস্ত্রী ডেকে এই কাঠিটা দিয়ে একটা তাঁত তৈরী করিয়ে দেন। সেই তাঁতে আমি রাজার তোয়ালে বুনব।'

গরীব ভাই রাজার কাছে গিয়ে সে কথা জানাল। রাজা তখন তাকে দেড়শটা ডিম দিয়ে বললেন:

'তোমার মেয়েকে গিয়ে বলো, কাল সকালের মধ্যেই বাচ্চা ফুটিয়ে দিতে হবে।'

আগের চেয়েও মন খারাপ করে বাড়ী ফিরে এল গরীব লোকটি।

'হায় হায়, মা, এক বিপদ যায় তো আর এক বিপদ আসে।'

সাত-বছুরে বলল, 'দুঃখ করো না, বাবা।'

ডিমগুলো সে দিনের খাবার, রাতের খাবার জন্যে রেঁধে রাখল। আর বাবাকে পাঠাল রাজার কাছে।

'রাজাকে গিয়ে বলো মুরগীর ছানাগুলোর জন্যে একদিনের তৈরী গম চাই: একদিনের মধ্যে মাঠ চষে, বীজ বুনে, ফসল কেটে, মাড়াই করে তৈরী করা চাই। নয়ত ছানারা ঠোঁটও ঠেকাবে না।'

রাজামশাই সব কথা শুনে বললেন:

'তোমার মেয়ের যদি এতই বুদ্ধি, তবে তাকে বলো, কাল সকালে এখানে আসা চাই: আসবে কিন্তু পায়ে হেঁটেও না, ঘোড়ায় চড়েও না, খালি গায়েও নয়, জামা পরেও নয়, কিছু দিতেও পারবে না, বিনা উপহারেও আসতে পারবে না।'

চাষীটি ভাবে, "ওরে বাবা! এ কাজ করার বুদ্ধি আমার মেয়ের নেই। সব গেল এবার!"

কিন্তু সাত-বছুরে বলল:

'মন খারাপ করো না বাবা, শিকারীর কাছে যাও, একটা জ্যান্ত খরগোস আর জ্যান্ত একটা কোয়েল এনে দাও।'

গরীব লোকটি খরগোস আর কোয়েল কিনে নিয়ে এল।

পরদিন ভোর বেলা সাত-বছুরে জামাকাপড় ছেড়ে মাছ ধরার জাল পরল। তারপর হাতে কোয়েলটা নিয়ে খরগোসের পিঠে চড়ে চলল রাজবাড়ীতে।

রাজবাড়ীর ফটকের কাছে রাজার সঙ্গে দেখা। সাত-বছুরে রাজাকে কুর্নিশ করে বলল:

'এই নাও রাজা উপহার!' বলে পাখিটা বাড়িয়ে ধরল। রাজা হাত বাড়াতেই—ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল পাখিটা।

'খাসা! আমি যা বলেছিলাম ঠিক তাই করেছ। এবার বলো তো, বাপ তোমার খুবই গরীব, কী করে তোমাদের দিন চলে।'

'বাবা আমার জাল ফেলে না জলে, শুক্‌নো ডাঙায় মাছ ধরে, সেই মাছ আমি কোঁচড়ে করে এনে ঝোল বানাই।'

'দূর বোকা মেয়ে! শুক্‌নো ডাঙায় কি মাছ থাকে? মাছ থাকে জলে!'

'আর তুমিই বা কেমন বুদ্ধিমান, গাড়ীর কখনো বাচ্চা হয়? বাচ্চা হয় ঘোড়ার।'

রাজা আজ্ঞা দিলেন ঘোড়ার বাচ্চাটা গরীব ভাইকেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

কুড়ুলের জাউ

ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছে এক বুড়ো সৈনিক। হে'টে হে'টে পা টাটাচ্ছে; ক্ষিদেও পেয়েছে। এক গ্রামে পে'ছিেই সে প্রথম কু'ড়েটার দরজায় টোকা দিল।

'দরজা খোলো গো, পথের লোক জিরিয়ে নেবে।'

দরজা খুলল এক বুড়ী। বলল:

'এসো, এসো সৈনিক।'

'দুটি মুখে তোলার মতো কিছু আছে গিন্নীমা?'

বুড়ীর সবই ছিল কিন্তু সৈনিককে খাওয়াতে মন উঠল না, ভান করলে যেন অনাথা অভাগা।

'কী আর বলি ভালো মানুষের পো, আমি নিজেই আজ এখনো কিছু মুখে তুলিনি। কিছুই নেই ঘরে।'

সৈনিক বলে, 'নেই যখন, নেই! কী আর করা।'

হঠাৎ তার চোখে পড়ল বেঞ্চির তলায় একটা হাতল ভাঙা কুড়ুল।

বলল, 'আর কিছু যখন নেই তখন ঐ কুড়ুলটা দিয়েই জাউ বানান যাক।'

বুড়ী হাঁ করে তাকিয়ে রইল। বলল:

'কুড়ুল দিয়ে জাউ, সে আবার কেমন?'

'দেখোই না! একটা পাত্র দাও তো।'

পাত্র নিয়ে এল বুড়ী। সৈনিকটি কুড়ুলটা বেশ করে ধুয়ে পাত্রটায় রাখল। তারপর জল দিয়ে উনুনে চাপিয়ে দিল।

বুড়ীর চোখ একেবারে ছানাবড়া।

একটা চামচে নিয়ে ঘট্‌ঘট্‌ করে নাড়তে লাগল সৈনিক। চেখে দেখল।

বলল, 'এক্ষুণি হয়ে যাবে। ইস্‌, একটু নুন যদি থাকত।'

'তা নুন বাপু আমার আছে,' বুড়ী বলল, 'এই নাও!'

নুন দিয়ে আবার চেখে বলল:

'ইস্‌, এর মধ্যে এক মুঠো ক্ষুদ যদি পড়ত, তাহলে আর দেখতে হত না।'

বুড়ী ভাঁড়ার থেকে ছোট একটা থলে ভর্তি করে ক্ষুদ এনে দিল।

'তা নাও, যেমনটি দরকার তেমনি করেই রাঁধো!'

সৈনিকটি রাঁধছে তো রাঁধছেই। খালি চামচে নাড়ছে আর থেকে থেকেই চাখছে।

বুড়ী আর সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।

'আহ্‌, দিব্যি হয়েছে জাউ। শুধু এই সঙ্গে একটু ঘি যদি পড়ত না, তাহলে তোফা হত!'

বুড়ী ঘিও জোগাড় করে আনল।

তৈরি হল জাউ।

'নাও খেতে শুরু করো, গিন্নীমা।'

দুজনে মিলে খায়, প্রশংসা আর ধরে না।

'দ্যাখো দিকি, ভাবতেই পারিনি যে কুড়ুল দিয়ে আবার এমন খাসা জাউ রাঁধা যায়,' অবাক হয় বুড়ি।

সৈনিকটি খেয়েই চলে আর মিটিমিটি হাসে।

যমরাজ আর সৈনিক

পঁচিশ বছর কাজ করলে সৈনিক, তারপর বেকার হয়ে পথে নামল।

'যতদিন মেয়াদ ছিল কাজ করেছ, এবার যেখানে খুশী যাবে যাও।'

বেঁধে ছেঁদে রওনা দিলে সৈনিক, মনে মনে ভাবে: "পঁচিশ বছর রাজার কাজ করলুম, কিন্তু পঁচিশটা শালগমও পুরস্কার মিলল না। শুকনো রুটির তিনটি টুকরো কেবল দিয়েছে পথে খাবার জন্যে। এখন কী করি? মাথাই বা গুঁজি কোথায়। যাই, দেশের বাড়ীতেই যাই। বাবামার সঙ্গে দেখা হবে। যদি বেঁচে নাও থাকে তবু তো কবরের পাশে দু'দন্ড বসে জিরোতে পারব।"

এই ভেবে সৈনিক পথে নামল। চলেছে, চলেছে, চলেছে। শুকনো রুটির দুটো টুকরো খেয়ে ফেলল। রইল কেবল একটি বাকি, অথচ এখনও বহুদূর রাস্তা।

এমন সময় এক ভিখারীর সঙ্গে দেখা। ভিখারী বলল:

'বুড়ো অথর্বকে কিছু দাও না সৈনিক!'

সৈনিকটি তার শেষ রুটির টুকরোটাও বের করে বুড়ো ভিখারীটিকে দিয়ে দিল। ভাবল, "আমি যা হোক্ করে চালিয়ে নেব, হাজার হোক সৈনিক, কিন্তু অথর্ব বুড়ো ভিখারী, কীই বা ওর উপায়।"

পাইপটা আবার জ্বালিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পথে চলে সৈনিক।

যায়, যায়, দেখে পথের পাশেই একটা হ্রদ। পারের কাছেই সব বুনো হাঁস সাঁতার কাটছে। সৈনিকটি পা টিপে এগিয়ে গেল। তারপর সুযোগ বুঝে তিনটে হাঁস মারল।

"যাক কিছু খাওয়ার যোগাড় হল!"

রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈনিকটি এসে পৌঁছল সহরে। একটা সরাইখানা খুঁজে বের করে, সরাইওয়ালাকে তিনটে হাঁস দিয়ে বলল:

'এই নাও তিনটে হাঁস। একটা আমায় ভেজে দাও। তুমিও নিও একটা। আর এই তিন নম্বর হাঁসটার বদলে কিছু মদ দিও।'

সাজসরঞ্জাম সব নামিয়ে রেখে আরাম করে বসতে না বসতেই খাবার তৈরী।

ভাজা হাঁসটা আর এক বোতল মদ নিয়ে সৈনিকটি খেতে বসল। এক এক ঢোক মদ তারপর এক এক কামড় মাংস, মন্দ আর কী!

সৈনিক খেতে লাগল ধীরে সুস্থে। খেতে খেতে সরাইওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, বলতে পার, রাস্তা পেরিয়ে ঐ নতুন বিরাট বাড়ীটা কার?'

সরাইওয়ালা জবাব দিল:

'সহরের সবচেয়ে ধনী সওদাগর ওটা নিজে থাকবার জন্যে বানিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই আর ওখানে থাকা হয়ে উঠছে না।'

'তার মানে?'

'ওটা ভূতুড়ে বাড়ী। শয়তানের আড্ডা—রাত্রে লাফালাফি চেঁচামেচি করে নরক গুলজার করে। সন্ধ্যের পর লোকে বাড়ীটার কাছে যেতেও ভয় পায়।'

সওদাগরটির ঠিক-ঠিকানা জেনে নিলে সৈনিকটি। বলল:

'দেখা করে দু'চারটে কথা বলতে চাই। হয়ত তার কিছু সাহায্যেও লাগতে পারি।'

খাবার পর সৈনিক একটু ঘুম দিয়ে নিল। তারপর অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে বেরিয়ে পড়ল সৈনিক। খুঁজে বার করল সওদাগরকে। সওদাগর বলল:

'কী চাও সৈনিক, বলো।'

'আমি এক যাত্রী। তোমার নতুন বাড়ীটায় রাতটা কাটাতে দাও, ওটা তো খালিই পড়ে আছে।'

'বলছ কী! নির্ঘাৎ মরণের পথ নেবার কী দরকার? বরং অন্য কোথাও থাকবার জায়গা দেখো। সহরে বাড়ী তো কম নয়। আমার নতুন বাড়ীটা যেদিন থেকে করেছি সেদিন থেকেই ওখানে শয়তানেরা ডেরা বেঁধেছে। কারো সাধ্যি নেই যে ওদের নড়ায়।'

'দেখা যাক, শয়তানগুলোকে তাড়াতে পারি কিনা। কে জানে, ভূতগুলো হয়তবা বুড়ো সৈনিকের হুকুম মানতেও পারে।'

'তোমার মতো সাহসী লোকেরাও চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কোনো উপায় নেই। এক পর্যটক এসেছিল গত বছর, তোমার মতো সেও বাড়ীটা থেকে ভূত তাড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালে পাওয়া গিয়েছিল কেবল কয়েকটা হাড়। ভূতের হাতে মারা পড়েছিল লোকটা।'

'রুশী সৈনিক আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না। পঁচিশ বছর কাজ করেছি আমি, লড়াই করেছি, যুদ্ধ করেছি, তবু বেঁচে আছি। শয়তানগুলোর হাত থেকেও বাঁচব, হার মানব না।'

'বেশ, যা ভালো বোঝো। ভয় না পেলে যাও। যদি সত্যিই শয়তানগুলোকে তাড়াতে পার, তবে পুরস্কার দিতে ভুলব না।'

সৈনিকটি বলল, 'আমাকে কয়েকটা মোমবাতি, কিছু ভাজা বাদাম, আর বড়ো সড়ো একটা শালগম সেদ্ধ করে দাও।'

'এসো বাপু তুমি দোকানে, যা দরকার সব দেখে শুনে নাও।'

সৈনিকটি দোকানে গেল। গোটা দশেক মোমবাতি, দেড় সের ভাজা বাদাম নিয়ে সওদাগরের রান্নাঘর থেকে সবচেয়ে বড়ো শালগমটা তুলে নিয়ে নতুন বাড়ীর দিকে চলে গেল।

ঠিক মাঝ রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড তাণ্ডব সুরু হল। দড়াম্ দড়াম্ করতে লাগল দরজা, ক্যাঁচকেঁচিয়ে উঠল কাঠের মেঝে, সুরু হল পাগলের মত চেঁচামেচি লাফালাফি। কানে একেবারে তালা লাগে। তোলপাড় লেগে গেল সারা বাড়ীটায়।

সৈনিকটা কিন্তু শান্তভাবে বসে বাদাম ভাঙে আর পাইপে টান দেয়।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। একটা বাচ্চা শয়তান মাথা ঢুকিয়ে সৈনিককে দেখেই চীৎকার করে উঠল:

'একটা মানুষ যে রে! চলে আয় সব! জ্যান্ত খাওয়া যাবে।'

দুমদাম করে এসে জুটল সবকটা শয়তান। দরজার কাছে ভিড় করে তারা উঁকি মেরে সৈনিককে দেখে আর এ ওকে ঠেলা মেরে চেঁচিয়ে বলে:

'ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাব।'

সৈনিক বলে, 'বড়াই থামা। জীবনে অমন ঢের দেখেছি। পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়েছে কম নয়। ভালোয় ভালোয় সরে পড়।'

এই শুনে একটা শয়তান ঠেলেঠুলে এগিয়ে এসে বলল:

'হয়ে যাক্ শক্তি পরীক্ষা!'

সৈনিক বলল, 'ঠিক আছে। হাতে করে পাথর নিঙড়ে রস কে বার করতে পারিস তোরা?'

গোদা-শয়তান রাস্তা থেকে একটা পাথর আনবার হুকুম দিল। একটা শয়তান তক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এল। সৈনিকের হাতে পাথরটা দিয়ে বলল, 'নাও, রস বার করো দেখি।'

'আমি পরে, আগে দেখি তোদের মধ্যে কেউ পারে কিনা।'

গোদা-শয়তান পাথরটা বাগিয়ে ধরে এমন জোর চাপ দিল যে তক্ষুণি ওটা গুঁড়িয়ে এক মুঠো বালি হয়ে গেল।

'দেখেছিস তো!' সৈনিক ঝোলার ভিতর থেকে বের করল শালগমটা।

'দেখ, আমার পাথরটা তোর চেয়ে ঢের বড়,' এই বলে সৈনিক শালগমটা চিপে চিপে রস ঝরাতে লাগল।

'দেখলি তো!'

হাঁ হয়ে গেল শয়তানরা। মুখে আর কথা নেই। পরে জিজ্ঞেস করল:

'কী তুমি খাচ্ছো অনবরত?'

'বাদাম! কিন্তু আমার বাদাম ভাঙবার সাধ্যি তোদের নেই।'

সৈনিক গোদা-শয়তানের হাতে দিল একটা বুলেট।

'খেয়ে দেখ একবার সৈনিকের বাদাম।'

শয়তানটা ওটা কপ্‌ করে মুখে পুরে দিল। চিবোতে চিবোতে বুলেটটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল, কিন্তু ভাঙতে আর পারে না। এদিকে সৈনিক কিন্তু একটা করে বাদাম মুখে দেয় আর খায়, মুখে দেয় আর খায়।

ঠান্ডা হয়ে এল শয়তানেরা, শান্ত হয়ে এল, এপায়ে ভর দিয়ে ওপায়ে ভর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল সৈনিককে।

সৈনিক বলল, 'শুনেছি তোরা নাকি অনেক রকম ভাল ভাল কায়দা দেখাতে পারিস। ছোট থেকে বড়, আবার বড় থেকে ছোট হয়ে যেতে পারিস, সরু ফাটল দিয়ে দিব্যি গলে যেতে পারিস।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একাজটা আমরা সবাই পারি!' চেঁচিয়ে উঠল শয়তানগুলো।

'আচ্ছা, দেখি তো তোরা যতকটা আছিস সবাই কেমন গুঁড়ি মেরে আমার ঝোলার মধ্যে ঢুকে যেতে পারিস!'

শয়তানগুলো অমনি এ ওকে গুঁতো দিয়ে, ধাক্কা মেরে ছুটল ঝোলার দিকে। একমিনিটের মধ্যেই বাড়ী খালি। সবকটা ঝোলার মধ্যে।

সৈনিক অমনি ঝোলার মুখ বন্ধ করে, আড়াআড়ি বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বকলস আটকে দিল।

'এবার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক!' বলে শুয়ে পড়ল ফৌজী কায়দায় — কোট দিয়েই বিছানা, কোট দিয়েই কম্বল।

পরদিন সকালে সওদাগর তার চাকরকে পাঠিয়ে দিল।

'যা দেখে আয়, সৈনিক বেঁচে আছে কি না? যদি মরে গিয়ে থাকে তবে অন্তত হাড়গুলো নিয়ে আসিস।'

চাকররা যখন এসে পৌঁছল, ততক্ষণে সৈনিক জেগে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে আর পাইপ টানছে।

'নমস্কার, সৈনিক! ভাবিইনি তোমায় জলজ্যান্ত দেখব, বাক্স নিয়ে এসেছিলাম, তোমার হাড় নিয়ে যাব বলে।'

সৈনিকটি হাসল।

'আমায় কবর দিতে এখনো দেরি আছে। তার চেয়ে বরং একটু হাত লাগাও তো কামারের কাছে এই ঝোলাটা নিয়ে যাব, কামারবাড়ী কত দূরে?'

ওরা বলল, 'না, দূর নয়!'

তারপর ওরা সবাই মিলে ঝোলাটা নিয়ে চলল কামারবাড়ী। সেখানে গিয়ে সৈনিক কামারকে বলল:

'তা কামার-ভাই, নেহাই'এ চাপিয়ে এই ঝোলাটাকে আচ্ছা করে পেটাও তো!'

কামার আর তার সাগরেদ দুজনে মিলে কামারে হাতুড়ি নিয়ে লেগে গেল পিটতে।

শয়তানগুলোর যা অবস্থা সে আর কী বলব। সমস্বরে চেঁচাতে লাগল:

'দয়া করো সৈনিক, ছেড়ে দাও!'

কিন্তু কামাররা আর থামে না, সৈনিকও কেবলি তাতায়:

'জোরে, আরো জোরে! লোকের উপর উপদ্রব করার মজা বুঝুক এবার!'

শয়তানগুলো চেঁচায়, 'আর করব না, জীবন থাকতে ঐ বাড়ীর ছায়া মাড়াব না। অন্যদেরও বলে দেব এ সহরে যেন না আসে। অনেক পুরস্কার দেব তোমাকে! কেবল প্রাণে মেরো না!'

‘এতক্ষণে কথা বেরিয়েছে। রুশী সৈনিকের সঙ্গে লাগতে হলে বুঝে শুনে এগোবি!’

কামারদের থামতে বলল সৈনিক। তারপর ঝোলার মুখটা আলগা করে শয়তানগুলোকে একটার পর একটা ছেড়ে দিল, শুধু গোদা-শয়তানকে ছাড়ল না।

‘যতক্ষণ না পুরস্কার আনছিস ততক্ষণ ওকে ছাড়ছি না।’

পাইপটা তখনও শেষ হয়নি, সৈনিক দেখে কি, একটা বাচ্চা শয়তান হন্‌হন্ করে ফিরে আসছে, হাতে একটা পুরনো থলি।

‘এই নাও তোমার পুরস্কার!’

সৈনিক হাতে নিয়ে দেখল নেহাত হালকা। খুলে দেখে ফাঁকা। সৈনিক শয়তানটাকে ধমকে উঠল:

‘আমায় বুদ্ধু বানাবার চেষ্টা? দাঁড়া, তোদের গোদাটাকে দুটো হাতুড়ি দিয়ে আচ্ছা করে শিক্ষা দেব!’

এই না শুনে গোদাটা ঝোলার ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলল:

‘মেরো না সৈনিক, পিটিও না, শোনো বলি, থলিটা সাধারণ নয়। ওটা যাদু-থলি। পৃথিবীতে একটিই আছে। মনে মনে কিছু ইচ্ছে করে থলি খুলে দেখবে, যা ইচ্ছে করেছিলে এসে গেছে। পাখী চাও, যা খুশী চাও, থলিটা দুলিয়ে কেবল তিনটি কথা বলবে: “থলির ভিতর আয়!” — ব্যস, অমনি যা চাইবে থলিতে এসে হাজির হবে।’

‘বটে, বটে, তাহলে একবার পরীক্ষা করা যাক, সত্যি বলছিস কিনা।’ আর মনে মনে ভাবল: “তিনটে মদের বোতল চাই।” মনে করতে না করতেই সৈনিক দেখল থলিটা ক্রমে ভারি হয়ে উঠছে। খুলে দেখে, সত্যিই তিন তিনটে মদের বোতল! সৈনিক বোতল তিনটে কামারদের দিয়ে দিল।

‘খাও, ভাই তোমরা!’

তারপর সৈনিক বাইরে গিয়ে দেখে, এক বাড়ীর ছাদে একটা চড়াই বসে আছে। সৈনিক থলি দুলিয়ে বলল:

'থলির ভিতর আয়!'

কথা শেষ হতে না হতেই চড়াইটা সোজা এসে ঢুকল থলিতে।

সৈনিক কামারের বাড়ীতে ফিরে এসে বলল:

'ঠিকই বলেছিস। আমাকে ঠকাসনি। বুড়ো সৈনিকের খুব কাজে লাগবে থলিটা।'

এই বলে ঝোলা খুলে গোদা-শয়তানকে বের করে দিল।

'পালা এবার, কিন্তু মনে রাখিস, ফের চোখে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না।'

গোদা-শয়তান, বাচ্চা শয়তান সব এক নিমেষে পালিয়ে গেল। সৈনিক ঝোলা আর থলি নিয়ে কামারদের বিদায় জানিয়ে সওদাগরের বাড়ী চলে গেল। বলল:

'এবার যাও, তোমার নতুন বাড়ীতে বাস করো। আর কেউ তোমায় বিরক্ত করবে না।'

সওদাগর সৈনিকের দিকে তাকায়, নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না।

'সত্যিই দেখছি রুশ সৈনিক আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না। বলো তো শুনি কী করে তুমি শয়তানগুলোর হাত এড়িয়ে ফিরে এলে? জলজ্যান্ত বেঁচে রইলে?'

যা যা ঘটেছিল সৈনিক সব বলল। চাকররা সায় দিল। সওদাগর ভাবল: "দু'চারদিন বরঞ্চ দেখি। যাচাই করে নিই সত্যিই বাড়ীটা শান্ত কিনা, শয়তানগুলো ফেরে কিনা!"

সকালে সেদিন সৈনিকটির সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তাদেরকে সওদাগর বলল সৈনিকটির সঙ্গে যেতে।

'রাত কাটিয়ে দেখ, যদি কিছু হয় সৈনিক আছে, বাঁচাবে।'

সারা রাত নির্বিবাদেই কাটল। পরদিন সকালে নিরাপদে, খুশী মনে সব ফিরে এল।

তৃতীয় রাত্রে সওদাগর নিজেই ভরসা করে গেল রাত কাটাতে। সেদিনও রাতটা বেশ ভালভাবেই কাটল। সবাই শান্তিতে ঘুমল। সওদাগর হুকুম দিলে ঘর দোর পরিষ্কার করতে। শুরু হল গৃহপ্রবেশের তোড়জোড়। ভাজা হল,

রাঁধা হল, সেঁকা হল সবকিছু। অতিথিরা এল, খাবারের ভারে টেবল প্রায় ভেঙে পড়ে। একেবারে দীয়তাং ভুজ্যতাং!

সওদাগর সৈনিককে সবচেয়ে ভালো আসনটিতে সম্মান করে বসিয়ে খুব করে আপ্যায়ন করতে লাগল।

'খাও সৈনিক, খাও, তোমার উপকার আমি জীবনে ভুলব না!'

খাওয়া-দাওয়া চলল একেবারে ভোর পর্যন্ত। ঘুম থেকে উঠে সৈনিক বলল এবার সে বাড়ী যাবে। সওদাগর তাকে থাকবার জন্যে পেড়াপীড়ি করতে লাগল।

'এত তাড়া কিসের? আমাদের সঙ্গে আর একটা সপ্তাহ অন্তত থেকে যাও।'

'না ভাই, এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। এবার বাড়ী যেতেই হবে।'

সওদাগর সৈনিকের ঝোলাটা রুপো দিয়ে বোঝাই করে দিয়ে বলল, 'এই নাও তোমার যৌতুক।'

কিন্তু সৈনিক বলল:

'তোমার রুপো আমি চাই না। আমি একলা মানুষ, গতর আছে। নিজেই নিজেরটা চালাব।'

সওদাগরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শূন্য ঝোলা আর যাদু-থলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হল সৈনিক।

গেল সে অনেক দিন নাকি অল্প দিন, অনেক পথ নাকি অল্প পথ, কে জানে। শেষকালে নিজের দেশে এসে পেঁছিল সে। পাহাড়ের পাশ থেকে গ্রামটা চোখে পড়তেই খুসি আর তার ধরে না। দুপাশে তাকাতে তাকাতে দ্রুত পা চালাল সৈনিক।

"কী সুন্দর! কী শোভা! কত দেশ ঘুরেছি, কত সহর, গ্রাম দেখেছি, কিন্তু সারা পৃথিবীতে নিজের দেশটির মতো এমনটি আর চোখে পড়ল না!"

সৈনিক নিজের কুঁড়েঘরের কাছে এসে দাওয়ায় উঠে দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে দিল এক থুত্থুড়ে বুড়ী। সৈনিকটি বুড়ীকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল।

ছেলেকে চিনতে পেরে বুড়ী আনন্দে যত হাসে তত কাঁদে।

'বুড়ো তোর কথা খুব বলত রে, কিন্তু কপাল আমার, আজকের দিনটা সে আর দেখে যেতে পারল না। পাঁচবছর হল তাকে গোর দিয়েছি।' তারপর হুঁশ হল বুড়ীর, কাজকম্মে লেগে গেল। সৈনিক তাকে সান্ত্বনা দেয়:

'ব্যস্ত হয়ো না, মা। এখন থেকে আমিই তোমার সুখ সুবিধে দেখব।'

এই বলে সৈনিক যাদু-থলি বের করে নানা রকম খাবার-দাবার চাইল। তারপর থলি থেকে সব বের করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে মা'কে বলল:

'নাও, যত পারো খাও!'

পরদিন সৈনিক আবার যাদু-থলির কাছে গিয়ে রুপো চাইল। তারপর কাজে হাত দিল। নতুন বাড়ী তুলল সে, গরু কিনল ঘোড়া কিনল, সংসারে যা দরকার সব জোগাড় করলে। তারপর একটি কনে দেখল, বিয়ে করে ঘর সংসার করতে লাগল। বুড়ীমা তো নাতিনাতনীদের দেখাশোনা করতে পেয়ে ভারি খুসী।

এই ভাবে ছ'সাত বছর কেটে গেছে। অসুখ হল সৈনিকের। তিনদিন বিছানায় পড়ে। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। অবস্থা খারাপ হতে লাগল। তৃতীয় দিনে সৈনিক দেখল যমরাজ তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে খাঁড়ায় শান দিচ্ছে আর ঘন ঘন তার দিকে তাকাচ্ছে।

যমরাজ বলল, 'তৈরি হও সৈনিক, তোমার জন্যেই এসেছি। প্রাণ নেব তোমার।'

সৈনিক বলল, 'এত তাড়া কিসের? আরও তিরিশ বছর বাঁচতে দাও। ছেলেপুলেদের মানুষ করি, বিয়ে দিই, নাতিনাতনীর মুখ দেখি, তারপর না হয় এসো। এক্ষুণি যে আমার মরা চলবে না।'

'নাহে, সৈনিক, তিনটি ঘণ্টাও আর পরমায়ু নেই তোমার।'

'বেশ, যদি তিরিশ বছর না হয়, অন্তত তিন বছর সময় দাও। কাজ তো আমার কম নয়, সব গুছিয়ে যেতে হবে।'

যমরাজ বলল, 'তিন মিনিটও নয়।'

সৈনিক আর অনুরোধ করল না, কিন্তু মরবার তার একটুও ইচ্ছে ছিল না। অতি কষ্টে বালিশের তল থেকে যাদু-থলিটা বের করে দুলিয়ে সে বলল:

'থলির ভিতর আয়!'

বলতে না বলতেই সৈনিক একটু সুস্থ বোধ করতে লাগল। যম যেখানে দাঁড়িয়েছিল তাকিয়ে দেখে সেখানে কেউ নেই। থলির মধ্যে তাকিয়ে দেখে কি, স্বয়ং যমরাজ বসে।

থলিটা এ'টে বাঁধতেই সৈনিক বেশ সুস্থ হয়ে গেল, ক্ষিদেও ফিরে এল।

বিছানা থেকে নেমে এক টুকরো রুটি কেটে নুন দিয়ে খেয়ে ফেলল সৈনিক। তারপর এক জাগ ক্‌ভাস খেতেই একেবারে সেরে গেল।

'ভালো কথার মানুষ নও, নাককাটা কোথাকার, রুশ সৈনিকের সঙ্গে লাগতে আসার মজাটা এবার টের পাবে।'

'কী করতে চাও আমায় নিয়ে?' থলির ভিতর থেকে আওয়াজ এল।

সৈনিক উত্তর দিল:

'থলিটার জন্যে মায়া হচ্ছে, কিন্তু কী আর করা যায়! বিসর্জনই দিতে হবে। তোমাকে পানা পুকুরে ডুবিয়ে দেব। সারা জীবনেও থলির বাইরে আসতে পারবে না।'

'ছেড়ে দাও, সৈনিক, আরও তিনবছর পরমায়ু দেব।'

'উহুঁ, আর ছাড়ছি না।'

'দোহাই তোমার, ছেড়ে দাও, তোমার কথাই রইল, আরো তিরিশ বছরই না হয় বাঁচতে দেব!'

'বেশ, ছেড়ে দেব শুধু একটি সর্তে—এই তিরিশ বছরের মধ্যে তুমি কারও প্রাণ নিতে পারবে না।'

যম বলল, 'সে হয় না। কারও প্রাণ নেব না তো খাব কী?'

'এই তিরিশ বছর গাছের ফলমূল, ছাল, পাথর খেয়ে কাটাবে।'

যম কোনো উত্তর দিল না। কাজেই সৈনিক জামা জুতো পরে তৈরী হয়ে বলল:

'রাজী যখন হলে না তখন চলো তোমাকে পানা পুকুরে দিয়ে আসি।' বলে থলিটা তুলে নিল কাঁধে।

যম তখন বলে উঠল:

'বেশ তাই হোক, তিরিশ বছরের মধ্যে আমি কারও প্রাণ নেব না। কেবল ফলমূল, ছাল, পাথর খেয়ে মাঠে মাঠে কাটাব। এখন আমায় ছেড়ে দাও।'

'সাবধান, ঠকাবার চেষ্টা করো না যেন।'

সৈনিক যমকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে থলিটা খুলে ছেড়ে দিল। বলল:

'যাও, আমার মত বদলাবার আগেই পালাও!'

যম খাঁড়াটা তুলে নিয়েই বনের মধ্যে দৌড়। মাঠে মাঠে ফলমূল, ছাল, পাথর খুঁজে বেড়াতে লাগল সেখানে। খোঁজে আর কামড়ায়। তাছাড়া আর উপায় কী?

আর লোকেদের তখন আর আনন্দ ধরে না। কারও অসুখ নেই, কেউ মারা যায় না!

এই ভাবে তিরিশ বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে সৈনিকের ছেলেপুলেরা বড় হয়ে উঠল, ছেলেদের বৌ জুটল, মেয়েদের স্বামী। বড়ো হয়ে উঠল সংসার। কারও দরকার সাহায্য, কারও প্রয়োজন উপদেশ, কাউকে বা বুদ্ধি দিতে হয়, সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে কাজ দিতে হয়।

সৈনিকের তাই ভারি কাজ। ভীষণ খুসী। সব দিকেই সৈনিকের ভাগ্য খুলে গেল। গড়গড়িয়ে চলল জীবন। কাজ নিয়েই মেতে আছে সে, মরণের কথা ভাবার সময় কোথায়?

একদিন কিন্তু সত্যিই এসে হাজির হল যম।

'আজ তিরিশ বছর পূর্ণ হল। দিন ফুরিয়েছে, সৈনিক। তৈরি হও, আমি তোমাকে নিতেই এসেছি।'

সৈনিক আর তর্ক করল না।

'আমি সৈনিক, এক ডাকেই খাড়া। দিন যদি ফুরিয়ে থাকে তো বেশ, কফিন নিয়ে এসো।'

যমরাজ এনে হাজির করল একটা ওক কাঠের কফিন, তাতে লোহার হুড়কো লাগান।

ডালা খুলে বলল, 'ঢুকে পড়ো, সৈনিক।'

সৈনিক একেবারে রেগে আগুন। চেঁচিয়ে উঠল:

'সে কী! নিয়মকানুন কিছু জানো না দেখছি! পুরনো সৈনিক হুট্ করেই নিজে থেকে কিছু করে বসবে, এ নিয়ম কোথায় পেলে? সৈন্যদলে নতুন কিছু শেখাতে হলে হাবিলদার আগে নিজে করে দেখায়, তারপরে হুকুম করে। তোমারও ঠিক তেমনি করা উচিত। আগে দেখিয়ে দাও কী করতে হবে, তারপর হুকুম করো!'

কফিনে শুল যমরাজ।

'এই দেখো সৈনিক, এই ভাবে শোবে, পা টান করে মেলে দেবে, হাতদুটো মুড়ে রাখবে বুকের ওপর।'

সৈনিকও ঠিক এইটেই চাইছিল। দড়াম করে কফিনের ডালাটা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল।

বলল, 'নিজেই শুয়ে থাক ওখানেই, আমি এখানে দিব্যি আরামে আছি।'

গাড়ীর ওপর চাপিয়ে নদীর খাড়া পাড়ে নিয়ে গিয়ে কফিনটা সে ফেলে দিল নদীতে।

নদী কফিনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সমুদ্রে। তারপর বছরের পর বছর ধরে সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগল যমরাজ।

আবার সুখেস্বচ্ছন্দে ভরে উঠল মানুষ। সৈনিকের জয়গান করতে লাগল তারা। সৈনিকও আর বুড়ো হয় না। নাতিনাতনীদের বিয়ে দিল সৈনিক, তারপর নাতিনাতনীর ছেলেমেয়েদেরও শেখাতে পড়াতে লাগল। বাড়ীঘর, ক্ষেত খামার নিয়ে বুড়ো সারাদিন ভারি ব্যস্ত, কিছুতেই যেন বুড়োর ক্লান্তি নেই।

একদিন হয়েছে কি, সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠল। ঢেউয়ের ধাক্কায় পাহাড়ের গায়ে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কফিনটা। মরোমরো হয়ে কোনরকমে তীরে এসে পেঁছিল যম। বাতাসের ঝাপটে টলে টলে পড়ে।

তারপর সমুদ্রতীরে শুয়ে, একটু জিরিয়ে কোনোক্রমে গিয়ে পেঁছিল সৈনিকের গ্রামে। গিয়ে খামারে লুকিয়ে রইল। ওঁৎ পেতে রইল কখন সৈনিক বেরয়।

এদিকে মাঠে বীজ বুনতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল সৈনিক। বীজ নেবার জন্যে একটা খালি বস্তা নিয়ে গোলাঘরে গিয়ে পৌঁছতেই যম বেরিয়ে এল।

‘এবার আর আমার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছ না!’ হেসে উঠল যম।

সৈনিক দেখল সত্যিই বিপদ! ভাবল:

“যা হবার তা হবেই। নাককাটাটার হাত থেকে যদি নেহাত ছাড়া নাই পাই, তবু কিছুটা ভয় দেখাতে পারব তো!”

এক ঝটকায় খালি বস্তাটা কোটের তল থেকে বের করে নিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল:

‘ফের ঢুকতে সাধ হয়েছে থলিটায়, তাই না! আবার পানা পুকুরে চুবুনি খাবার ইচ্ছে হয়েছে, নাকি?’

সৈনিকের হাতের ফাঁকা বস্তাটাকে যাদু-থলি মনে করে যম তখন ভীষণ ভয় পেয়ে দে ছুট, দে ছুট। সৈনিকের চোখে পড়তে সে আর রাজী নয়। সেই থেকেই লোকের প্রাণ নিতে যম আসে খুব চুপিসারে। ভাবে, “সৈনিকের চোখে যেন না পড়ি। দেখতে পেলেই পানা পুকুরে চুবুনি না খাইয়ে ছাড়বে না।”

সৈনিক বেশ সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল, লোকে বলে, এখনও সে বেঁচে, মুখে তার হাসি লেগেই আছে।

গপ্পী-বৌ

এক ছিল চাষী আর তার বৌ। বৌটা ভারি গপ্পী ছিল, কোনো কথা পেটে থাকত না। কানে তার কোনো কথা পৌঁছলেই অমনি সেটা সারা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে যেত।

একদিন চাষী তো বনে গেল। বনের মধ্যে নেকড়ে ধরার গর্ত খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ গুপ্তধন পেয়ে গেল। চাষী ভাবল, "এখন কী করি? আমার বৌ তো গুপ্তধনের কথা শুনলেই সারা পাড়ায় রটিয়ে দেবে। জমিদারের কানে কথাটা যাবে — ব্যস — টাকাও আর পেতে হবে না। জমিদারই সবটা গায়েব করবে।"

ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি মাথায় এল। গুপ্তধনটা আবার পুঁতে রেখে জায়গাটা চিহ্ন দিয়ে ফিরে গেল। নদীর কাছে আসতে জালের দিকে তাকিয়ে দেখে, জালের মধ্যে মাছ ছটফট করছে। মাছটা বের করে নিয়ে চাষী আবার

চলল। একটু পরেই তারই পাতা একটা ফাঁদের কাছে এসে দেখে একটা খরগোস তাতে আটকা পড়েছে।

চাষী খরগোসটা বের করে নিয়ে মাছটা সেই জায়গায় রাখল। তারপর খরগোসটা জড়ালে জালের মধ্যে।

বাড়ী ফিরল বেশ রাত হয়ে যাবার পর।

'উনুন জ্বেলে বেশ কিছু সরু চাকলি বানাও তো, তাতিয়ানা!'

'সে কী? সন্ধ্যার পর কেউ কখনো উনুন ধরায় নাকি? এত রাতে কেই বা আবার সরু চাকলি তৈরী করে! খেয়াল দেখো!'

'যা বলছি করো! তর্ক করো না। গুপ্তধন পেয়েছি আমি, আজ রাতেই বাড়ী নিয়ে আসব।'

চাষীর বৌয়ের তো আর খুশি ধরে না। এক নিমেষে উনুন ধরিয়ে সরু চাকলি বানাতে বসে গেল সে।

বলল, 'গরম, গরম খাও গো!'

চাষী একটা করে সরু চাকলি খায় আর বৌয়ের অজান্তে গোটা দু'চার করে থলিতে পোরে, একটা করে খায়, আর গোটা দুই করে রাখে।

চাষীর বৌ বলল, 'আজ যে দেখি তুমি গোগ্রাসে গিলছো, আমি যে ভেজে উঠতেই পারছি না!'

'বহুদূর যেতে হবে গো, গুপ্তধনটাও খুব ভারি, তাই পেট পুরে খেয়ে নিচ্ছি।'

সরু চাকলি দিয়ে থলিটা ভরে নিয়ে চাষী বলল:

'আমার পেট ভরেছে, এবার তুমি কিছু খেয়ে নাও আর চলো বেরিয়ে পড়ি, তাড়াতাড়ি করো।'

খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল বৌ, তারপর দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে বেশ রাত হয়ে গেছে। চাষী আগে আগে যায় আর থলি থেকে একটা একটা করে সরু চাকলি বার করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়।

সরু চাকলিগুলো চোখে পড়ল চাষী বৌয়ের।

'দেখো দেখো, সরু চাকলি হয়ে রয়েছে গাছে!'

'এ আর এমন কি ? এই মাত্র দেখলে না সরু চাকলি বৃষ্টি হচ্ছিল।'

'না, কই দেখিনি তো! আমি মাটিতে চোখ রেখে হাঁটছিলাম, যাতে গাছের শিকড়ে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে না পড়ি।'

চাষী বলল, 'এইখানে একটা খরগোস ধরা ফাঁদ পেতেছিলাম। একবার দেখে আসি চলো তো।'

ফাঁদের কাছে গিয়ে চাষী একটা মাছ বের করে আনল।

'আরে! মাছ এসে কী করে এই ফাঁদে ঢুকল?' চাষীর বৌ জিজ্ঞেস করল।

'তাও জানো না? জলের মাছের মতো ডাঙার মাছও যে আছে!'

'জানতাম না তো! নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না!'

তারপর ওরা এল নদীর ধারে। চাষীর বৌ বলল:

'এখানেই নিশ্চয়ই কোথাও তোমার জাল পাতা আছে। চলো একবার দেখে আসি।'

ওরা যেই জালটা টেনে তুলেছে, দেখে একটা খরগোস।

'মা গো! কী কান্ড!' চাষীর বৌ গালে হাত দিল। 'কী সব হচ্ছে আজ। খরগোস কিনা আটকা পড়ল মাছ-ধরা জালে!'

চাষী বলল, 'এতে অবাক হবার কী আছে? জীবনে যেন জল-খরগোস দেখোনি!'

'সত্যি দেখিনি তো।' ইতিমধ্যে যেখানে গুপ্তধন পোঁতা রয়েছে সেই জায়গাটায় এসে পৌঁছল ওরা। চাষী খুঁড়ে খুঁড়ে টাকার পাত্র বের করে আনল, তারপর যতটা করে পারে টাকাটা ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে চলল বাড়ী।

রাস্তাটা আবার জমিদারের বাড়ীর পাশ দিয়ে। বাড়ীটার কাছে যেতেই ওরা শোনে: 'ব্যা... ব্যা... এ্যা...' করে একটা ভেড়া ডাকছে।

চাষীর বৌ ফিসফিস করে বলল, 'ও বাবা, ওটা কী গো! ভীষণ ভয় করছে আমার!'

'দৌড়ে চলো শীগ্‌গির! জমিদার বাবুকে গলা টিপে মারছে ভূতে। আমাদের যেন ওরা দেখতে না পায়!'

দুজনেই ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে এক দৌড়ে বাড়ী।

টাকা লুকিয়ে রেখে দুজনে ঘুমতে গেল।

চাষী বলল, 'দেখো, তাতিয়ানা, গুপ্তধনের কথা আবার কাউকে বলে বেড়িয়ো না যেন। তাহলে বিপদে পড়তে হবে।'

'কী যে বলো, ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলব না!'

পরদিন ওরা ঘুম থেকে উঠল দেরী করে।

চাষীর বৌ উনুনে আগুন দিয়ে, বালতি নিয়ে গেল জল আনতে।

কুয়োর কাছে পাড়াপড়শীরা জিজ্ঞেস করল, 'ও তাতিয়ানা, আজ এত দেরীতে উনুনে আঁচ পড়ল যে?'

'আর বোলো না, কাল সারারাত বাইরে ছিলাম কিনা, ঘুম ভেঙেছে দেরী করে।'

'কেন, রাতে গিয়েছিলে কোথায়?'

'আমার স্বামী গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে যে, রাতে গিয়েছিলাম টাকা আনতে।'

ব্যস, সারাদিন গ্রামে শুধু ঐ এক আলোচনা: "তাতিয়ানা আর তার স্বামী গুপ্তধন পেয়েছে। দু'বস্তা ভর্তি করে টাকা এনেছে।"

সন্ধ্যাবেলাতেই কথাটা কানে উঠল জমিদারের। জমিদার ডেকে পাঠাল চাষীকে।

'গুপ্তধন পেয়েছো, আমায় জানাওনি কেন?'

চাষী বলল, 'গুপ্তধন? জীবনে কোনোদিন কথাটা কানেও শুনিনি, বাবু।'

জমিদার চীৎকার করে উঠল, 'বাজে কথা রাখো! আমি সব জানি, তোমার বৌই তো সবাইকে বলে বেড়িয়েছে!'

'ওর মাথার ঠিক নেই, বাবু। এমন সব কথা বলে যার মাথামুণ্ডু নেই।'

'বেশ, পরীক্ষা করে দেখছি, দাঁড়াও!'

জমিদার চাষীর বৌকে ডেকে পাঠাল।

'তোমার স্বামী কি গুপ্তধন পেয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, পেয়েছে।'

'তোমরা দু'জনে টাকা আনতে বেরিয়েছিলে রাত্তিরবেলা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বেরিয়েছিলাম।'

‘সব কথা বলো তো দেখি, কী হয়েছিল।’

‘প্রথমে তো আমরা বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, দেখি কী, গাছে গাছে সরু চাকলি ফলে রয়েছে।’

‘সরু চাকলি?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, সরু চাকলি বৃষ্টি হচ্ছিল কিনা। তারপর খরগোস ধরা ফাঁদে দেখি একটা মাছ আটকে রয়েছে। মাছটা আমরা বের করে নিয়ে আবার চলতে লাগলাম। নদীর ধারে এসে জালটা টেনে তুলে দেখি, জালে পড়েছে একটা খরগোস! খরগোসটাও নিয়ে নিলাম। তারপর নদী থেকে খানিকটা দূরে জমি খুঁড়ে আমার স্বামী গুপ্তধন বের করল। আর আমরা দু’থলি ভর্তি টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম। আপনার বাড়ীর পাশ দিয়ে আমরা যখন পেরিয়ে যাচ্ছি, ঠিক তখনই তো হুজুরের গলা টিপে ধরেছিল ভূতে।’

এই না শুনে জমিদার তো ভীষণ রেগে, মাটিতে পা ঠুকে চীৎকার করে বলল:

‘বেরিয়ে যাও এখান থেকে, হাঁদা মেয়ে কোথাকার!’

চাষী বলল, ‘দেখলেন তো, আমার বৌয়ের কোনো কথাই বিশ্বাস করা চলে না। এইভাবেই জীবন কাটাচ্ছি ওকে নিয়ে, অশান্তির শেষ নেই।’

‘খুব বুঝতে পারছি, এবার তুমি বাড়ী যেতে পারো,’ জমিদার হাত নেড়ে বলল।

বাড়ী চলে গেল চাষী। সুখেস্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগল। এখনো পর্যন্ত সে বেঁচে আছে, আর জমিদার বাবুর কথা ভেবে মনে মনে হাসে।

জমিদারের সঙ্গে কাঙালের ভোজন

রবিবারের এক চমৎকার দিন। জনকয়েক চাষী দাওয়ায় বসে গল্প করছিল।

গ্রামের দোকানদারও এসে জুটল সেখানে। এসেই হেন করেছে, তেন করেছে, বড়াই সুরু করে দিল, বলল সে নাকি জমিদারের খাস-কামরাতেও গিয়েছে।

দলের সবচেয়ে কাঙাল চাষীটি কিন্তু বসে বসে হাসে।

'ভারি তো ব্যাপার — না, জমিদারের খাস-কামরায় গেছি! আমি ইচ্ছে করলে জমিদার বাবুর সঙ্গে একাসনে খেয়েও আসতে পারি।'

'কী, জমিদার বাবুর সঙ্গে ভোজন? সারা জীবনেও পারবে না হে!' পয়সাওয়ালাটা বলল চীৎকার করে।

'বলছি খেয়ে দেখিয়ে দেব!'

'কিছুতেই পারবে না!'

তর্ক লেগে গেল ওদের। শেষকালে কাঙাল বলল:

'আচ্ছা, এক হাত বাজি হয়ে যাক। যদি জমিদার বাবুর সঙ্গে বসে খেতে পারি তবে তোমার কালো ঘোড়াটা, বাদামী ঘোড়াটা, দুই আমার। আর যদি না পারি তবে তিন বছর বিনা পয়সায় তোমার কাছে খাটব।'

দোকানদার তো ভারি খুশী।

'ঠিক আছে, আমার কালো ঘোড়াটা, বাদামী ঘোড়াটা বাজি, তার সঙ্গে একটা বাছুরও ফাউ রইল! তোমরা সব সাক্ষী!'

সাক্ষীদের সামনে হাতে হাতে চাপড় মেরে বাজি ধরা হল।

তারপর কাঙাল গেল জমিদার বাবুর কাছে।

'কিছু কথা আছে হুজুর, গোপনে জিজ্ঞেস করতে চাই — একটা সোনার তাল, ধরুন এই আমার টুপির মতো, কত দাম হবে?'

জমিদার বাবুর মুখে আর রা নেই। হাততালি দিয়ে ডেকে বলল:

'ওহে, কে আছো হে, আমাদের জন্যে কিছু মদ পাঠিয়ে দাও শীগ্‌গির! খাবার টাবারও সব দিয়ে যাও! বসো, বসো, লজ্জা করো না, খাও, দাও, যা মন চায় নাও!'

কাঙালের সে কী আদর আপ্যায়ন, যেন এক সম্মানিত অতিথি, আর মনে মনে ছটফট করে জমিদার। কেবল চিন্তা কতক্ষণে ওই সোনার তালটি হস্তগত করবে।

'এবার তাহলে যাও তো বাপু, দৌড়ে সোনার তালটি নিয়ে এসো। তার বদলে আমি এক পুদ* ময়দা আর একটি আধুলি দেব তোমায়।'

---

* পুদ — প্রায় ষোল সের ওজনের রুশীয় মাপ।

‘কিন্তু সোনার তাল তো আমার কাছে নেই। আমি কেবল জিজ্ঞেস করছিলুম আমার টুপির মতো এক তাল সোনার দাম কত হবে।’

জমিদার বাবু তো একেবারে রেগে কাঁই:

‘বেরিয়ে যা, হতভাগা! হাঁদা কোথাকার!’

‘বারে, হাঁদা কোথায়, দেখুন না, আপনি নিজেই আমায় সম্মানিত অতিথির মত আপ্যায়ন করলেন। তাতে আবার এই খাওয়ার জন্যেই দোকানদারও আমায় দুটো ঘোড়া আর একটা বাছুর দেবে।’

এই বলে মনের আনন্দে ফিরে গেল চাষী।

অভাব

এক গাঁয়ে ছিল দুই ভাই চাষী। একজন গরীব আর একজন ধনী। ধনী চাষী গ্রাম ছেড়ে সহরে গিয়ে মস্ত একটা বাড়ী তৈরী করে বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসল। ওদিকে গরীব চাষীর বাড়ীতে মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হত যে একটুকরো রুটিও থাকত না। চাষীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো সারাক্ষণ খিদেয় কাঁদত। সকাল থেকে রাত অবধি চাষী খেটে খেটে হয়রান, জলের তলের মাছগুলো যেমন বরফে মাথা কুটে মরে, চাষীরও সেই দশা। শত চেষ্টাতেও কোন ফল হত না।

একদিন চাষী তার বৌকে বলল:

‘যাই, সহরে গিয়ে দাদাকে বলি, হয়ত কিছু সাহায্য করবে।’

এই ভেবে চাষী গেল ধনী দাদার কাছে।

বলল, 'দোহাই দাদা, কিছু সাহায্য করো। বড় অভাব। একটু রুটিও নেই যে স্ত্রীপুত্রের মুখে দিই। দিনের পর দিন ওরা না খেয়ে থাকে।'

'এ সপ্তাহটা আমার কাছে কাজ করো, তাহলে দেব।'

গরীব চাষী কী আর করে? কাজেই লেগে গেল। জ্বালানি কাঠ কাটে, জল তোলে, ঘোড়াগুলোকে দলাই-মলাই করে, আর উঠোন ঝাঁট দেয়।

সপ্তাহের শেষে বড়লোক দাদা চাষীকে একটা রুটি দিল।

বলল, 'এই নাও তোমার কাজের মজুরি।'

'তা যা দিলে তার জন্যেই ধন্যবাদ।' এই বলে চাষী বেরিয়ে যাবে, এমন সময় ধনী দাদা আবার ডাকল:

'দাঁড়াও দাঁড়াও! কাল আমার বাড়ী তোমাদের নেমন্তন্ন। তোমার বৌকেও এনো। কাল আমার জন্মদিন জানো তো?'

'না ভাই, তা কী করে হয়। তুমি নিজেই জানো, কত বড় বড় সওদাগরেরা নেমন্তন্নে আসবেন ভাল ভাল জুতো, লোম-দেওয়া কোট পরে, আর আমার পায়ে লাপ্‌তি*, গায়ে ছেঁড়া জামা!'

'আরে, তাতে কিছু হবে না! চলে এসো, জায়গা একটা করে দেব,' দাদা বলল।

চাষী বলল, 'বেশ, তাহলে আসব।'

গরীব চাষী বাড়ী ফিরে বৌকে রুটিটা দিয়ে বলল:

'শুনছো বৌ, কাল আমাদের নেমন্তন্ন।'

'তার মানে? কে করলে নেমন্তন্ন?'

'দাদা নেমন্তন্ন করেছে, কাল দাদার জন্মদিন।'

'তা বেশ, যাব।'

পরদিন সকালে উঠে ওরা তো সহরে গেল। ধনী দাদার বাড়ীতে পেঁছে, শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। বহু ধনী অতিথি এর মধ্যেই টেবিলে বসে গেছে, প্রচুর পরিমাণ আয়োজন করেছে বাড়ীর কর্তা। সকলকেই

---

* লাপ্‌তি — গাছের ছাল বুনে তৈরী করা জুতো, সাধারণত সেকালের রাশিয়ায় গরীব চাষীরা পরত।

মুক্তহস্তে দিচ্ছে। কিন্তু গরীব ভাই আর ভাইয়ের বৌয়ের কথা একবারও মনে পড়ল না তার, কিছু খেতেও দিল না। কাজেই বসে বসে ওরা শুধু অন্যের খাওয়া দেখে গেল।

ভোজ শেষ হল। কর্তাগিন্নীকে ধন্যবাদ দিয়ে সবাই টেবিল ছেড়ে উঠতে লাগল। গরীব ভাইও উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত অভিবাদন করল। ধনী অতিথির দল নেশা করে, ফুর্তি করে, কলরব করে গান করতে করতে গাড়ী চড়ে বাড়ী গেল।

আর গরীব ভাই ফিরে চলল খালি পেটে হেঁটে হেঁটে।

বৌকে বলল, 'আমরাও একটা গান ধরি, কেমন?'

'বোকার মতো করো না। ওরা পেটপুরে খেয়েছে তাই গান করছে! তুমি গান গাইতে যাবে কেন?'

'যাই হোক ভাইয়ের জন্মদিন, গান না গেয়ে বাড়ী ফেরা লজ্জার কথা, গান করলে লোকে ভাববে সবার মত আমাকেও যত্ন আত্যি করেছে...'

'তা, ইচ্ছে হয় গান ধরো, কিন্তু আমি বাপু গাইছি নে।'

চাষী গান ধরল, কিন্তু মনে হল যেন দুটো গলা শুনতে পাচ্ছে। তাই গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'ও বৌ, তুমিও বুঝি সরু গলায় আমার সঙ্গে গান ধরেছিলে?'

'তোমার হয়েছে কী বলো তো? গান গাইতে আমার বয়ে গেছে।'

'তাহলে কে গাইল?'

'আমি কী জানি? আচ্ছা, আবার গাও তো এবার আমি শুনব,' চাষীর বৌ উত্তর দিল।

চাষী আবার গাইতে সুরু করল। গাইছে একজন, কিন্তু শোনা যাচ্ছে দুটো গলা। চাষী থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'অভাব, ও অভাব! তুমিই গান ধরছো বুঝি!'

অভাব বলল, 'হ্যাঁ মালিক, আমিই।'

'তাহলে এসো, আমাদের সঙ্গে চলো।'

'তাই যাব মালিক, কখনও তোমায় ছেড়ে যাব না।'

বাড়ী এল চাষী, আর অভাব তাকে শুঁড়ীখানায় যাবার জন্যে ডাকতে লাগল। চাষী বলল:

'উহুঁ, আমার টাকাকড়ি নেই, যাব না।'

'কেন, টাকার কী দরকার? তোমার ভেড়ার চামড়ার কোটটা দেখছো না? ওটার কী দরকার? গ্রীষ্মকাল এসে গেছে। আর তো ওটা পরবে না! তার চেয়ে চলো ওটার বদলে কিছু মদ খেয়ে আসা যাক...'

চাষী আর অভাব তাই শুঁড়ীখানায় গিয়ে কোটটার বদলে মদ খেল।

পরদিন সকালে অভাব মাথার যন্ত্রণায় "বাবারে মারে" করতে লাগল। গত রাত্রের ফল। তারপর সেদিনও আবার মালিককে মদ খেতে যাবার জন্যে টানাটানি করতে লাগল অভাব।

চাষী বলল, 'টাকা নেই।'

অভাব বলল, 'টাকার কী দরকার? তোমার গাড়ীটা আর স্লেজটা নিয়ে চলো, ওতেই হয়ে যাবে!'

কোন উপায় নেই — অভাবের হাত থেকে রেহাই নেই চাষীর। কাজেই গাড়ী আর স্লেজ টেনে নিয়ে চলল শুঁড়ীখানার দিকে। সেখানে গিয়ে সেগুলো বেচে মদ খেল।

পরদিন অভাব মাথার যন্ত্রণায় আরও কাহিল। চাষীকে ডাকে মদ খেয়ে যন্ত্রণা সারাতে। চাষী আর কী করে! সেদিনও মই আর লাঙল বেচে মদ খাওয়া হল। একমাসের মধ্যেই চাষী সব কিছু উড়িয়ে দিল। এমনকি বসতবাড়ীটাও প্রতিবেশীর কাছে বাঁধা রেখে সেই টাকা দিয়ে মদ খাওয়া হল।

কিন্তু তবু অভাব ছাড়ে না। পেড়াপীড়ি করে, চলো যাই, চলো যাই শুঁড়ীখানায়।

'না অভাব, যতোই বলো, আর কিছুই নেই যার বদলে মদ খাওয়া চলতে পারে।'

'কিছু নেই মানে? তোমার বৌয়ের দুটো সারাফান* রয়েছে না? একটা ওর থাক। অন্যটা নিয়ে চলো যাই, মদ খেয়ে আসি।'

---

* সারাফান — হাতকাটা লম্বা ঢোলা মেয়েদের পোষাক।

চাষী সারাফানটা বিক্রি করে মদ খেল, তারপর ভাবল:

"এবার একেবারে পরিষ্কার, চাল নেই, চুলো নেই। গায়ে দেবার জামা নেই, আমারও না বৌয়েরও না।"

অভাব সকালে উঠে দেখে মালিকের কাছে চাইবার মতো আর কিছুই নেই। ডাকল, 'মালিক!'

'কী অভাব, কী চাও?'

'শোনো বলি, তোমার প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে গাড়ীটা আর বলদজোড়া চেয়ে আনো।'

চাষী তাই প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে বলল:

'তোমার গাড়ীটা আর বলদজোড়া আমায় দেবে? তাহলে আমি সারা সপ্তাহ তোমার হয়ে খাটব।'

প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করল, 'কেন? কী দরকার বলো তো?'

'জঙ্গল থেকে কিছু জ্বালানি কাঠ আনব।'

'তা নিয়ে যাও, তবে বেশী বোঝা চাপিও না।'

'না, না, কী যে বলো, অন্নদাতা!'

চাষী বলদ আর গাড়ীটা নিয়ে এল। তারপর চাষী আর অভাব তাতে চড়ে চলে গেল খোলা মাঠে।

অভাব জিজ্ঞেস করল, 'মাঠের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাথরটা কোথায় জানো?'

'তা আর জানব না কেন!'

'তাহলে সিধে ওটার কাছে চলো।'

পাথরটার কাছে পেঁছে চাষী গাড়ী থামাল। গাড়ী থেকে নেমে অভাব চাষীকে পাথরটা তুলতে বলল। চাষী হাঁপায়, অভাব কাঁধ দেয়। পাথরটা তুলেই দেখে একটা গর্ত, সোনায় ভর্তি।

'হাঁ করে দেখছো কি, চটপট্ গাড়ীতে তোলো।'

চাষী লেগে গেল কাজে। সোনা দিয়ে গাড়ীটাকে বোঝাই করে ফেলল। একটি মোহরও আর গর্তে পড়ে রইল না। গর্তটা খালি দেখে চাষী অভাবকে ডেকে বলল:

'দ্যাখো তো অভাব, মোহর কিছু পড়ে রইল কি না?'

অভাব ঝু'কে দেখে বলল:

'কোথায়? আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!'

'ঐ যে কোণে, চক্‌চক্‌ করছে!'

'না তো, দেখতে পাচ্ছি না।'

'গর্তের ভিতরে নামো, তাহলে ঠিক দেখতে পাবে।'

অভাব তো গর্তে নামল। আর যেই না নেমেছে, অমনি চাষী পাথরটা দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিল।

বলল, 'এই বরং ভাল, সঙ্গে নিয়ে গেলে সব টাকা তুমি আজ না হোক কাল মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতে, হতভাগা অভাব!'

তারপর চাষী বাড়ী ফিরল। মাটির নীচের গুদামঘরে সব টাকা জমা করে, প্রতিবেশীর বলদ গাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে চাষী ভাবতে লাগল কী করে একটু গুছিয়ে বসা যায়। কিছু কাঠ কিনে একটা সুন্দর বাড়ী বানাল সে, তারপর দাদার চেয়ে দ্বিগুণ সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

একদিন যায়, দুদিন যায়, চাষী একদিন সহরে গিয়ে ধনী দাদা বৌদিকে নিজের জন্মদিনে নেমন্তন্ন করে এল।

দাদা বলল, 'বলছো কী তুমি? নিজেরই তোমার খাবার কিছু নেই, জন্মদিন পালন করার শখ?'

'আগে সত্যিই কিছু ছিল না দাদা, কিন্তু এখন আছে। ভগবানের কৃপায় তোমার চেয়ে কিছু কম নয়। গিয়ে নয় দেখে এসো!'

'বেশ, যাব!'

পরদিন সকালে ধনী ভাই আর তার বৌ ভাইয়ের বাড়ী জন্মদিনের নেমন্তন্নয় গেল। কপর্দকহীন ভাইয়ের বিরাট সুন্দর বাড়ী দেখে তো ওরা অবাক। সহরের বড় বড় সওদাগরেরও অমন বাড়ী নেই। চাষী ভাইকে বৌদিকে আদর যত্ন করে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাওয়াল।

খাওয়া দাওয়ার পর ধনী দাদা ভাইকে জিজ্ঞেস করল:

'বলো তো শুনি, এত ধনদৌলত পেলে কী করে?'

গরীব চাষী সব কথা খুলে বলল। কেমন করে হতভাগা অভাব জুটেছিল তার সঙ্গে, কেমন করে অভাবের পীড়নে সবকিছু বেচে শুঁড়ীখানায় ছুটতে হত। যখন কেবল প্রাণটুকু শুধু সম্বল, তখন কেমন করে অভাব মাঠের মধ্যে লুকনো ধনদৌলতের সন্ধান দেয়, কী করে অভাবের হাত থেকে রক্ষা পেল।

ধনী দাদা এদিকে হিংসেয় বাঁচে না। মনে মনে ভাবল, "যাই গিয়ে খোলা মাঠে পাথরটা তুলে অভাবকে বার করে দিই, ভাইটাকে আবার সে সর্বস্বান্ত করে দিক, জীবনেও যেন আর আমার সঙ্গে দৌলতের বড়াই করতে না আসে।" তাই সে বৌকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চলল মাঠের দিকে। গর্তটার কাছে এসে, মুখ থেকে পাথরটা একটানে পাশে সরিয়ে বলল:

'যাও অভাব আমার ভাইয়ের কাছে, ভাইটিকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিও!'

অভাব বলল:

'উহুঁ, আমি বরং তোমার কাছেই থাকব। ওর কাছে যাব না। তোমার দয়ামায়া আছে, আমায় ছেড়ে দিলে। আর ঐ হতভাগা আমায় কিনা আটকে রেখেছিল!'

কিছুদিনের মধ্যেই হিংসুক দাদা সর্বস্বান্ত হল। বড়লোকি রইল না, হয়ে গেল কপর্দকহীন কাঙাল।

বরফ-বুড়ো

এক ছিল বুড়ো আর তার দ্বিতীয় পক্ষের বৌ। বুড়োর এক মেয়ে আর দ্বিতীয় পক্ষের বৌয়ের নিজের এক মেয়ে।

সৎমায়েরা কেমন সে তো সবাই জানে। ভাল কাজ করলেও লাথি ঝাঁটা, মন্দ কাজ করলেও লাথি ঝাঁটা। নিজের মেয়েটির বেলায় কিন্তু অন্যরকম—সে যাই করে তাই ভাল: সবেতেই তার আদর।

সূর্য ওঠার আগেই সৎমেয়েটি ওঠে, গরুবাছুরকে খাওয়ায়, জ্বালানি কাঠ আর জল আনে, উনুনে আগুন দেয়, ঘর ঝাঁট দেয়। কিন্তু বুড়ীর আর মন ওঠে না, সবই তার খারাপ, সবই ঠিক তেমনটি নয়।

ঝড় উঠলে ঝড়ও শান্ত হয়ে যায়, কিন্তু বুড়ীমেয়ের রাগ একবার উঠলে আর শান্তি নেই। সৎমা ঠিক করল সৎমেয়েটাকে দুনিয়া থেকেই সরাতে হবে।

বুড়োকে বলে, 'মেয়েটাকে এখান থেকে সরা বাপু। যেখানে খুশি দিয়ে আয়, চোখে যেন না দেখতে হয়! বনে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আয় শীতের মধ্যে।'

বুড়ো মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। কিন্তু জানে কোনো উপায় নেই। বুড়ীকে টলানো যাবে না। কাজেই লাগাম পরিয়ে ঘোড়া যুতে মেয়েকে ডাকল:

'আয় মা, স্লেজে ওঠ।'

অভাগা মেয়েটিকে দূরে বনে নিয়ে বড় ফার গাছের নীচে একটা বরফের স্তূপের মধ্যে ফেলে রেখে ফিরে এল বুড়ো।

সেদিন ভীষণ ঠাণ্ডা। মেয়েটি ফার গাছতলায় বসে বসে কাঁপছে, ঠকঠক করছে। হঠাৎ শোনে আশেপাশের গাছের ডালে চড়বড় আওয়াজ তুলে এগাছ থেকে ওগাছে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে বরফ-বুড়ো। চোখের পলকেই বরফ-বুড়ো মেয়েটি যে গাছতলায় বসেছিল সেই গাছে এসে হাজির।

ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল:

'বাছা, তোর শীত লাগছে না তো?'

মেয়েটি নরম করে উত্তর দিল:

'না, শীতবাবাজি, শীত করছে না।'

বরফ-বুড়ো তখন আরও নিচে নেমে এল। চড়বড় আওয়াজ উঠল আরও জোরে।

'শীত করছে না, মেয়ে? সত্যি শীত করছে না, কন্যে?'

মেয়েটি নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না, তবু বলল:

'না, শীতবাবাজি, ঠাণ্ডা লাগছে না।'

বরফ-বুড়ো আরও নিচে নেমে এল। বরফ পড়ার চড়বড় শব্দ বেড়ে উঠল ভয়ানক।

জিজ্ঞেস করল, 'শীত লাগছে না, মেয়ে? এখনো শীত করছে না, কন্যে? শীত লাগছে না তোর, সুন্দরী?'

মেয়েটি তখন প্রায় জমে অবশ। জিভও যেন নড়ে না। কোনোরকমে বলল:

'না, শীতবাবাজি, শীত করছে না।'

বরফ-বুড়োর তখন দয়া হল। মেয়েটিকে সে ফোলা ফোলা নরম লোমওয়ালা কোট আর গরম লেপের পোষাক দিয়ে জড়িয়ে দিল।

এদিকে তো সৎমা মেয়েটির শ্রাদ্ধের জন্যে ভোজের আয়োজন করেছে। সরু চাকলি ভাজে আর বুড়োকে বলে:

'এই মিন্‌সে, যা বনে যা, মেয়েটাকে নিয়ে আয়, কবর দেব!'

বুড়ো বনে গিয়ে দেখে ঠিক যে জায়গাটায় রেখে গিয়েছিল সেই বড়ো ফার গাছটির নিচে বসে আছে মেয়েটি। দেখাচ্ছে ভারি খুশী খুশী, লাল টুকটুক করছে মুখটি। গায়ে তার একটা লোমের কোট, সর্বাঙ্গে সোনা রুপোর গহনা। পাশেই একটা মস্ত সিন্দুক দামী দামী উপহারে ভরা।

বুড়ো আহ্লাদে আটখানা। মেয়েকে স্লেজে বসিয়ে, ধনসম্পদ তুলে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল সে।

এদিকে সৎমা সরু চাকলি ভাজে আর ওদিকে টেবিলের নীচ থেকে কুকুরটা বলে:

'ভেউ, ভেউ! বুড়োর মেয়ে বাড়ী ফেরে ধনদৌলত নিয়ে, বুড়ীর মেয়ে রইল পড়ে, হবে না তার বিয়ে!'

বুড়ী কুকুরটাকে একটা সরু চাকলি ছুঁড়ে দিয়ে বলে:

'ও কথা নয় কুকুর, বল্: "বুড়ীর মেয়ের বিয়ে হবে, বর আসবে তার, বুড়োর মেয়ে হতচ্ছাড়ি বেঁচে সে নেই আর!" '

কুকুরটা সরু চাকলি খেয়ে ফের শুরু করে:

'ভেউ, ভেউ! বুড়োর মেয়ে বাড়ী ফেরে ধনদৌলত নিয়ে, বুড়ীর মেয়ে রইল পড়ে, হবে না তার বিয়ে!'

বুড়ী আরো কতগুলো সরু চাকলি কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দিল। মারল কুকুরটাকে। তবু কুকুরটার মুখে শুধু ঐ একই কথা...

হঠাৎ ক্যাঁচকেঁচিয়ে উঠল ফটক, দরজা খুলে গেল। বুড়োর মেয়ে ঘরে ঢুকল। জামাকাপড় সোনা রুপো, মণিমাণিক্যে ঝলমল করছে। পেছন পেছন

বুড়ো ঢুকল মস্ত ভারী সিন্দুকটা নিয়ে। তাকিয়ে দেখেই বুড়ীর হাতদুটো ঝুলে পড়ল হতাশে...

'যা মুখপোড়া বুড়ো, গাড়ী জুতে নে! তারপর তোর মেয়েকে যেখানে রেখে এসেছিলি, আমার মেয়েকেও সেখানে রেখে আয়...'

বুড়ীর মেয়েকে স্লেজে বসাল বুড়ো, বনে গিয়ে লম্বা ফার গাছটার তলায় বরফের ঢিপির মধ্যে রেখে দিয়ে এল।

বুড়ীর মেয়ে বসে আছে গাছতলায়। শীতের চোটে দাঁত-কপাটি।

মড়মড়িয়ে ঠকঠকিয়ে, এগাছ থেকে ওগাছে লাফাতে লাফাতে বরফ-বুড়ো এসে হাজির। বুড়ীর মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে:

'বাছা, তোর শীত করছে না তো?'

বুড়ীর মেয়ে কিন্তু বলে:

'মা গো, জমে গেছি! দোহাই শীতবাবাজি, অমন মড়মড়িয়ো না, ঠকঠকিয়ো না...'

বরফ-বুড়ো আরও নিচে নেমে এসে আর জোরে জোরে ঠকঠকায়, চড়বড়ায়। বলল, 'শীত করছে না, মেয়ে? শীত করছে না তো, কন্যে?'

মেয়ে বলল, 'উহু রে, হাত পা জমে গেছে! তুমি চলে যাও, শীতবাবাজি...'

আরো নিচে নেমে এল বরফ-বুড়ো, আরো জোরে ঝাপট মারে, ঠকঠকায়, চড়বড়ায়।

'শীত করছে না তো, কন্যে? শীত লাগছে না তো, সুন্দরী?'

'মা গো, একেবারে হাড় জমে গেছে! দূর হ, হতচ্ছাড়া শীত কোথাকার!'

রাগ হয়ে গেল বরফ-বুড়োর, বুড়ীর মেয়েকে জাপটে ধরে জমিয়ে মেরে ফেলল।

এদিকে সবে ভোর হয়েছে কি হয়নি, বুড়ী বুড়োকে বলে:

'তাড়াতাড়ি ওঠ মুখপোড়া বুড়ো, ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে চট করে যা, মেয়েকে নিয়ে আয়, সোনায় রুপোয় সাজিয়ে আনা চাই...'

বুড়ো তো ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। আর কুকুরছানাটা ওদিকে টেবিলের তল থেকে বলে:

‘ভেউ, ভেউ! বুড়োর মেয়ের বিয়ে হবে, বর আসবে তার, বুড়ীর মেয়ে মরল শীতে, উঠবে নাকো আর।’

বুড়ী কুকুরটাকে একটা পিঠে ছুঁড়ে দিয়ে বলে:

‘ও কথা নয়, বল: “বুড়ীর মেয়ে বাড়ী ফেরে ধনদৌলত নিয়ে...”’

কুকুর কিন্তু আগের মতো বলেই চলল:

‘ভেউ, ভেউ! বুড়ীর মেয়ে মরল শীতে, উঠবে নাকো আর ...’

ফটক খোলার আওয়াজ হল। মেয়েকে এগিয়ে আনবার জন্যে বুড়ী ছুটল হুড়মুড় করে। তারপর ঢাকা সরিয়ে দেখে, স্লেজের ওপর তার মরা মেয়ে শুয়ে।

ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল বুড়ী, কিন্তু আর তো উপায় নেই।

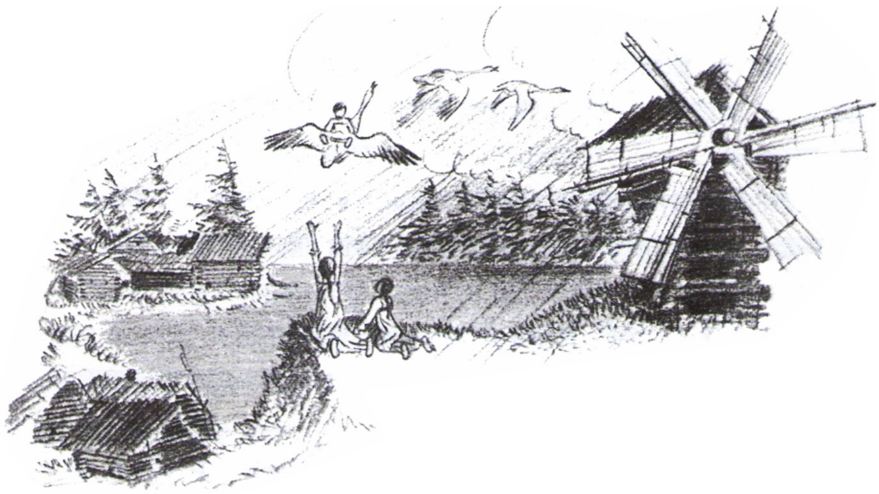

রাজহাঁস আর ছোট মেয়ে

এক ছিল চাষী আর তার বৌ। তাদের এক মেয়ে আর ছোট এক ছেলে।

একদিন মা বলল:

'শোন খুকি, আমরা কাজে যাচ্ছি, ছোট ভাইটিকে দেখিস। ঘর ছেড়ে যাস না, লক্ষ্মী হয়ে থাকবি। তোকে একটা সুন্দর রুমাল কিনে দেব।'

মা বাপ বেরিয়ে যেতেই মেয়েও ভুলে গেল মা কী বলেছে। ছোট ভাইকে জানলার পাশে ঘাসের ওপর বসিয়ে রেখে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে চলে গেল।

হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝাঁক রাজহাঁস এসে বাচ্চাটাকে ডানায় তুলে নিয়ে চলে গেল।

মেয়েটি বাড়ী ফিরে দেখে ভাই তো নেই। হায় হায় করে এদিকে ছোটে, সেদিকে ছোটে, কিন্তু কোথাও নেই!

ভাইয়ের নাম ধরে কত ডাকল, কত কাঁদল, কত করে বলল বাবা মা বকবে। কিন্তু ভাইয়ের কোনো সাড়া নেই।

খোলা মাঠে ছুটে গেল মেয়েটি। দেখে, অনেক দূরে অন্ধকার বন পেরিয়ে একদল হাঁস উড়ে যাচ্ছে। অমনি সে টের পেলে: হাঁসগুলোই তার ভাইকে নিয়ে গেছে, হাঁসেদের তো চিরকালই ভারি বদনাম; লোকে বলে, ভারি দুষ্টু ওরা, ছেলেধরা।

হাঁসের পেছু পেছু ছুটল মেয়েটি। ছুটতে ছুটতে দেখে কি, একটা উনুন।

'উনুন, ও উনুন, বলো না, হাঁসের দল কোন দিকে উড়ে গেছে?'

উনুন বলে:

'আগে আমার একটা কালো পিঠে খাও, তবে বলব।'

'বয়ে গেছে আমার কালো পিঠে খেতে! বাড়ীতে আমরা শাদা ময়দার পিঠেই বলে খাই না...'

উনুন আর কিছু বলল না। মেয়েটি তখন আরো খানিকটা ছুটে গিয়ে দেখে একটা আপেল গাছ।

'আপেল গাছ, আপেল গাছ, বলো না, হাঁসের দল কোন দিকে উড়ে গেছে?'

'আগে আমার বুনো আপেল একটা খাও, তবে বলব।'

'বাড়ীর বাগানের ভালো আপেলই বলে আমরা খেতে চাই না...'

আপেল গাছ তাই কিছু বলল না। মেয়েটি ছুটতে ছুটতে গিয়ে থামল সুজির পাড়, দুধের নদীর কাছে।

'দুধের নদী, সুজির পাড়, বলো না, কোথায় হাঁসের দল উড়ে গেছে?'

'আগে একটু দুধ দিয়ে সুজি খাও, তবে বলব।'

'বাড়ীতে বলে সরও মুখে তুলি না...'

সারাদিন ধরে মেয়েটি মাঠে বনে ছুটে বেড়াল। সন্ধ্যা হয়ে এল। বাড়ী ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। হঠাৎ দেখে মুরগীর পায়ের ওপর এক জানলার এক কুঁড়েঘর, ঘুরছে তো ঘুরছেই।

কুঁড়েঘরের মধ্যে বাবা-ইয়াগা ডাইনী বসে বসে শণ নুড়ির সুতো কাটছে। ভাইটি বসে আছে বেঞ্চিতে, রুপোর আপেল নিয়ে খেলা করছে।

ঘরে ঢুকল মেয়েটি।

'প্রণাম হই, ঠাকুমা!'

'আয় বাছা, আয়, তা এখানে কেন?'

'জলায় জলায় ঘুরছিলাম, জামাটা ভিজে গেছে, তাই শুকিয়ে নিতে এসেছি।'

'বস্ তাহলে, একটু শণ নুড়ির সুতো কেটে দে।'

মেয়েটির হাতে তকলি দিয়ে বেরিয়ে গেল বাবা-ইয়াগা। মেয়েটি বসে বসে সুতো কাটছে, এমন সময় একটা ইঁদুর উনুনের তলা থেকে বেরিয়ে এসে বলল:

'মেয়ে, ও মেয়ে, আমায় একটু পায়েস দে তো, তবে একটা কথা বলব।'

মেয়েটি একটু পায়েস দিল। পায়েস পেয়ে ইঁদুর বলল:

'বাবা-ইয়াগা চানের ঘরে আগুন জ্বালাতে গেছে। তোকে ধোবে পাকলাবে, উনুনে চড়াবে, ভেজে খাবে। তারপর তোর হাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়াবে।'

ভয়ে মেয়েটি তো কেঁপে কেঁপে, কেঁদে কেঁদে সারা। ইঁদুর বলল:

'আর দেরি করিস না, এই ফাঁকে ভাইকে নিয়ে পালা। আমি তোর হয়ে সুতো কেটে দিচ্ছি।'

ভাইকে কোলে নিয়ে ছুটল মেয়ে। এদিকে বাবা-ইয়াগা থেকে থেকে জানলায় এসে জিজ্ঞেস করে:

'সুতো কাটছিস তো, বাছা?'

ইঁদুর উত্তর দেয়:

'হ্যাঁ ঠাকুমা, কাটছি...'

তারপরে তো চানের ঘরে আগুন জেবলে মেয়েটিকে নিতে এল বাবা-ইয়াগা। কিন্তু ঘর ওদিকে খালি!

বাবা-ইয়াগা হাঁসের দলকে ডেকে বলল:

'শীগ্‌গির ধর্ গিয়ে! ভাইকে নিয়ে বোন পালাল!'

ভাইকে নিয়ে মেয়েটি এসে থামল দুধ-নদীর কাছে। দেখে কী, উড়ে আসছে হাঁসের দল।

মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল, 'ও নদী, মা আমার, লুকিয়ে রাখো!'

'আমার সুজি আগে খাও।'

খানিকটা সুজি খেল মেয়েটি, ধন্যবাদ দিল। দুধ-নদী তখন সুজির পাড়ে তাদের লুকিয়ে রাখল।

দেখতে না পেয়ে উড়ে চলে গেল হাঁসের দল।

ভাইকে নিয়ে মেয়েটি আবার দৌড়তে সুরু করল। হাঁসের দল কিন্তু বাঁক নিয়ে ফিরে আসছে ততক্ষণে। এই ওদের দেখে ফেলে বুঝি। সর্বনাশ! কী উপায়? মেয়েটি ছুটল আপেল গাছের কাছে।

'আপেল গাছ, আপেল গাছ, লুকিয়ে রাখো আমায়!'

'আগে আমার বুনো আপেল খাও, তবে!'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি করে একটা আপেল খেল, ধন্যবাদ দিল। আপেল গাছ তখন ডাল দিয়ে ঘিরল, পাতা দিয়ে ঢাকল।

দেখতে না পেয়ে উড়ে চলে গেল হাঁসের দল।

ভাইকে কোলে নিয়ে আবার দৌড়তে সুরু করল মেয়েটি। ছোটে, ছোটে, প্রায় এসে গেছে, এমন সময় ওদের দেখে ফেলল হাঁসেরা। ডাক ছেড়ে ডানা ঝাপটে সোঁ করে এসে ছোট ভাইটিকে প্রায় ছিনিয়ে নেয় আর কি!

মেয়েটি দৌড়তে দৌড়তে উনুনের কাছে গেল।

'উনুন, ও উনুন, লুকিয়ে রাখো আমায়!'

'আগে আমার কালো পিঠে খাও, তবে।'

তাড়াতাড়ি করে মেয়েটি একটা পিঠে মুখে পুরে ভাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ল উনুনের পেটের ভিতর।

হাঁসের দল ওড়ে আর ওড়ে, ডাকে আর ডাকে, তারপর খালি হাতেই ফিরে গেল বাবা-ইয়াগার কাছে।

মেয়েটি উনুনকে ধন্যবাদ দিয়ে ভাইকে কোলে নিয়ে ছুটে এল বাড়ীতে।

বাবা আর মাও বাড়ী ফিরে এল তখুনি।

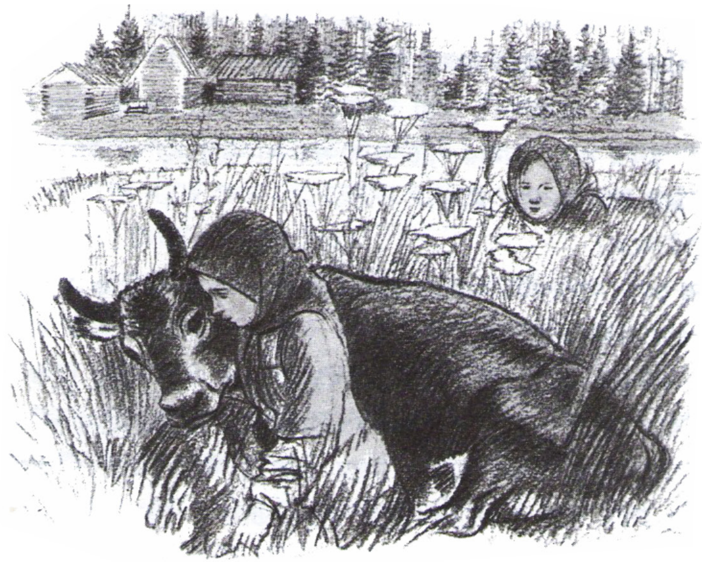

হাভ্রোশেচ্কা

পৃথিবীতে কেউ ভাল কেউ মন্দ। কেউ আবার এতই খারাপ, যে লজ্জাও নেই।

খুকুমণি হাভ্রোশেচ্কা পড়েছিল এই রকম সব লোকের পাল্লায়। হাভ্রোশেচ্কা ছিল অনাথ। ওরা তাকে নিয়ে গিয়ে পালে আর কেবল খাটিয়ে মারে। সুতো কাটে সে, কাপড় বোনে, ঘরের কাজ করে, সব কাজই তার ওপর।

বাড়ীর গিন্নীর তিন মেয়ে। বড়োটির নাম এক-চোখো, মেজোর নাম দু-চোখো আর ছোটোটির নাম তিন-চোখো।

তিন বোন সারাদিন কুটোটি নাড়ে না। কেবল ফটকের পাশে বসে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখে। খুকুমণি হাভ্রোশেচ্কা ওদের জন্যে জামা সেলাই করে, সুতো কাটে, কাপড় বোনে। কিন্তু তার বদলে দুটো মিষ্টি কথাও কখনো শুনতে পায় না।

খুকুমণি হাভ্রোশেচ্কা চলে যেত মাঠে। তারপর নিজের দাগ-ফুটকি গরুটার গলা জড়িয়ে ধরে মনের দুঃখ জানাত:

'গরু আমার মা-জননী, ওরা আমায় মারে, বকে, খেতে দেয় না, কাঁদাও বারণ। কালকের মধ্যে আমায় পাঁচ পুদ শণ পাকিয়ে সুতো কেটে, ধুয়ে, শাদা করে গুটিয়ে ঘরে তুলতে হবে।'

গরুটি বলে:

'বলি শোন সুন্দরী। আমার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে আয়, দেখবি কাজ হয়ে গেছে।'

গরু যা বলে, তাই হয়। হাভ্রোশেচ্কা এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে আসে। দেখে সব তৈরী: বোনা, ধোয়া, গোটানো — সব।

হাভ্রোশেচ্কা তখন গাঁঠরি নিয়ে গিন্নীর কাছে যায়। গিন্নী তাকিয়ে দেখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সিন্দুকে তুলে রাখে, তারপর ফের আরও কাজ ঘাড়ে চাপায়।

খুকুমণি হাভরোশেচকা আবার যায় গরুটির কাছে। গলা জড়িয়ে আদর করে, তারপর এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে আসে। তৈরী গাঁঠরিটা তুলে নিয়ে আবার গিন্নীর কাছে ফিরে যায়।

বুড়ী একদিন এক-চোখোকে ডেকে বলল:

'যা তো আমার সোনা, যা তো আমার মণি, দেখে আয় কে ওর কাজ করে দেয়। কে ওর কাপড় বোনে, সুতো কাটে, গুটিয়ে দেয়।'

হাভ্রোশেচ্কার সঙ্গে বনে গেল এক-চোখো, মাঠে গেল, কিন্তু মা'র হুকুম ভুলে গিয়ে সে ঘাসের ওপর রোদ পোহাল, গা গড়াল। আর হাভ্রোশেচ্কা ফিস্ফিস করে বলে:

'ঘুমো রে চোখ! ঘুমো রে চোখ!'

এক-চোখোর চোখ বুজে গেল। এক-চোখো ঘুমোয় আর ওদিকে গরু শণ থেকে সুতো কাটে, কাপড় বোনে, তারপর ধুয়ে গুটিয়ে তৈরী করে রাখে।

গিন্নী কিছুই জানতে পারল না। তাই পরদিন মেজো মেয়েকে ডেকে বলল:

'সোনা আমার, মণি আমার, গিয়ে দেখ তো কে ঐ অনাথটার কাজ করে দেয়।'

দু-চোখো গেল হাভ্‌রোশেচ্‌কার সঙ্গে। কিন্তু মা'র হুকুম ভুলে গিয়ে সে ঘাসের ওপর রোদ পোহাল, গা গড়াল। আর হাভ্‌রোশেচ্‌কা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে:

'ঘুমো রে চোখ এটা, ঘুমো রে চোখ ওটা!'

দু-চোখোর চোখ বুজে গেল। দু-চোখো ঘুমোয় আর ওদিকে গরুর সুতো কাটা, কাপড় বোনা, ধোয়া, গুটনো শেষ।

বুড়ী রেগে আগুন। তিন দিনের দিন তার ছোট মেয়ে তিন-চোখোকে পাঠাল। আর হাভ্‌রোশেচ্‌কার ঘাড়ে চাপাল আরো বেশী কাজ।

তিন-চোখো সারাদিন রোদে রোদে লাফালাফি করে খেলল। তারপর রোদ্দুরে হয়রান হয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল।

হাভ্‌রোশেচ্‌কা গান ধরল:

'ঘুমো রে চোখ এটা, ঘুমো রে চোখ ওটা!'

কিন্তু তিন নম্বর চোখটার কথা ওর এক্কেবারে মনে ছিল না।

তিন চোখোর দুচোখে ঘুম এসে গেল। কিন্তু তৃতীয় চোখটা জেগে জেগে সব দেখতে লাগল। দেখল মেয়েটি গরুর এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে এসেই তৈরী পোঁটলাটা তুলে নিল।

তিন-চোখো বাড়ী এসে যা যা দেখেছে মাকে বলল।

বুড়ী আহ্লাদে আটখানা। পরদিনই স্বামীকে গিয়ে বলল:

'দাগ-ফুটকি গরুটাকে বাপু জবাই করো!'

বুড়ো তো কথা শুনে থ। একথা বলে, ওকথা বলে:

'বলিস কী বুড়ী, ভীমরতি হয়েছে নাকি? বকনা গরু, ভালো গরু!'

'মেরে ফেলো, কোনো কথা শুনতে চাই না!'

বুড়ো কী আর করে! ছুরি শান দিতে বসল। হাভ্‌রোশেচ্‌কা সব টের পেয়ে দৌড়ে মাঠে গিয়ে গরুর গলা জড়িয়ে বলে:

'গরু আমার মা-জননী, তোমায় ওরা কেটে ফেলবে বলছে।'

গরু বলল:

'তোকে বলি সুন্দরী, আমার মাংস খাস না। আমার হাড়গুলো জড়ো করে

রুমালে বেঁধে গোর দিস বাগানে। আমায় কোনো দিন ভুলিস না, রোজ জল দিস সেখানে।'

বুড়ো গরুটাকে কাটল। গরু যা বলেছিল হাভ্‌রোশেচ্‌কা সব তাই করল। না খেয়ে কাটাল সে, মাংস মুখে তুলল না। হাড়গুলো রুমালে বেঁধে কবর দিল বাগানে। রোজ গিয়ে জল দিত।

সে হাড় থেকে হল একটি আপেল গাছ। সে কী গাছ! আপেল তার রসে রসাল, নুয়ে আসে রুপোর ডাল, সোনার পাতায় শনশন। পথের লোক থমকে দাঁড়ায়, কাছের লোক চেয়ে দেখে।

কত দিন যায়। একদিন এক-চোখো, দু-চোখো আর তিন-চোখো বাগানে বেড়াচ্ছে, এমন সময় ঘোড়ায় চেপে কে আসে, না এক বীর তরুণ — কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, অনেক তার ধনদৌলত। রসে ভরা আপেলগুলো দেখে সে রগড় করে বলল:

'সুন্দরীরা শোন, আপেল পেড়ে দেবে যে, আমার কনে হবে সে!'

তিন বোন অমনি আথালিপাথালি ছুট, এ আগে যায় তা সে আগে ছোটে।

আপেলগুলো ছিল নিচে হাতের নাগালে, হঠাৎ সেগুলো উঠে গেল উঁচুতে মাথার ওপরে।

তিন বোন তখন ঝাঁকিয়ে পাড়তে চায় — ঝুরঝুরিয়ে চোখে এসে পড়ে শুধু পাতা। হাত বাড়িয়ে ছিঁড়তে চায় — ডালপালায় আটকে যায় বেণী। যতই ঝাঁপায় যতই লাফায় — আপেল আর পাড়তে পারে না, ছড়ে যায় শুধু হাত-পা।

তখন এগিয়ে গেল খুকুমণি হাভ্‌রোশেচ্‌কা। নুয়ে এল ডালপালা, নেমে এল আপেলগুলো। বীর তরুণটিকে আপেল এনে দিল হাভ্‌রোশেচ্‌কা। তরুণ তাকে বিয়ে করল। সেদিন থেকে সুখেস্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল হাভ্‌রোশেচ্‌কা।

আলিওনুশকা বোন আর ইভানুশকা ভাই

এক বুড়ো আর বুড়ী। তাদের একটি মেয়ে আলিওনুশকা, একটি ছেলে ইভানুশকা।

বুড়োবুড়ী মারা গেল। সংসারে আলিওনুশকা ইভানুশকার আর কেউ রইল না।

আলিওনুশকা ছোট ভাইয়ের হাত ধরে কাজে বেরিয়ে পড়ল। চলেছে তারা দূরের পথ ধরে, মস্ত মাঠ পেরিয়ে; ভারি তেষ্টা পেল ইভানুশকার।

‘বড় তেষ্টা পেয়েছে রে দিদি!’

‘দাঁড়া ভাইটি, কুয়ো আসুক।’

যায়, যায়, সূয্যি মাথার পরে, কুয়ো অনেক দূরে, কেবলি তাপ বাড়ে, কেবলি ঘাম ঝরে। দেখে, একটা জলভরা গরুর খুর।

'এই জলটা খাই দিদি?'

'না ভাই, খাস্‌নে, তাহলে বাছুর হয়ে যাবি!'

ইভানুশকা দিদির কথা মেনে নিয়ে চলল এগিয়ে।

সূয্যি মাথার পরে, কুয়ো অনেক দূরে, কেবলি তাপ বাড়ে, কেবলি ঘাম ঝরে। দেখে, একটা জলভরা ঘোড়ার খুর।

'এই জলটা খাই দিদি?'

'না ভাই, খাস্‌নে, ঘোড়ার বাচ্চা হয়ে যাবি!'

নিঃশ্বাস ফেলল ইভানুশকা। আবার চলল এগিয়ে।

হাঁটছে তো হাঁটছেই, সূয্যি মাথার পরে, কুয়ো অনেক দূরে, কেবলি তাপ বাড়ে, কেবলি ঘাম ঝরে। দেখে, একটা জলভরা ছাগলের খুর।

ইভানুশকা বলে:

'আর পারি না দিদি, এই জলটা খাই?'

'না ভাই, খাস্‌নে, ছাগলছানা হয়ে যাবি!'

ইভানুশকা এবার আর দিদির কথা না শুনে ছাগলের খুরের জলটা খেয়ে ফেলল।

খেতেই ছাগলছানা হয়ে গেল ইভানুশকা...

আলিওনুশকা ভাইকে ডাকে, ভাইয়ের বদলে ছুটে এল এক ধবল পানা ছাগলছানা।

আলিওনুশকা কাঁদতে লাগল। খড়ের গাদায় বসে বসে কাঁদে আর ছাগলছানাটা তার চারপাশে লাফিয়ে বেড়ায়।

ঠিক সেই সময় এক সওদাগর যাচ্ছিল ঐ রাস্তা দিয়ে।

বলল, 'কাঁদছ কেন, সুন্দরী কন্যে?'

আলিওনুশকা তার দুঃখের কথা খুলে বলল।

সওদাগর বলল:

'তুমি আমায় বিয়ে করো। সোনায় রুপোয় সাজিয়ে রাখব, আর ছাগলছানাটি আমাদের কাছে থাকবে।'

ভেবেচিন্তে সওদাগরকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল আলিওনুশকা।

সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটতে লাগল। ছাগলছানাটাও ওদের কাছেই থাকে। আলিওনুশকার সঙ্গে একই থালা একই বাটি থেকে সব খায়।

একদিন সওদাগর বাড়ী নেই। হঠাৎ কোথা থেকে এক ডাইনী এসে হাজির। আলিওনুশকার জানলার নীচে দাঁড়িয়ে আদর করে ডাকে, বলে: চল নদীতে চান করব।

আলিওনুশকাকে নদীতে নিয়ে এল ডাইনী, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, গলায় একটা বড়ো পাথর বেঁধে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীতে।

তারপর নিজে আলিওনুশকা সাজল, তার জামাকাপড় পরে বাড়ী ফিরে গেল। কেউ ওকে ডাইনী বলে চিনতেও পারল না। সওদাগর বাড়ী ফিরল, কিন্তু সেও কিছু ধরতে পারল না।

কেবল ছাগলছানাটা জানত কী হয়েছে। বেচারা মাথা নীচু করে ঘুরে বেড়ায়, খায় না, দায় না। সকাল সন্ধ্যায় নদীর পারে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর ডাকে:

‘আলিওনুশকা দিদিরে!
সাঁতরে আয় নদীরে...’

টের পেয়ে ডাইনী রোজ তার স্বামীকে বলে: মার বাপু, মেরে ফেল ছাগলটাকে... ছানাটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল সওদাগরের। কিন্তু ডাইনীটা খালি ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করে, খালি পেড়াপীড়ি করে, উপায় কী, তাই শেষপর্যন্ত সে সায় দিল।

বলল, ‘বেশ, মার ওটাকে...’

মস্ত আগুন জ্বালাল ডাইনী, বড়ো বড়ো কড়াই চাপল, বড়ো বড়ো ছুরিতে শান পড়ল...

ছাগলছানাটা দেখল তার মরণ ঘনিয়েছে। সওদাগরকে বলল:

‘মরার আগে আমায় একটু ছেড়ে দাও নদীতে যাব, জল খাব, গা ধোব।’

'বেশ, যাও।'

ছাগলছানাটা দৌড়ে নদীর ধারে গিয়ে করুণস্বরে কাঁদতে লাগল:

'আলিওনুশকা দিদিরে!
সাঁতরে আয় নদীরে।
আগুন জ্বলে উনানে,
কড়াই চাপে ভিয়ানে,
ঝন ঝন ঝন ছুরি,
বুঝি এবার মরি!'

আলিওনুশকা জলের ভিতর থেকে উত্তর দিল:

'ইভানুশকা ভাইটি মোর!
তলায় টানে ভারী পাথর,
ঘাসেতে পা চেপে ধরে,
হলুদ বালি বুকের পরে।'

ছাগলছানাটা কোথায় খুঁজে না পেয়ে ডাইনীটা চাকরকে ডেকে বলল:

'যা শীগ্‌গির, ছাগলছানাটা আমায় খুঁজে এনে দে।'

নদীর কাছে গিয়ে চাকর দেখে, ছাগলছানাটা নদীর পার ধরে দৌড়চ্ছে আর করুণস্বরে কাঁদছে:

'আলিওনুশকা দিদিরে!
সাঁতরে আয় নদীরে।
আগুন জ্বলে উনানে,
কড়াই চাপে ভিয়ানে,
ঝন ঝন ঝন ছুরি,
বুঝি এবার মরি!'

আর নদীর ভিতর থেকেও স্বর ভেসে আসছে:

'ইভানুশকা ভাইটি মোর!
তলায় টানে ভারী পাথর,
ঘাসেতে পা চেপে ধরে,
হলুদ বালি বুকের পরে।'

চাকরটি তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে কী দেখেছে, কী শুনেছে — সব কথা মনিবকে খুলে বলল। সওদাগর লোকজন জড়ো করে নদীর পারে চলে গেল। তারপর রেশমের জাল ফেলে টেনে তুলল আলিওনুশকাকে। গলার পাথরটা খুলে, ঝরণার জলে চান করিয়ে সুন্দর করে কাপড় পরিয়ে দিল আলিওনুশকাকে। জীবন ফিরে পেল আলিওনুশকা, রূপ তার আরো যেন ফুটে বেরুল।

ছাগলছানাটা আনন্দে তিনবার ডিগবাজী খেতেই আবার হয়ে গেল সেই ছোট্ট খোকন ইভানুশকা।

ডাইনীটাকে তখন একটা বুনো ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে খোলা মাঠে ছেড়ে দেওয়া হল।

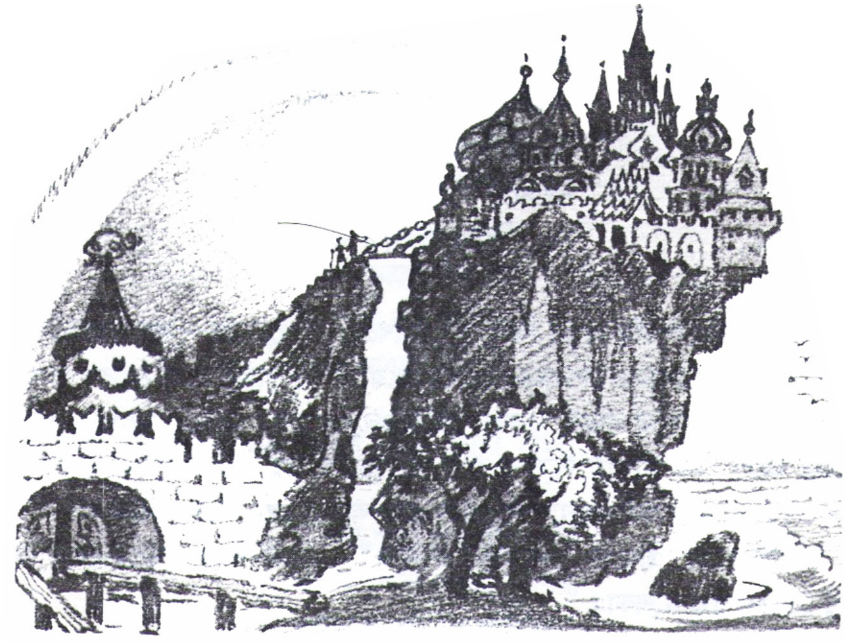

ব্যাঙ রাজকুমারী

অনেকদিন আগে এক রাজা ছিলেন। তাঁর তিন ছেলে। সবাই যখন সাবালক হল তখন একদিন রাজা তাদের ডেকে বললেন:

'দেখো বাছারা, আমি তোমাদের বিয়ে দিয়ে মরবার আগে নাতিনাতনীর মুখ দর্শন করে যেতে চাই।'

ছেলেরা উত্তর দিল, 'সে তো ভাল কথা বাবা, আশীর্বাদ করুন। বলুন, কাকে বিয়ে করব?'

'তোমরা প্রত্যেকে এক একটি করে তীর নিয়ে খোলা মাঠে গিয়ে ছুঁড়বে। যার তীর যেখানে পড়বে তার ভাগ্য সেখানে বাঁধা।

রাজপুত্ররা বাবাকে প্রণাম করে একটি করে তীর নিয়ে খোলা মাঠে চলে গেল। ধনুক টেনে তীর ছুঁড়ল।

বড় রাজপুত্রের তীর পড়ল এক আমীরের বাড়ীর উঠোনে। আমীরের মেয়ে সেটি তুলে নিলে। মেজ রাজপুত্রের তীর পড়ল এক সওদাগরের বাড়ীর উঠোনে। সওদাগরের মেয়ে সেটি তুলে নিলে।

কিন্তু ছোট রাজপুত্র ইভানের তীর উঁচুতে উঠে কোথায় যে গেল, কে জানে। তীরের খোঁজে রাজপুত্র চলে আর চলে। যেতে যেতে একটা জলার কাছে এসে দেখে একটা ব্যাঙ তীরটা মুখে করে বসে আছে।

রাজপুত্র বলল, 'ব্যাঙ, ও ব্যাঙ, আমার তীর ফিরিয়ে দাও।'

আর ব্যাঙ বলে, 'আগে বিয়ে করো আমায়!'

'সেকী, একটা ব্যাঙকে বিয়ে করব কী?'

'বিয়ে করো, সেই যে তোমার ভাগ্য।'

রাজপুত্রের ভীষণ দুঃখ হল। কিন্তু কী আর করে। ব্যাঙটাকে তুলে বাড়ী নিয়ে এল। রাজা তিনটে বিয়ের উৎসব করলেন: বড়জনের বিয়ে দিলেন আমীরের মেয়ের সঙ্গে, মেজজনের সওদাগরের কন্যার সঙ্গে আর বেচারী রাজপুত্র ইভানের বিয়ে হল একটা ব্যাঙের সঙ্গে।

একদিন রাজা ছেলেদের ডেকে বললেন:

'আমি দেখতে চাই, তোমাদের কোন বৌয়ের হাতের কাজ ভালো। কাল সকালের মধ্যেই সবাই একটা করে জামা সেলাই করে দিক।'

ছেলেরা বাবাকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

রাজপুত্র ইভান বাড়ী গিয়ে মাথা হেঁট করে বসে রইল। ব্যাঙটা থপ্‌থপ্‌ করে এসে জিজ্ঞেস করে:

'কী হল রাজপুত্র, মাথা হেঁট কেন? কোনো বিপদে পড়েছো বুঝি?'

'বাবা বলেছেন, তোমায় কাল সকালের মধ্যে একটা জামা সেলাই করে দিতে হবে।'

ব্যাঙ বলল:

‘ভাবনা নেই, রাজপুত্র ইভান, বরং ঘুমিয়ে নাও, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।’

রাজপুত্র শুতে গেল। আর ব্যাঙ করল কী, থপ্‌থপিয়ে বারান্দায় গিয়ে, ব্যাঙের চামড়া খসিয়ে হয়ে গেল যাদুকরী ভাসিলিসা — রূপবতী সেই, তুলনা তার নেই!

যাদুকরী ভাসিলিসা হাততালি দিয়ে ডেকে বললে:

‘দাসীবাঁদীরা জাগো, কোমর বেঁধে লাগো! কাল সকালের মধ্যেই আমায় একটা জামা সেলাই করে দেওয়া চাই, ঠিক যেমনটি আমার বাবা পরতেন।’

পরদিন সকালে রাজপুত্র ইভান উঠে দেখে, ব্যাঙ থপ্‌থপ্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর টেবিলের ওপর তোয়ালে মোড়া একটি জামা। রাজপুত্রের আর আনন্দ ধরে না। জামাটা নিয়ে সোজা গেল বাপের কাছে। রাজা তখন অন্য ছেলেদের উপহার নিচ্ছেন। বড় ছেলের জামাটা নিয়ে রাজা বললেন:

‘এ জামা পরে দীন দরিদ্রে।’

মেজ রাজপুত্র জামা মেলে ধরতে রাজা বললেন:

‘এটা পরে বাইরে যাওয়া চলে না।’

এবার রাজপুত্র ইভান তার জামাটা মেলে ধরল। সে জামায় সোনায় রুপোয় চমৎকার নক্সা তোলা। চোখ পড়তেই রাজা বললেন:

‘একেই বলে জামা! পালপার্বণে পরার মতো।’

বড় দু’ভাই বাড়ী যেতে যেতে বলাবলি করে:

‘রাজপুত্র ইভানের বৌকে নিয়ে আমাদের হাসাহাসি করা ঠিক হয়নি। ব্যাঙ নয় ও, মায়াবিনী ...’

আবার রাজা তিন ছেলেকে ডেকে পাঠালেন।

‘তোমাদের বৌদের বলো কাল সকালের মধ্যে আমায় রুটি বানিয়ে দিতে হবে। কে সবচেয়ে ভাল রাঁধে দেখব।’

আবার ছোট রাজপুত্র ইভান মাথা হেঁট করে বাড়ী ফিরে এল। ব্যাঙ বললে:

‘রাজপুত্র, এত মনভার কেন?’

‘রাজামশাই বলেছেন কাল সকালের মধ্যে রুটি বানিয়ে দিতে হবে।’

‘ভাবনা করো না, রাজপুত্র। শুতে যাও, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।’

অন্য বৌরা ব্যাঙকে নিয়ে আগে হাসাহাসি করেছে। এবার কিন্তু একটা বুড়ী দাসীকে পাঠিয়ে দিল দেখে আসতে, কী করে ব্যাঙ রুটি বানায়।

ব্যাঙ কিন্তু ভারি চালাক। টের পেয়ে গেল ওদের মতলব। তাই ময়দা মেখে লেচি তৈরী করে নিয়ে চুল্লির উপরটা ভেঙে সবটা লেচি সেই গর্তে ঢেলে দিল। বুড়ী দাসী দৌড়ে গিয়ে রাজবধূদের খবর দিলে। বৌরাও ঠিক তাই করতে লাগল।

তারপর ব্যাঙ কিন্তু ওদিকে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে যাদুকরী ভাসিলিসা হয়ে গেল। হাততালি দিয়ে ডেকে বলল:

‘দাসীবাঁদীরা জাগো, কোমর বেঁধে লাগো! সকালের মধ্যেই আমায় একটা শাদা ধবধবে নরম রুটি বানিয়ে দিতে হবে, ঠিক যেমনটি আমি বাড়ীতে খেতাম।’

পরদিন সকালে রাজপুত্র উঠে দেখে টেবিলের ওপরে এক রুটি, গায়ে তার নানা রকম নক্সা: চারিপাশে কত শত মূর্তি, উপরে নগর আর তোরণ।

রাজপুত্র ভারি খুশী। তোয়ালে মুড়ে রুটি নিয়ে গেল বাবার কাছে। রাজা তখন বড় ছেলেদের রুটি নিচ্ছিলেন। বুড়ী দাসীর কথা মতো বড় দুই ভাইয়ের বৌ ময়দাটা সোজা চুল্লির ভিতর ফেলে দিয়েছিল। ফলে যা হল সে এক পোড়া-ধরা এক একটা তাল। রাজা বড় ছেলের হাত থেকে রুটিটা নিয়ে দেখেই পাঠিয়ে দিলেন নোকর মহলে। মেজ রাজপুত্রের রুটিরও সেই একই দশা হল। আর ছোট রাজপুত্র ইভান রাজার হাতে রুটি দিতেই রাজা বলে উঠলেন:

‘একেই বলে রুটি! এই হল পালপার্বণে খাওয়ার মতো।’

রাজা তার পরদিন তিন ছেলেকে বৌ নিয়ে নেমন্তন্নে আসতে বললেন।

রাজপুত্র ইভান আবার মুখভার করে বাড়ী ফিরল, দুঃখে মাথা হেঁট করল। ব্যাঙ থপ্‌থপ্‌ করে লাফায়:

‘গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ, রাজপুত্র, মন খারাপ কেন তোমার ? বাবা বুঝি কিছু মন্দ কথা বলেছেন!’

'ব্যাঙ বৌ, ব্যাঙ বৌ, মন খারাপ না হয়ে করি কী? বাবা চান তোমাকে নিয়ে আমি নেমন্তন্নে যাই। কিন্তু লোকজনের সামনে তোমায় দেখাই কী করে?'

ব্যাঙ বলে:

'রাজপুত্র, ভাবনা করো না; একাই যেও নেমন্তন্নে, আমি পরে যাব। খট্‌খট্‌ দুমদাম শব্দ হলে ভয় পেও না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো, "ও আমার ব্যাঙ বৌ আসছে কৌটোয় চড়ে।" '

রাজপুত্র ইভান তাই একাই গেল। বড় দুই ভাই গেল গাড়ী হাঁকিয়ে, বৌ জাঁকিয়ে। কত বেশ, কত ভূষা, গালে রঙ, চোখে কাজল। সবাই ছোট রাজপুত্রকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল।

'সেকী, তোর বৌকে আনলি না যে? একটা রুমালে করেও তো আনতে পারতিস, সত্যি, রূপসীকে জোটালি কোথা থেকে? কোন খাল বিল তল্লাশ করে?'

তিন ছেলে নিয়ে, ছেলের বৌ নিয়ে, অতিথি অভ্যাগত নিয়ে রাজামশাই বসলেন এক জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে। ভোজ শুরু হবে। হঠাৎ শুরু হল খট্‌খট্‌ দুমদাম আওয়াজ। সে আওয়াজে সারা রাজপুরী কেঁপে উঠল থরথরিয়ে, অতিথিরা ভয়ে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু রাজপুত্র ইভান বললে:

'অতিথ সজ্জন, ভয় নেই, আমার ব্যাঙ বৌ এল কৌটোয় চড়ে।'

ছ'টা শাদা ঘোড়ায় টানা সোনা মোড়া এক জুড়ি গাড়ী এসে থামল রাজপুরীর অলিন্দে। গাড়ী থেকে নেমে এল যাদুকরী ভাসিলিসা, আকাশী নীল পোষাকে তার ঝলমলে তারা, মাথায় জ্বলজ্বলে বাঁকা চাঁদ; সে কী রূপ, জানার নয়, বোঝার নয়, রূপকথাতেই পরিচয়। রাজপুত্রের হাত ধরে নিয়ে গেল জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে।

সুরু হল পানভোজন, ফুর্তি। যাদুকরী ভাসিলিসা করল কি, গেলাশ থেকে পান করে বাকিটুকু ঢেলে দিলে বাঁ হাতার মধ্যে। মরালীর মাংসে কামড় দিয়ে হাড়গুলো রেখে দিল ডান হাতার মধ্যে।

দেখাদেখি বড় বৌ দু'জনও তাই করল।

খাওয়া হল, দাওয়া হল, শুরু হল নাচ। যাদুকরী ভাসিলিসা রাজপুত্র ইভানের হাত ধরে এগিয়ে গেল। তালে তালে নাচে, ঘুরে ঘুরে নাচে! সবাই একেবারে অবাক। নাচতে নাচতে বাঁ হাত দোলালে ভাসিলিসা আর হয়ে গেল একটা সরোবর। ডান হাত দোলালে, অমনি শাদা শাদা মরালী জেগে উঠল। রাজা আর অতিথি অভ্যাগতেরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক্।

তারপর অন্য বৌরাও নাচতে উঠল। ওরাও এক হাত দোলাল, অতিথিদের গা ভিজল শুধু। অন্য হাত দোলাল, ছড়িয়ে পড়ল শুধু হাড়। একটা হাড় গিয়ে লাগল একেবারে রাজার চোখে। রাজা ভয়ানক রেগে তক্ষুণি দুই বৌকে বের করে দিলেন।

ইতিমধ্যে রাজপুত্র ইভান করেছে কি, লুকিয়ে লুকিয়ে দৌড়ে বাড়ী গিয়ে ব্যাঙের চামড়াটা সোজা একেবারে উনুনে।

যাদুকরী ভাসিলিসা বাড়ী এসে ব্যাঙের চামড়া আর খুঁজে পায় না! মনের দুঃখে একটা বেঞ্চে বসে রাজপুত্রকে বলল:

'এ কি করলে রাজপুত্র! আর যদি তিনদিন অপেক্ষা করতে তবে আমি চিরদিনের মতো তোমার হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন বিদায়। তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে তিন দশের রাজ্যে যেখানে অমর-কাশ্চেই থাকে, সেখানে আমার খোঁজ করো ...'

এই বলে যাদুকরী ভাসিলিসা একটা ধূসর রঙের কোকিল হয়ে উড়ে গেল জানলা দিয়ে। রাজপুত্র কাঁদে কাঁদে, তারপর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে প্রণাম করে চলে গেল যেদিকে দুচোখ যায়: যাদুকরী ভাসিলিসাকে খুঁজে বার করবে। গেল অনেক দূর, নাকি অল্প দূর, অনেক দিন, নাকি অল্প দিন কে জানে; বুটের গোড়ালি ক্ষয়ে গেল, কাফতানের কনুই ছিঁড়ে গেল, টুপি হল ফাড়া ফাড়া। যেতে যেতে এক থুড়থুড়ে ক্ষুদে বুড়োর সঙ্গে দেখা।

'কুশল হোক কুমার, কিসের খোঁজে নেমেছ, কোন পথে চলেছ?'

রাজপুত্র বুড়োকে তার বিপদের কথা খুলে বলল। ক্ষুদে বুড়ো বলল:

'হায়, হায়, ব্যাঙের চামড়াটা পোড়াতে গেলে কেন, রাজপুত্র? ওটা তোমার পরার নয়, ওটা তোমার খোলারও নয়। যাদুকরী ভাসিলিসা তার বাবার চেয়েও

বেশী যাদু জ্ঞান নিয়ে জন্মেছিল। তাই ওর বাবা শাপ দিয়ে তিনবছরের জন্যে ওকে ব্যাঙ করে দিয়েছিলেন। যাক, এখন তো আর কোনো উপায় নেই। এই সুতোর গোলা নাও। এটা যেদিকে গড়াবে সেদিকে যেও, ভয় পেয়ো না।'

রাজপুত্র ইভান বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে সুতোর গোলার পেছন পেছন চলল। সুতোর গোলা আগে আগে গড়িয়ে চলে, আর রাজপুত্র পেছন পেছন যায়। একদিন এক খোলা মাঠে এক ভালুকের সঙ্গে দেখা। রাজপুত্র লক্ষ্যস্থির করে মারতে যাবে, হঠাৎ মানুষের গলায় কথা কয়ে উঠল ভালুক:

'মেরো না রাজপুত্র, কোনদিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।'

রাজপুত্র ভালুককে আর মারল না, এগিয়ে চলল। হঠাৎ দেখে একটা হাঁস মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। রাজপুত্র লক্ষ্যস্থির করতেই হাঁসটা মানুষের গলায় বলে উঠল:

'আমায় মেরো না, রাজপুত্র, কোনদিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।'

রাজপুত্র হাঁসটাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ একটা খরগোস দৌড়ে বেরিয়ে এল। রাজপুত্র ধনুক তুলে মারতে যাবে; খরগোসটা মানুষের মতো গলায় বলে উঠল:

'আমায় মেরো না রাজপুত্র, কোনদিন হয়ত আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।'

রাজপুত্র খরগোসটাকে আর মারল না, এগিয়ে চলল। হাঁটতে হাঁটতে রাজপুত্র নীল সমুদ্রের ধারে এসে দেখে, একটা মাছ ডাঙার বালিতে পড়ে খাবি খাচ্ছে।

'রাজপুত্র ইভান, দয়া করো আমায়, নীল সমুদ্রে ছেড়ে দাও!'

রাজপুত্র মাছটা জলে ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটতে লাগল কতদিন কে জানে, সুতোর গোলা গড়াতে গড়াতে এল এক বনের কাছে। সেখানে রাজপুত্র দেখে মুরগীর পায়ের উপর একটা কুঁড়েঘর ক্রমাগত ঘুরে চলেছে।

'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও!'

কুঁড়েঘরটা বনের দিকে পিঠ রেখে রাজপুত্রের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। রাজপুত্র ঘরে ঢুকে দেখে, চিমনীর কাছে ন'থাক ইঁটের ওপর শুয়ে আছে ডাইনী, বাবা-ইয়াগা, তার খেংরাকাঠি পা, দাঁত নেমেছে হেথা, নাক উঠেছে হোথা! রাজপুত্রকে দেখে ডাইনীটা বলে উঠল, 'তা আমার কাছে কেন, সজ্জন কুমার? কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?'

'ওরে পাজী বুড়ী থুবড়ী, আগে খাওয়া দে, দাওয়া দে, চানের জন্যে জল দে, তারপর শুধোস।'

বাবা-ইয়াগা রাজপুত্রকে গরম জলে চান করালে, খাওয়ালে দাওয়ালে, বিছানা পেতে শোয়ালে। রাজপুত্র ইভান তখন বাবা-ইয়াগাকে বলল যে সে তার বৌ যাদুকরী ভাসিলিসাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ডাইনী বলল, 'জানি, জানি! তোমার বৌ এখন অমর-কাশ্চেই'এর কবলে। ওকে ফিরে পাওয়া বাপু মুশকিল। কাশ্চেই'এর সঙ্গে এ'টে ওঠা সহজ নয়। ওর প্রাণ আছে এক ছুঁচের ডগায়, ছুঁচ আছে এক ডিমের ভিতর, ডিম আছে এক হাঁসের পেটে, হাঁস আছে এক খরগোসের পেটে, খরগোস আছে এক পাথরের সিন্দুকে, সিন্দুক আছে এক লম্বা ওক গাছের মাথায় আর ঐ গাছটা অমর-কাশ্চেই'এর চোখের মণি, কড়া পাহারা সেখানে।'

রাজপুত্র রাত্তিরটা বাবা-ইয়াগার বাড়ীতেই কাটাল। পরদিন সকালে বুড়ী তাকে সেই লম্বা ওক গাছে যাবার পথটা দেখিয়ে দিল। অনেক পথ, নাকি অল্প পথ, কতদূর রাজপুত্র গেল কে জানে; দেখে, দাঁড়িয়ে আছে এক লম্বা ওক গাছ। শনশন করছে তার পাতা, সেই গাছের মাথায় একটা পাথরের সিন্দুক। কিন্তু তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

হঠাৎ কোথা থেকে সেই ভালুকটা এসে করল কি, শেকড়শুদ্ধু উপড়ে দিলে গাছটাকে। সিন্দুকটা দুম্ করে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চৌচির। অমনি সিন্দুক থেকে একটা খরগোস বেরিয়ে যত জোর পারে দৌড়ে পালাতে গেল। কিন্তু সেই আগের খরগোসটা ওকে তাড়া করে ধরে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলল। অমনি খরগোসটার পেট থেকে একটা হাঁস বেরিয়ে সাঁ করে আকাশে উঠে গেল।

তখন দেখতে না দেখতে সেই আগের হাঁসটা তাকে ধাওয়া করে ঝাপটা মারতেই ডিম পাড়ল হাঁসটা, আর ডিম পড়ল নীল সমুদ্রে।

রাজপুত্র তখন ভীষণ কাঁদতে লাগল। সমুদ্র থেকে কী করে এখন ডিম খুঁজে পাবে! হঠাৎ দেখে, সেই মাছটা সাঁতার কেটে পারের দিকে আসছে, মুখে সেই হাঁসের ডিমটা। রাজপুত্র ডিমটা নিয়ে ভেঙ্গে ফেলল। তারপর ভাঙতে লাগল ছুঁচের ডগা। রাজপুত্র ভাঙে আর উথালপাথাল করে অমর-কাশ্চেই, দাপাদাপি করে। কিন্তু যতই করুক অমর-কাশ্চেই, ছুঁচের ডগাটি ভেঙে ফেলল রাজপুত্র, মরতে হল অমর-কাশ্চেইকে।

রাজপুত্র তখন চলল কাশ্চেই'এর শ্বেতপাথরের পুরীতে। যাদুকরী ভাসিলিসা ছুটে এল রাজপুত্রের কাছে, চুমো খেল তার মধুঢালা মুখে। তারপর যাদুকরী ভাসিলিসা আর রাজপুত্র ইভান দুজনে নিজেদের দেশে ফিরে গেল। সেখানে তারা সুখেস্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগল অনেক বুড়ো বয়স অবধি।

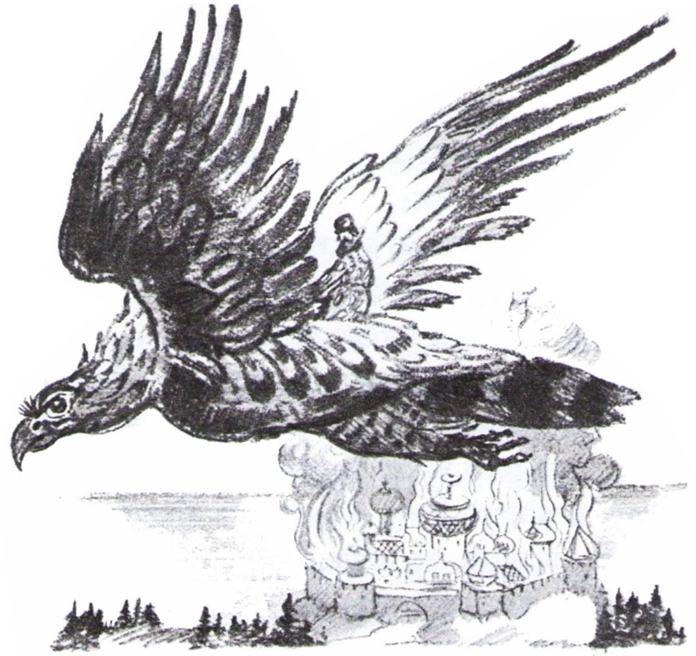

যাদুকরী ভাসিলিসার কথা

এক চাষী বীজ বুনল, ফসল হল আশ্চর্য, ঘরে তোলাই দায়। আঁটি তুলে ঝাড়াই মাড়াই করে ভর ভরন্ত গোলায় তুলল। গোলায় তুলে চাষী ভাবল: "সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটবে এবার।"

এদিকে এক ইঁদুর আর এক চড়াই সুরু করল চাষীর গোলায় যাতায়াত। দিনে বার পাঁচেক করে আসে; পেট পুরে খেয়ে চলে যায় — ইঁদুর যায় তার গর্তে আর চড়াই তার বাসায়। এমনি করেই মিলেমিশে তিন বছর কাটল তাদের। গোলার সব দানা শেষ হল, রইল কিছুটা ক্ষুদকুঁড়ো পড়ে। ইঁদুর

দেখে ভাঁড়ার তো শেষ হয়-হয়, চড়াইটার ওপর বাটপারি করে একলাই বাকিটুকু দখল করা যাক। এই ভেবে মেঝেতে সিঁধ কেটে বাকি দানা সব মাটির নীচে জমা করল।

সকালে চড়াই গোলায় খেতে এসে দেখে, একটা দানাও পড়ে নেই। বেচারা ক্ষিদে নিয়েই ফিরে গেল। ভাবল:

"হতভাগা ইঁদুরটা আমায় ঠকিয়েছে! গিয়ে একবার পশুরাজ সিংহের কাছে নালিশ করি। পশুরাজ নিশ্চয়ই ন্যায় বিচার করবেন।"

এই ভেবে চড়াই উড়ে চলল সিংহের কাছে।

পশুরাজের কাছে গিয়ে চড়াই কুর্নিশ করে বলল, 'সিংহমশাই, আপনি পশুরাজ! আমি আপনার এক পশু, দেঁতো ইঁদুরের সঙ্গে ছিলাম। গত তিন বছর ধরে একই গোলা থেকে আমরা খেয়েছি, কোনদিন ঝগড়া বিবাদ করিনি। কিন্তু খাবার ফুরিয়ে আসতেই ইঁদুর আমাকে ভারি ঠকিয়েছে। গোলার মেঝেয় সিঁধ কেটে বাকি দানাগুলো সব মাটির নীচে চালান করে দিয়েছে। আমি উপোস করে মরছি। ন্যায্য মতে আপনি বিচার করে দিন। আর যদি বিচার না করেন, তবে আমি আমাদের রাজা ঈগলমহারাজের কাছে আর্জি করব।'

'তাই যা বাপু, যেখানে পারিস যা,' সিংহ বলল।

চড়াই গিয়ে কুর্নিশ করলে ঈগলের কাছে। ইঁদুর কী রকম ঠকিয়েছে, আর পশুরাজই বা কেমন এক-চোখোমি করলেন — সে সব কথা ঈগলমহারাজকে খুলে বলল।

শুনে ঈগলমহারাজ রেগে লাল। তক্ষুণি সিংহের কাছে দূতের হাতে খবর পাঠাল: কাল অমুক সময়, অমুক মাঠে তোমার সব জন্তুজানোয়ার নিয়ে হাজির থেকো, আমিও আমার পাখীর দল জুটিয়ে তৈরী থাকব। যুদ্ধ হবে।

পশুরাজ সিংহ তাই ঢেঁড়া দিলে, পশুদের ডাক পড়ল যুদ্ধে। জুটল তারা কাতারে কাতারে। কিন্তু যেই ওরা খোলা মাঠে এসেছে অমনি যত ডানাওয়ালা সৈন্য নিয়ে মেঘের মতো ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঈগল। তিন ঘণ্টা তিন মিনিট ধরে যুদ্ধ চলল। জিত হল ঈগলমহারাজের। সারা মাঠ ভরে উঠল পশুদের লাসে। ঈগল তখন পাখীদের বাড়ী পাঠিয়ে নিজে চলে গেল এক

গহীন বনে, বসল এক মস্ত ওক গাছের মাথায়, সারা গায়ে জখম, ভাবতে লাগল, কী করে আবার আগের শক্তি ফিরে পাওয়া যায়।

এ সব অনেক পুরাকালের কথা। সেই সময় একলা একলা বাস করত এক সওদাগর আর তার বৌ। তাদের একটিও ছেলে মেয়ে ছিল না। সকালে উঠে সওদাগর তার বৌকে বলল:

'গিন্নী, বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি, এক মস্ত পাখী এসেছে আমাদের কাছে। আস্ত ষাঁড় গিলে খায়, পুরো গামলা চুমুক দেয়। হাত থেকে তার রেহাই নেই, না খাইয়ে উপায় নেই। যাই, বনের মধ্যে গিয়ে খানিকটা ঘুরে আসি।'

সওদাগর বন্দুক নিয়ে বনে চলে গেল। বনে বনে সে ঘুরলে অনেকক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ, শেষকালে এল সেই ওক গাছটার কাছে। দেখে, একটা ঈগল, বন্দুক তুলে গুলি করতে যাবে। হঠাৎ মানুষের ভাষায় কথা কয়ে উঠল পাখী:

'মেরো না ভালোমানুষের পো, আমায় মেরে তোমার কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে আমায় বাড়ী নিয়ে চলো। তিন বছর তিন মাস তিন দিন আমায় খাইয়ো। তোমার ওখানে সেরে উঠি, ডানায় পালক গজাক, গায়ে জোর ফিরুক, তখন তোমার উপকারের শোধ দেব।'

"ঈগল আবার কী দেবে?" এই ভেবে সওদাগর আবার বন্দুক তুলল।

ঈগল ফের সেই কথা বলে। আবার সওদাগর বন্দুক তুলল, বার বার তিনবার। ঈগল ফের বলল:

'মেরো না ভালোমানুষের পো, তিন বছর তিন মাস তিন দিন আমায় খাইয়ে দাইয়ে তোমার বাড়ীতে রাখো। সেরে উঠি, ডানায় পালক গজাক, গায়ে জোর হোক, তোমার সব উপকার শোধ দেব।'

দয়া হল সওদাগরের, ঈগলকে বয়ে নিয়ে এল বাড়ীতে। বাড়ী এসেই সওদাগর তক্ষুণি একটা ষাঁড় মেরে এক গামলা ভর্তি মধুর সরবৎ করে রাখল। ভাবল এতে ঈগলটার বেশ কিছুদিন চলে যাবে। ঈগল কিন্তু এক গ্রাসেই সব শেষ করে দিল। অনাহূত অতিথি নিয়ে খুবই বিপদ হল সওদাগরের, একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়ল সে। তা দেখে ঈগল সওদাগরকে বলল:

'শোনো কর্তা, খোলা মাঠটায় চলে যাও, দেখবে সেখানে আহত-নিহত অনেক পশু পড়ে আছে। জন্তুগুলোর ছাল ছাড়িয়ে দামী ফার নিয়ে সহরে বেচে এসো। প্রচুর টাকা হবে। সে টাকায় আমি খেয়ে, তুমি খেয়েও বাকি থাকবে।'

সওদাগর খোলা মাঠে গিয়ে দেখে, সত্যিই আহত-নিহত অনেক পশু পড়ে আছে। তা থেকে দামী দামী চামড়া ছাড়িয়ে, সহরে ফার বেচে সওদাগর অনেক টাকা পেল।

এক বছর কেটে গেল। ঈগল সওদাগরকে বলল: যেখানে বড় বড় ওক গাছ আছে সেখানে আমায় নিয়ে চলো। সওদাগর গাড়ীতে ঘোড়া জুতল তারপর ঈগলকে নিয়ে গেল বড় বড় ওক গাছগুলোর কাছে। ঈগল মেঘের চেয়েও উঁচুতে উড়ে গেল। তারপর সোঁ করে নেমে এসে যত জোরে সম্ভব তার বুক দিয়ে একটা ওক গাছে মারল ধাক্কা। গাছ দু'টুকরো হয়ে গেল।

ঈগল বলল, 'না সওদাগর, এখনও আমার আগের শক্তি ফিরে পাইনি, আরও পুরো একবছর আমায় খাওয়াতে হবে।'

দ্বিতীয় বছরও কেটে গেল। ঈগল আবার কালো মেঘের মাথার উপর উড়ে গেল, তারপর সোঁ করে নেমে এসে ধাক্কা মারল গাছে। কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল গাছ।

'আরও একবছর খাওয়াতে হবে সওদাগর, ভালোমানুষের পো, আগের শক্তি এখনও আসেনি গায়ে।'

এই ভাবে তিন বছর তিন মাস তিন দিন কেটে যেতেই ঈগল সওদাগরকে বলল:

'আবার আমাকে সেই বড় বড় ওক গাছের কাছে নিয়ে চলো।'

সওদাগর ঈগলকে ওক গাছগুলোর কাছে নিয়ে গেল। এবার ঈগল আগের চেয়েও উঁচুতে উড়ে গেল, তারপর সবচেয়ে বড়ো ওক গাছটার গায়ে মারল এক প্রচণ্ড ধাক্কা। গাছটা আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। কেঁপে উঠল সারা বন।

ঈগল বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমায় সওদাগর, ভালোমানুষের পো,

এবার আমি আগের শক্তি ফিরে পেয়েছি। ঘোড়া ছেড়ে আমার পিঠে চড়ে বসো। আমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে তোমার সব উপকারের শোধ দেব।'

সওদাগর ঈগলের পিঠে চড়ে বসল। ঈগল নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে উঠে গেল একেবারে উঁচুতে। বলল:

'নীল সমুদ্রটা একবার দেখো তো, কত বড়?'

সওদাগর উত্তর দিল, 'একটা বড় চাকার মতো।'

তখন মৃত্যুভয় দেখাবার জন্যে সওদাগরকে পিঠ থেকে ফেলে দিল ঈগল, কিন্তু সমুদ্রে পড়বার আগেই ঈগল তাকে ধরে ফেলল। তারপর আরো উঁচুতে উঠে গেল।

'এবার নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলো তো, কত বড়?'

'মুরগীর ডিমের মতো।'

ঈগল আবার এক ঝাঁকুনি দিয়ে সওদাগরকে ফেলে দিল, তারপর সমুদ্রে পড়বার আগেই ধরে নিয়ে আরও উঁচুতে উড়ে চলল।

'এবার দেখো তো, নীল সমুদ্র কত বড়?'

'একটা দোপাটির বীচির মতো।'

এবার তৃতীয় বার ঈগল এক ঝাঁকুনি দিয়ে সওদাগরকে ফেলে দিল একেবারে সেই আকাশ থেকে। কিন্তু এবারেও সমুদ্রে পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলল। বলল:

'কী সওদাগর, ভালোমানুষের পো, এবার বুঝেছো মৃত্যুভয় কাকে বলে?'

সওদাগর উত্তর দিল, 'বুঝেছি, মনে হয়েছিল এই শেষ।'

'আমার দিকে যখন বন্দুক তুলে তাগ করেছিলে আমারও তাই মনে হয়েছিল।'

ঈগল সওদাগরকে নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে সোজা উড়ে চলল তামার রাজ্যে।

ঈগল বলল, 'এখানে আমার বড় বোন থাকে। আমরা তার অতিথি হব। ও যখন উপহার দিতে চাইবে, কিছু নিও না যেন, কেবল তামার কৌটা চাইবে।'

এই বলে ঈগল নেমে সোঁদা মাটিতে আছাড় খেতেই একটি সুন্দর তরুণ হয়ে গেল।

মস্ত একটা আঙিনা পেরিয়ে চলেছে ওরা, বোন ওদের দেখতে পেয়ে ভারি খুশী হয়ে স্বাগত জানাল।

'ভাই আমার, সোনা আমার, তুই বেঁচে আছিস! কোথা হতে এলি? তিন বছর তোকে দেখিনি। ভেবেছিলাম বুঝি বা মরেই গেছিস। কী তোকে খেতে দিই, কী দিয়ে আপ্যায়ন করি?'

'আমায় শুধিয়ো না দিদি, আমায় জিজ্ঞেস করো না, আমি তো বাড়ীর লোক। এই লোকটিকে জিজ্ঞেস করো, একে শুধোও। আমায় তিন বছর খাইয়েছে, দাইয়েছে, উপোসে রাখেনি।'

মেয়েটি ওদের এক নক্সী জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে বসালে, খাওয়ালে, আপ্যায়ন করলে। তারপর রত্নভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে তার অগুনতি ধনসম্পদ দেখিয়ে সওদাগরকে বলল:

'এই তোমার সোনা, রুপো, মণিমাণিক্য যত নেবে নাও।'

সওদাগর বলল:

'সোনা চাই না, রুপো চাই না, মণিমাণিক্য চাই না; আমায় কেবল তামার কৌটাটি দাও।'

'যতই করো, সেটি হচ্ছে না। বাঁদরের গলায় কি আর মুক্তোর হার?'

বোনের কথা শুনে ভাই খুব রেগে উঠল, তাই সে আবার ঈগল হয়ে সওদাগরকে পিঠে নিয়ে উড়ে চলে গেল।

দিদি চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'ভাই আমার, সোনা আমার, ফিরে আয়! না হয় তামার কৌটাই দেব, আপত্তি করব না!'

'এখন আর হয় না দিদি, দেরি হয়ে গেছে,' এই বলে ঈগল আকাশের ভিতর দিয়ে উড়ে চলল।

ঈগল বলল, 'দেখো তো সওদাগর, ভালোমানুষের পো, কী দেখছো সামনে, কী দেখছো পিছনে?'

চারদিক দেখে সওদাগর বলে:

'পিছনে জ্বলন্ত আগুন আর সামনে ফুটন্ত ফুল।'

'তার মানে তামার রাজ্য পুড়ে যাচ্ছে, আর রুপোর রাজ্যে ফুল ফুটছে।

রুপোর রাজ্যে থাকে আমার মেজ বোন। আমরা তার অতিথি হব। সে যখন উপহার দিতে চাইবে আর কিছু নিও না, শুধু ঐ রুপোর কৌটা চাইবে।'

পেঁছিল ঈগল, সোঁদা মাটিতে আছাড় খেতেই আবার একটি সুন্দর তরুণ হয়ে গেল।

মেজ বোন বলল, 'ভাই আমার, সোনা আমার, কোত্থেকে এলি? কোথায় ছিলি, এতদিন আসিসনি কেন? কী দিয়ে তোর আপ্যায়ন করি?'

'আমায় জিজ্ঞেস করো না দিদি, শুধিয়ো না, আমি তো বাড়ীর লোক। এই ভালোমানুষের পোকে জিজ্ঞেস করো, এর আপ্যায়ন করো। আমায় পুরো তিন বছর খাইয়েছে, দাইয়েছে, উপোসে রাখেনি।'

মেজ বোন ওদের নক্সী জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে বসিয়ে খাওয়ালে, আপ্যায়ন করলে। তারপর রত্নভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে বলল:

'এই রইল সোনা, রুপো, মণিমাণিক্য যত খুশী সাধ মিটিয়ে নাও।'

'সোনা চাই না আমার, রুপো চাই না, মণিমাণিক্য চাই না; আমায় কেবল রুপোর কৌটাটি দাও।'

'না ভালোমানুষের পো, সেটি হচ্ছে না। ও কৌটা তোমার গলায় ঠেকে মরবে।'

বোনের কথায় রাগ হয়ে গেল ভাইয়ের, তাই ফের সে পাখী হয়ে সওদাগরকে পিঠে চাপিয়ে উড়ে গেল।

'ফিরে আয় ভাই, ফিরে আয়! না হয় কৌটাই দেব, আপত্তি করব না!'

'আর হয় না দিদি, দেরি হয়ে গেছে।'

ঈগল আবার উড়ে চলল আকাশে।

'চেয়ে দেখো সওদাগর, ভালোমানুষের পো, কী দেখছো সামনে, কী দেখছো পিছনে?'

'পিছনে জ্বলন্ত আগুন, সামনে ফুটন্ত ফুল।'

'তার মানে রুপোর রাজ্য পুড়ে যাচ্ছে, আর আমার সবচেয়ে ছোট বোনের সোনার রাজ্যে ফুল ফুটছে। আমরা ওর অতিথি হব। সে যখন উপহার দিতে চাইবে কিছু নিও না, শুধু তার সোনার কৌটা চাইবে।'

উড়তে উড়তে সোনার রাজ্যে পেঁৗছে ঈগল আবার সেই সুন্দর তরুণ হয়ে গেল।

ছোট বোন বলল, 'ভাই আমার, সোনা আমার, কোত্থেকে এলি? কোথায় ছিলি, এতদিন আসিসনি কেন? কী তোকে দিই, কী দিয়ে আপ্যায়ন করি?'

'আমায় জিজ্ঞেস করো না দিদি, আমায় আপ্যায়ন কোরো না, আমি তো বাড়ীর লোক। জিজ্ঞেস করো এই সওদাগরকে। ও আমায় তিন বছর খাইয়েছে, দাইয়েছে, উপোসে রাখেনি।'

নক্সী জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে বসিয়ে মেয়েটি ওদের খাওয়ালে, দাওয়ালে। তারপর রত্নভান্ডারে নিয়ে গিয়ে সওদাগরকে সোনা, রুপো, মণিমাণিক্য সব দিতে চাইল।

'কিছু চাই না আমার, কেবল ঐ সোনার কৌটাটি দাও।'

বোন বলল, 'এই নাও। ভাগ্য ফিরুক তোমার। তুমিই আমার ভাইকে তিন বছর খাইয়েছো, দাইয়েছো, উপোসে রাখোনি। আমার ভাইয়ের জন্যে তোমায় না দিতে পারি এমন কিছু নেই।'

তাই সোনার রাজ্যে দিন কাটাল সওদাগর, ভোজ খেল। শেষে একদিন বিদায় নেবার সময় এল।

ঈগল বলল, 'বিদায় বন্ধু। ত্রুটির কথা ভুলে যেয়ো, আর মনে রেখো, বাড়ী না পেঁৗছনো পর্যন্ত কৌটা খুলবে না কিন্তু।'

সওদাগর বাড়ীর দিকে রওনা হল। গেল অনেক দিন, নাকি অল্প দিন, ক্লান্ত হয়ে সওদাগর ভাবল একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। থামল সে এক বিভুঁই মাঠে, রাজা অদীক্ষিত ললাটের রাজ্যে। সোনার কৌটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে সওদাগর, শেষে আর পারল না, খুলে ফেলল কৌটা। কৌটা খোলামাত্র দেখে — কোথা থেকে জেগে উঠল এক মস্ত রাজপুরী, কত তার সাজসজ্জা। লোকজন দাসদাসী গিজগিজ করছে।

'আজ্ঞা করুন হুজুর, হুকুম করুন?'

সওদাগর খেল, দেল, বিছানায় গা এলাল।

রাজা অদীক্ষিত ললাট দেখে, তার রাজ্যে মস্ত এক রাজপুরী। দূতকে বললে:

‘দেখে এসো তো, কোন শয়তান আমার রাজ্যে আমার অনুমতি ছাড়া প্রাসাদ তুলেছে। ভালোয় ভালোয় এক্ষুণি যেন রাজ্য ছেড়ে চলে যায়।’

এই শাসানি শুনে সওদাগর ভাবতে লাগল কী করে আবার রাজপুরীকে কৌটার ভিতরে ঢোকানো যায়। ভেবে ভেবেও কোন উপায় বের করতে পারল না।

দূতকে বলল, ‘খুশী হয়েই যেতে রাজি, কিন্তু কী করে যে যাব, সেটাই জানি না।’

দূত ফিরে গিয়ে রাজাকে সব কথা জানাল।

রাজা বললে, ‘ওর বাড়ীতে অজানা যেটি আছে সেটি আমায় দিক, তবে আমি প্রাসাদটা আবার সোনার কৌটায় পুরে দেব।’

সওদাগর আর কী করে, প্রতিজ্ঞা করল বাড়ীতে তার অজানা যা আছে সেটি দেবে রাজাকে। রাজা অদীক্ষিত ললাট তক্ষুণি প্রাসাদটা মুড়ে কৌটায় ঢুকিয়ে দিল। সওদাগর কৌটা নিয়ে রওনা হল বাড়ীমুখো।

গেল অনেকদিন, নাকি অল্পদিন, এল বাড়ীতে। বৌ বলল:

‘এসো গো, ঘরে এসো! কোথায় ছিলে?’

‘যেখানে ছিলাম ছিলাম, এখন তো আর নেই।’

‘তুমি যখন বাড়ীতে ছিলে না, ভগবান তখন একটি খোকা দিয়েছেন আমাদের।’

“এটাই তাহলে আমার অজানা জিনিস!” মনে মনে ভাবল সওদাগর, দুঃখ হল তার, শোক হল।

বৌ বলল, ‘তোমার কী হয়েছে? নাকি বাড়ীতে মন টিকছে না।’

সওদাগর বলল, ‘না, না, সে কথা নয়।’ তারপর সব ঘটনা খুলে বলল বৌকে।

ওরা তখন খুব দুঃখ করে কাঁদতে লাগল, কিন্তু চিরকাল তো আর কেউ কাঁদে না।

সওদাগর তাই সোনার কৌটা খুলল। দেখতে দেখতে তৈরী হয়ে গেল একটা মস্ত জমকালো রাজপুরী, কত তার সাজসজ্জা। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সওদাগর মনের সুখে থাকে সেখানে। ধন তাদের উপচে ওঠে।

বছর দশ পেরিয়ে গেল। রূপবান বুদ্ধিমান হয়ে বেড়ে উঠল সওদাগরপুত্র, যেমন রূপ তেমনি গুণ।

একদিন মনমরা হয়ে ঘুম ভাঙল ছেলেটির, বাবাকে বলল:

'রাজা অদীক্ষিত ললাট আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়েছে বাবা, বলেছে তার কাছে যেতে। অনেকদিন থেকে নাকি অপেক্ষা করে আছে, আর চলে না।'

চোখের জল ফেললে বাবা মা। তারপর আশীর্বাদ করে ছেলেকে দূর দেশে পাঠিয়ে দিলে।

যায় সে সড়ক বেয়ে, পথ উজিয়ে, শূন্যি কান্তার, স্তেপের প্রান্তর, পেরিয়ে এল এক গহন বনে। জন নেই, প্রাণী নেই। কেবল একটেরে একটি কুঁড়ে, বনের দিকে মুখ আর সওদাগরপুত্র ইভানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও।'

কুঁড়েঘর ইভানের কথামত বনের দিকে পিঠ করে ঘুরে দাঁড়াল।

সওদাগরপুত্র ইভান ভিতরে ঢুকে দেখে, খেংরাকাঠি পা, বাবা-ইয়াগা ডাইনী শুয়ে। ইভানকে দেখে ডাইনী বলল:

'রুশী মানুষ যে, না শুনেছি কানে, না হেরেছি নয়নে, আজ দেখি আপনা থেকেই হাজির। কোথা থেকে আসছো কুমার, কোন পথ ধরেছো?'

'ধিক তোকে, বুড়ী ডাইনী, অতিথির জন্যে খাবার নেই, দাবার নেই, শুরু করেছিস জেরা!'

বাবা-ইয়াগা টেবিল সাজিয়ে খাবার দিলে, দাবার দিলে, ভোজন শেষে শুইয়ে দিলে। ভোর হতেই জাগিয়ে তুলে শুরু করলে জিজ্ঞাসাবাদ। সওদাগরপুত্র ইভান আদ্যোপান্ত সব বলে জিজ্ঞেস করল:

'বলো দিদিমা, রাজা অদীক্ষিত ললাটের কাছে যাব কী করে?'

'ভাগ্যে এ পথে এসেছিলে, সাক্ষাৎ যমের হাতে পড়তে। রাজার কাছে এতদিন যাওনি বলে সে ভীষণ রেগে আছে। শোনো বলি, এই পথ ধরে যাও, পুকুর পাবে। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকো। উড়ে আসবে তিনটি কপোত, তিন সুন্দরী, রাজার তিন মেয়ে। এসে তারা ডানা খুলে রেখে, পোষাক ছেড়ে পুকুরে নাইবে। একজনের ডানায় দাগ-ফুটকি। সুযোগ বুঝে সেই ডানা জোড়াটি ছিনিয়ে নিও। তারপর যতক্ষণ না তোমায় বিয়ে করতে রাজি হয় কিছুতেই ফেরত দিও না। ব্যস্, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বাবা-ইয়াগার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইভান তার কথামত পথ ধরে চলতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে এল সেই পুকুরটার কাছে। লুকিয়ে রইল একটা ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে। কিছুক্ষণ পরে তিনটি কপোত উড়ে এসে নামল, একজনের ডানায় দাগ-ফুটকি। মাটিতে আছাড় খেতেই তিনটি সুন্দরী মেয়ে হয়ে গেল তারা। ডানা খুলে, জামা ছেড়ে তারা নাইতে নামল। ইভান ওদিকে ওঁৎ পেতে ছিল, চুপিচুপি গুটিগুটি এগিয়ে দাগ-ফুটকি ডানা জোড়া চুরি করে নিল। দেখে, কী হয়। সুন্দরীরা স্নান শেষ করে জল ছেড়ে উঠে এল পাড়ে। জামাকাপড় পরে ডানা লাগিয়ে কপোত হয়ে উড়ে চলে গেল দুজন, কিন্তু বাকি একজন পড়ে রইল, খুঁজতে লাগল হারানো ডানা।

খোঁজে, খোঁজে, আর বলে:

'সাড়া দাও গো, বলো, কে আমার ডানা নিয়েছো। যদি বুড়ো মানুষ হও তবে তোমায় বাবা বলব, যদি মাঝবয়সী হও তবে তোমায় কাকা বলব, কিন্তু যদি রূপবান কমার হও তবে হবে আমার স্বামী।'

এই শুনে গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে এল সওদাগরপুত্র ইভান।

'এই নাও তোমার ডানা!'

'বলো কুমার, বাগদত্ত বর আমার, কী তোমার কুল, কী গোত্র? কোথায় চলেছো?'

'সওদাগরপুত্র ইভান আমি, চলেছি তোমার বাবা, রাজা অদীক্ষিত ললাটের কাছে।'

'আমার নাম যাদুকরী ভাসিলিসা।'

যাদুকরী ভাসিলিসা ছিল বাবার সবচেয়ে আদরের কন্যা। যেমন রূপ তেমনি তার বুদ্ধি। ভাসিলিসা ইভানকে রাজা অদীক্ষিত ললাটের দেশে যাবার পথ বলে দিয়ে নিজে কপোত হয়ে অন্য বোনদের পিছন পিছন উড়ে চলে গেল।

ইভান প্রাসাদে পেঁছিলে রাজা তাকে লাগালে রান্নাঘরের কাজে: কাঠ কাটতে, জল তুলতে। রান্নাঘরের বাবুর্চি কেলেভুষো কিন্তু ইভানকে দুচোখে দেখতে পারত না। রাজার কাছে গিয়ে বানিয়ে বানিয়ে ইভানের নামে লাগাতে শুরু করল সে।

'হুজুর মহারাজ, ঐ সওদাগরপুত্র ইভানটা বড়াই করে, সে নাকি এক রাত্রের মধ্যে গহন বন কেটে, কাঠ গাদা করে, শিকড় উপড়িয়ে, জমি চষে, বীজ বুনে, গম কেটে, ঝেড়ে বেছে, পিষে, আপনার সকালে খাওয়ার জন্যে পিঠে তৈরী করে দিতে পারে।'

রাজা বললে, 'ডেকে আনো ওকে।'

এল ইভান।

'শুনেছি খুব নাকি বড়াই করো: এক রাত্রের মধ্যে তুমি গহন বন কেটে, কাঠ গাদা করে, শিকড় উপড়িয়ে, জমি চষে, বীজ বুনে, গম কেটে, ঝেড়ে বেছে, পিষে, আমার সকালে খাবার মতো পিঠে তৈরী করে দিতে পারো। বেশ, কাল সকালের মধ্যেই করে দেখাও।'

সওদাগরপুত্র ইভান যতই অস্বীকার করুক কোনো লাভ হল না। হুকুম হয়ে গেছে, মানতেই হবে। উঁচু মাথা নীচু করে সে ফিরল রাজার কাছ থেকে। রাজার মেয়ে, যাদুকরী ভাসিলিসা তাকে দেখে বলল:

'এত দুঃখ কেন তোমার?'

'তোমায় বলে কী হবে, তুমি তো আর উপায় করতে পারবে না!'

'বলা যায় না, হয়ত পারব!'

ইভান তখন ভাসিলিসাকে সব বলল, রাজা অদীক্ষিত ললাট তাকে কী কাজ করতে দিয়েছে।

'ধ্যুৎ, এ আবার একটা কাজ নাকি, এতো ছেলেখেলা! আসল কাজ পরে

আসছে। ঘুমতে যাও; রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে, কাল সকালের মধ্যে সবই ঠিক হয়ে যাবে।'

ঠিক রাত দু'পহর হতেই ভাসিলিসা প্রাসাদের রাঙা অলিন্দে দাঁড়াল। জোর গলায় ডাক পাঠাল। এক মিনিটের মধ্যেই চারিদিক থেকে ভিড় করে এল মজুর, লোকে লোকারণ্য। কেউ গাছ কাটে, কেউ মাটি খুঁড়ে শিকড় উপড়ায়, কেউ জমি চষে। একজায়গায় বীজ পোঁতে, ততক্ষণে অন্য জায়গায় ফসল কেটে সুরু হয়ে যায় ঝাড়াই মাড়াই। ধুলোর মেঘে ছেয়ে গেল। সকালের মধ্যে ময়দা করে পিঠে ভেজে সারা। রাজার সকালের জলযোগের জন্যে ইভান নিয়ে গেল পিঠেগুলো।

'বাহবা!' বলে রাজা রাজভাণ্ডার থেকে ইভানকে পুরস্কার দেবার হুকুম দিলে।

বাবুর্চি কেলেভুষো এতে গেল আরো রেগে। রাজার কাছে সে নতুন করে লাগাতে গেল:

'হুজুর, ইভান বলছে সে নাকি রাতারাতি এমন একটা জাহাজ বানিয়ে দিতে পারে যেটা আকাশে উড়বে।'

'বেশ, ডেকে নিয়ে এসো ওকে।'

ডেকে আনা হল সওদাগরপুত্র ইভানকে।

'তুমি নাকি আমার দাসদাসীর কাছে বড়াই করেছো, এমন একটা চমৎকার জাহাজ রাতারাতি বানাতে পারো যেটা আকাশেও উড়বে? অথচ আমায় সে কথা জানাওনি! শোনো, কাল সকালের মধ্যেই ওরকম একটা জাহাজ তৈরী করে দিতে হবে।'

দুঃখে ইভানের উঁচু মাথা হেঁট হয়ে নামল কাঁধের নীচে। রাজার কাছ থেকে ফিরে এল যেন আর সে মানুষটি নয়। যাদুকরী ভাসিলিসা তাকে দেখে বললে:

'কীসের দুঃখ তোমার, কীসের খেদ?'

'দুঃখ না করে কী করি বলো, রাজা আদেশ করেছে এক রাত্রের মধ্যে একটা উড়ো জাহাজ বানিয়ে দিতে হবে।'

'এ আবার কাজ নাকি, এতো ছেলেখেলা! আসল কাজ পরে। ঘুমতে যাও তো; রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে, কাল সকালের মধ্যে সবই ঠিক হয়ে যাবে।'

মাঝ রাত্রে ভাসিলিসা প্রাসাদের রাঙা অলিন্দে এসে জোরে জোরে ডাক পাঠাল। এক মুহূর্তে চারদিক থেকে ছুতোরের দল ছুটে এল। তারপর করাত, কুড়ুল নিয়ে ফুর্তি করে কাজে লেগে গেল সব। সকালের মধ্যে সব তৈরী।

রাজা বললে, 'খাসা হয়েছে! চলো আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।'

উঠে বসল ওরা দুজনে। সঙ্গে নিল বাবুর্চি কেলেভুষোকেও। জাহাজ উড়ে চলল আকাশ দিয়ে। রাজার বুনো জানোয়ারগুলোকে যেখানে রাখা হত তার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় কেলেভুষো উঁকি মেরে যেই দেখতে গেছে, অমনি ইভান তাকে এক ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিল। চোখের পলকে জানোয়ারগুলো বাবুর্চিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল।

ইভান চীৎকার করে উঠল, 'যাঃ! কেলেভুষো যে পড়ে গেল!'

রাজা বললে, 'চুলোয় যাক গে! কুকুরের মরণ কুত্তার মতোই!'

প্রাসাদে ফিরে এল ওরা।

রাজা বললে, 'তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে, ইভান। এবার তিন নম্বরের কাজ: একটা বুনো ঘোড়াকে বশ করতে হবে। যদি পারো, আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।'

খুশী হয়ে সওদাগরপুত্র ইভান ফিরে এল, ভাবল: "এ আর কঠিন কী।"

ফের যাদুকরী ভাসিলিসার সঙ্গে ইভানের দেখা। সব কথা শুনে ভাসিলিসা বলল:

'বোঝোনি তুমি, ইভান। এবার সত্যিই তোমার কাজটা সহজ নয়, কঠিন কাজ, কারণ বুনো ঘোড়াটি হচ্ছে স্বয়ং রাজা অদীক্ষিত ললাট নিজে। উড়িয়ে তোমায় নিয়ে যাবে বাড়ন্ত গাছের উঁচুতে, উড়ন্ত মেঘের নীচুতে, খোলা মাঠে ছড়াবে তোমার হাড়গোড়। এক্ষুণি দৌড়ে কামার বাড়ী যাও। বলো একটা তিন পুদ্ ওজনের লোহার হাতুড়ি বানিয়ে দিতে। ঘোড়ার পিঠে শক্ত হয়ে চড়ে বসেই ওটার মাথায় বাড়ি মেরে ঠাণ্ডা রেখো।'

পরদিন আস্তাবল থেকে সহিসরা বের করে নিয়ে এল একটা বুনো ঘোড়া। ধরে রাখাই দায়। কী তার ডাক, কী তার চাঁট! সওদাগরপুত্র ইভান পিঠে চড়ে বসতেই ঘোড়াটা উঠে গেল একেবারে বাড়ন্ত গাছের উঁচুতে, উড়ন্ত মেঘের নীচুতে, ছুটতে লাগল বাতাসের আগে আগে। ইভান কিন্তু শক্ত হয়ে বসে ঘোড়াটার মাথায় হাতুড়ি মেরে চলল ক্রমাগত। শেষ পর্যন্ত হয়রান হয়ে ঘোড়াটা নামল সোঁদা মাটিতে। সওদাগরপুত্র ইভান ঘোড়াটা সহিসদের কাছে ফেরত দিয়ে একটু বিশ্রাম করে প্রাসাদে ফিরে গেল। গিয়ে দেখে, রাজা অদীক্ষিত ললাটের মাথায় পট্টি বাঁধা।

'বুনো ঘোড়াটাকে বাগ মানিয়েছি, মহারাজ।'

'বেশ, কাল এসো। বউ পছন্দ করে নিও। আজ আমার মাথাটা ধরেছে।'

পরদিন সকালে যাদুকরী ভাসিলিসা সওদাগরপুত্র ইভানকে বলল:

'আমরা রাজার তিন মেয়ে। রাজা তিনজনকেই মাদী ঘোড়া বানিয়ে দিয়ে তোমায় বলবে বৌ বেছে নিতে। ভালো করে নজর রেখো, দেখবে আমার লাগামের একটা মণি প্যাটপ্যাট করছে। তারপর রাজা আমাদের কপোত করে দেবে। বোনেরা দানা খুটে খুটে খাবে। আর থেকে থেকেই আমি ডানার ঝাপটা মারব। তিন বারের বার আমাদের তিন কন্যে করে দেবে, তিনজনের একই মুখ, মাথায় এক, একই রকম চুল। আমি ইচ্ছে করে রুমাল নাড়াব; তাই দেখে চিনে নিও।'

যাদুকরী ভাসিলিসা যা বলেছিল তাই হল। রাজা তিনটে ঠিক একরকমের মাদী ঘোড়া এনে সার করে দাঁড় করিয়ে দিলে।

'যেটা খুশী বেছে নিও।'

সওদাগরপুত্র ইভান ভাল করে নজর করলে; দেখল, একটার লাগামের মণি প্যাটপ্যাট করছে। ইভান সেই লাগামটা ধরে বলল:

'এই আমার বৌ!'

'ভালোটা ছেড়ে খারাপটাই বেছেছো।'

'তা হোক, এই আমার ভালো।'

'আর একবার বাছো।'

তিনটে কপোত ছাড়ল রাজা, পালকে পালকে অবিকল এক, দানা ছড়িয়ে দিলে। ইভান দেখল একটা কপোত কেবলি ডানার ঝাপটা মারছে। ইভান তার ডানা চেপে ধরল।

'এই আমার বৌ!'

'ঠিকটিকে ধরলে না। পরে পস্তাবে। বরং বারবার তিনবার বেছে দেখো।'

রাজা তিন কন্যা এনে দাঁড় করিয়ে দিলে। তিনজনের একই মুখ, মাথায় এক, একই রকম চুল। ইভান দেখল একজন রুমাল নাড়াচ্ছে। অমনি ইভান গিয়ে তার হাত চেপে ধরল।

'এই আমার বৌ!'

আর উপায় নেই। রাজা অদীক্ষিত ললাট তাই ইভানের হাতেই যাদুকরী ভাসিলিসাকে সম্প্রদান করল। বিয়ে হয়ে গেল খুব ধুমধাম করে।

গেল অল্পদিন, নাকি অনেকদিন, সওদাগরপুত্র ইভান ঠিক করল এবার ভাসিলিসাকে নিয়ে নিজের দেশে পালিয়ে যাবে। ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে অন্ধকার রাতে বেরিয়ে পড়ল ওরা দুজন। পরদিন সকালে রাজা টের পেলে, ধরে আনবার জন্যে লোক ছুটল।

ভাসিলিসা স্বামীকে বলল, 'সোঁদা মাটিতে কান পাতো দেখি, কী শুনতে পাচ্ছো বলো!'

ইভান মাটিতে কান পেতে বলল:

'ঘোড়ার ডাক শুনতে পাচ্ছি।'

ভাসিলিসা অমনি স্বামীকে একটা ছোট সবজি ক্ষেত বানিয়ে দিয়ে নিজে একটা বাঁধাকপি হয়ে গেল। যারা ধরতে এসেছিল তারা রাজার কাছে ফিরে গেল শূন্য হাতে।

'হুজুর মহারাজ, খোলা মাঠে কিছুই দেখলাম না, শুধু একটা সবজি ক্ষেত ছাড়া, সে ক্ষেতের মধ্যে একটা বাঁধাকপির মাথা।'

'যাও, ঐ বাঁধাকপিটাই কেটে নিয়ে এসো। এ ওই মেয়েরই একটা যাদু।'

লোকজন আবার ছুটল ওদের ধরতে। ইভান আবার সোঁদা মাটিতে কান পেতে শুনল। বলল:

'ঘোড়ার ডাক শুনতে পাচ্ছি।'

ভাসিলিসা তখন নিজে একটা কুয়ো হয়ে গেল। আর ইভানকে করে দিল একটা ঝলমলে বাজপাখি। পাখিটা কুয়ো থেকে জল খেতে লাগল।

লোকজনেরা কুয়োর পাড়ে এসে দেখে, রাস্তাটা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। তাই ফিরে গেল আবার।

'হুজুর মহারাজ, খোলা মাঠে কিছুই দেখলাম না, কেবল একটা কুয়ো আর তার পাশে একটা ঝলমলে বাজপাখি বসে জল খাচ্ছে।'

এবার রাজা অদীক্ষিত ললাট নিজেই বেরল।

যাদুকরী ভাসিলিসা ইভানকে বলল, 'এবার দেখো তো, মাটিতে কান পেতে কী শুনতে পাও!'

'ওরে বাবা! আগের চেয়েও যে জোরালো ধুপধাপ, গুরগুর!'

'তার মানে এবার বাবা আসছে নিজে। কী করি? কী উপায়?'

'আমার মাথাতেও আর কিছু আসছে না।'

যাদুকরী ভাসিলিসার কাছে ছিল তিনটি জিনিস: একটা বুরুশ, একটা চিরুণী আর একটা তোয়ালে। সেগুলোর কথা মনে পড়তে ভাসিলিসা বলে উঠল:

'আছে রাজা অদীক্ষিত ললাটের হাত থেকে বাঁচার উপায়।'

ভাসিলিসা বুরুশটা দোলাতেই হয়ে গেল একটা বিরাট গহন বন, গাছে গাছে এত ঠেসাঠেসি যে হাত গলে না। তিন বছরেও সারা বনটা ঘুরে আসা যাবে না। রাজা অদীক্ষিত ললাট এখানে কামড়ায়, সেখানে কামড়ায় শেষ পর্যন্ত অতিকষ্টে একটু পথ করে নিয়ে আবার ধাওয়া সুরু করল। রাজা তাদের প্রায় ধরে ধরে, হাত বাড়ালেই হয়; ভাসিলিসা তার চিরুণীটা দুলিয়ে দিল — অমনি পথ আটকে দাঁড়াল একটা বিরাট খাড়া পাহাড়। পায়ে হেঁটে ডিঙনো যায় না, ঘোড়ায় চড়ে পেরনো যায় না।

রাজা পাহাড়টার গায়ে সুড়ঙ্গ কাটতে সুরু করল। কাটতে কাটতে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ হয়ে যেতেই রাজা আবার ধাওয়া সুরু করল। ভাসিলিসা তখন তোয়ালেটা পিছন দিকে দোলাতেই অমনি একটা বিরাট সমুদ্র

হয়ে গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে তীর পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়াল রাজা — রাস্তা বন্ধ। ফিরে যেতে হল।

ভাসিলিসা আর ইভান যখন প্রায় এসে গেছে ইভান বলল:

'আমি আগে গিয়ে বাবা-মাকে খবর দিই, তুমি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করো।'

যাদুকরী ভাসিলিসা বলল, 'শুধু একটা কথা মনে রেখো কিন্তু, বাড়ী পৌঁছে সবাইকে চুমো দিও। কিন্তু ধর্মমাকে নয়, ধর্মমাকে চুমো দিলেই আমার কথা সব ভুলে যাবে।'

সওদাগরপুত্র ইভান বাড়ী ফিরে এল, খুশী হয়ে চুমু খেল সবাইকে। ধর্মমাকেও চুমু দিল, ভুলে গেল যাদুকরী ভাসিলিসার কথা। আর বেচারী ভাসিলিসা একা একা রাস্তায় অপেক্ষা করে; ইভান আর আসে না। তাই সহরে গিয়ে এক বুড়ীর বাড়ী কাজ নিল ভাসিলিসা। এদিকে সওদাগরপুত্র ইভানের বিয়ে করার ইচ্ছে হল। একটি কনে পছন্দ করে বিরাট ভোজের আয়োজন করতে লাগল।

যাদুকরী ভাসিলিসা তা জানতে পেরে ভিখারী সেজে সওদাগরের বাড়ী গেল ভিক্ষে করতে।

সওদাগরের বৌ বলল, 'একটু দাঁড়াও, বাছা; তোমায় একটা ছোটো পিঠে ভেজে দিই। বিয়ের বড়ো পিঠেটা কাটবার আমার ইচ্ছে নেই।'

'যা দাও মা, তাই ভাল। মঙ্গল হোক তোমার।'

বড়ো পিঠেটা কিন্তু পুড়ে গেল, আর সেই ছোটো পিঠেটা হল ভারি সুন্দর। সওদাগরের বৌ ছোটো পিঠেটা ভোজের জন্যে রেখে পোড়া পিঠেটা দিল ভিখারীকে। ছোটো পিঠেটা টেবিলের ওপর কাটতেই ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল এক জোড়া ঘুঘু।

ঘুঘু তার জুড়ীকে বলে, 'আমায় একটা চুমু দাও না!'

'না, দেব না। তাহলে তুমিও আমায় ভুলে যাবে, সওদাগরপুত্র ইভান যেমন ভুলে গেছে যাদুকরী ভাসিলিসাকে।'

ঘুঘুটা বারবার তিনবার বলল, 'চুমো দাও না!'

'না, দেব না। তবে তুমিও আমায় ভুলে যাবে, সওদাগরপুত্র ইভান যেমন ভুলে গেছে যাদুকরী ভাসিলিসাকে।'

সবকথা মনে পড়ে গেল ইভানের, চিনতে পারলে কে ঐ ভিখারী মেয়েটি। বাবা-মাকে অতিথি অভ্যাগতকে সে বললে:

'এই আমার বৌ!'

'তা তোমার যখন এক বৌ আছেই, তখন তার সঙ্গেই ঘর করো!'

নতুন কনেটিকে তারা দামী দামী উপহার দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। আর সওদাগরপুত্র ইভান তার যাদুকরী ভাসিলিসার সঙ্গে মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগল। ধনধান্যে ঘর ভরা, দুঃখের মুখ দেখে না।

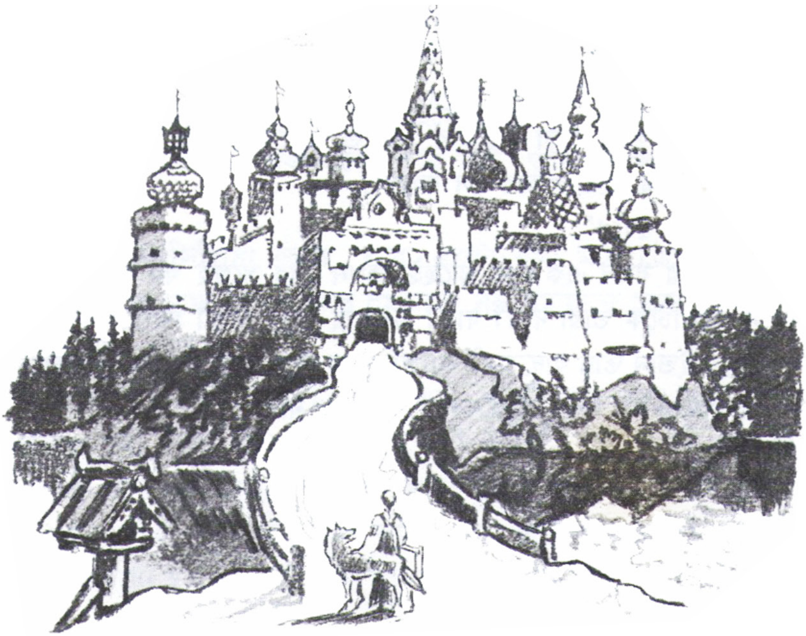

ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত

এক যে ছিল চাষী। তিন মেয়ে রেখে মারা গেল চাষীর বৌ। চাষী ভাবল একটা ঝি রাখা যাক, সংসারের কাজকর্ম করবে। কিন্তু চাষীর সবচেয়ে ছোট মেয়ে মার্‌্যুশকা বলল:

'ঝি আর রেখো না, বাবা। আমি একাই সংসার দেখব।'

তাই সই। মার্‌্যুশকাই সংসার দেখে। সবেতেই তার হাত। সবেতেই সে দড়। মার্‌্যুশকাকে খুব ভালবাসে চাষী। এমন চালাক চতুর কাজের মেয়ে পেয়ে তার ভারী আনন্দ। দেখতেও পটের সুন্দরী! তার অন্য বোনেরা কিন্তু হিংসুটে

আর লোভী। এদিকে রূপ নেই আর ফ্যাশনের ঘটা, সারাক্ষণ রং মাখে, রুজ মাখে, সেজেগুজে বসে থাকে। এ সাজ, সে সাজ, এ জুতো, সে জুতো, এ রুমাল, সে রুমাল।

একদিন বুড়ো চাষী বাজারে যাবে। মেয়েদের ডেকে বলল:

'তোদের কার জন্যে কী আনব, বাছারা? কী পেলে খুশী হবি?'

বড় দু'বোন বলল:

'একটা করে শাল এনো — ফুল-তোলা, সোনা-ঝলা।' মার্যুশকা কিন্তু চুপ করে থাকে। বাপ জিজ্ঞেস করল:

'আর তোর কী চাই, মার্যুশকা?'

'আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের একটা পালক এনো।'

চাষী বাজার থেকে দুটো শাল নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু পালক আর পেল না।

পরের বার চাষী আবার বাজারে গেল। বলে:

'কী চাই তোদের, ফরমাশ কর।'

বড় দুজন খুশী হয়ে বলল:

'আমাদের জন্যে এক জোড়া করে রূপোর নাল বসানো জুতো এনো।'

মার্যুশকা কিন্তু আবার বলে:

'আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের একটা পালক এনো।'

সারাদিন বাজারে ঘুরে ঘুরে চাষী দু'জোড়া জুতো কিনলে। কিন্তু ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের পালক কিছুতেই পেল না। পালক ছাড়াই ফিরে এল।

বারবার তিন বার। চাষী আবার চলল বাজারে। বড় দুই মেয়ে বলে:

'আমাদের জন্যে দুটো নতুন পোষাক এনো, বাবা।'

কিন্তু মার্যুশকা আবার বলে:

'আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের পালক এনো।'

বেচারী চাষী সারা দিন ঘুরে বেড়াল। কিন্তু পালক কোথাও পেল না। সহর ছেড়ে বেরুতেই এক বুড়োর সঙ্গে দেখা।

'কী দাদু, ভালো তো?'

'ভালোই বাছা! চললে কোথায়?'

'বাড়ী ফিরছি দাদু, গ্রামে। কিন্তু ভারী মুশকিলে পড়েছি। ছোট মেয়ে বেরবার সময় বলে দিয়েছিল ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের একটা পালক আনতে। তা আমি কোথাও খুঁজে পেলুম না।'

'তেমন পালক আমার একটা আছে। এ কিন্তু যাদু পালক। তবে ভালো লোককে দিতে বাধা নেই।'

বুড়ো বের করে চাষীর হাতে দিল পালকটা — সাধারণ পালক। যেতে যেতে চাষী ভাবে, "এর মধ্যে ভালো কী দেখল মারুশকা?"

বাড়ী পৌঁছে চাষী মেয়েদের জিনিস ভাগ করে দিল। বড় দুই বোন তাদের নতুন সজ্জায় সাজে আর মারুশকাকে দেখে হাসে:

'যা বোকা ছিল সেই বোকাই রয়ে গেল! এবার পালকটি মাথায় গোঁজ, চমৎকার দেখাবে!'

মারুশকা উত্তর না দিয়ে সরে গেল। তারপর বাড়ীর সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, মারুশকা তখন পালকটা মেঝেয় ফেলে আস্তে আস্তে বলে কি:

'লক্ষ্মী ফিনিস্ত — ঝলমলে বাজ, পথ চাওয়া বর এসো গো আজ।'

অমনি এক অপরূপ সুন্দর কুমার এসে হাজির। ভোর হতেই কুমার মেঝেয় আছাড় খেয়ে আবার বাজপাখি হয়ে গেল। মারুশকা জানলা খুলে দিতেই পাখিটা উড়ে গেল নীল আকাশে।

পর পর তিন রাত্তির মারুশকা কুমারকে ডেকে আনল। সারাদিন সে বাজপাখি হয়ে নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু যেই রাত হয়ে আসে অমনি মারুশকার কাছে এসে দাঁড়ায় অপূর্ব এক সুন্দর কুমার।

চতুর্থ দিন হিংসুটে দুই বোন তা দেখে ফেললে। বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করলে।

চাষী বলল, 'তোরা বাপু নিজেদের চরকায় তেল দে তো।'

বোনেরা ভাবে, "বেশ, দেখা যাবে কী দাঁড়ায়।"

কতগুলো ধারালো ছুরি জানলার বাজুতে পুঁতে রেখে লুকিয়ে রইল তারা।

উড়ে এল সেই ঝলমলে বাজপাখি। জানলা অবধি আসে, কিন্তু মারুশকার ঘরে আর ঢুকতে পারে না। জানলার কাঁচে পাখিটা সমানে ঝাপটা মেরে চলে। বুক তার কেটে কেটে যায়। মারুশকা কিন্তু কিছুই জানে না। অঘোরে ঘুমচ্ছে। পাখিটা তখন বলে উঠল:

'যে আমায় চায়, সে আমায় পাবে, কিন্তু সহজে নয়। তিনজোড়া লোহার জুতোর তলা ক্ষইয়ে, তিনটে লোহার দণ্ড ভেঙ্গে, তিনটে লোহার টুপি ছিঁড়ে তবে।'

এই কথা মারুশকার কানে যেতেই সে লাফিয়ে উঠল, চাইল জানলার দিকে, কিন্তু বাজপাখি নেই, জানলায় শুধু রক্তের দাগ। খুব কাঁদতে লাগল মারুশকা। চোখের জলে রক্তের দাগ মুছে নিল, হয়ে উঠল আরও সুন্দর।

বাবার কাছে গিয়ে মারুশকা বলল:

'আমায় বকো না বাবা, আমি চললাম দূরের পথে। বেঁচে থাকি দেখা হবে। না থাকি, তবে সেই আমার নির্বন্ধ।'

খুব কষ্ট হচ্ছিল চাষীর তবু শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিতে হল তার আদরের মেয়েটিকে।

মারুশকা তাই তিনজোড়া লোহার জুতো, তিনটে লোহার দণ্ড, আর তিনটে লোহার টুপি ফরমাশ দিল। তারপর তার চিরবাঞ্ছিত বন্ধু ঝলমলে বাজ ফিনিস্তকে খুঁজতে পাড়ি দিল দূরের পথে। চলল সে খোলা মাঠ ভেঙ্গে, ঘন বন পেরিয়ে, খাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে। পাখিরা ওকে গান শুনিয়ে খুশী করে, ঝরণা ওর সুন্দর ধবধবে মুখখানি ধুয়ে দেয়, ঘন বন ওকে ঢেকে নেয়। মারুশকার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারে না। পাঁশুটে নেকড়ে, ভালুক, শেয়াল — জঙ্গলের যত জন্তু সবাই ছুটে আসে তার কাছে। হাঁটতে হাঁটতে এক জোড়া লোহার জুতো ক্ষয়ে গেল, একটা লোহার দণ্ড ভাঙ্গল, একটা লোহার টুপি ছিঁড়ল।

মারুশকা তখন বনের একটা ফাঁকায় এসে দেখে, মুরগীর পায়ের উপর একটা ছোট কুঁড়েঘর ঘুরে চলেছে।

'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও! ভেতরে যাব, রুটি খাব।'

কুঁড়েঘরটা তখন বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মারুশকার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। মারুশকা ঘরে ঢুকে দেখে, বসে আছে এক ডাইনী, বাবা-ইয়াগা — খেংরাকাঠি পা, বসেছে ড্যাং ড্যাং, ঘর জোড়া তার ঠ্যাং, ঠোঁট উঠেছে তাকে, ছাত ঠেকেছে নাকে।

ডাইনীটা মারুশকাকে দেখেই বলে উঠল:

'হাউমাউখাউ, রুশীর গন্ধ পাউ! কীরে সুন্দরী, কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?'

'ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের খোঁজে বেরিয়েছি, ঠাকুমা।'

'সে যে অনেক দূর গো, সুন্দরী। তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে তিন নয়ের রাজ্যে। রাণী-মায়াবিনী তাকে যাদু করা সরবৎ খাইয়ে বিয়ে করেছে। তবে আমি তোকে সাহায্য করব। এই নে একটা রুপোর পিরিচ আর একটা সোনার ডিম। তিন নয়ের রাজ্যে গিয়ে রাজবাড়ীর দাসীর কাজ নিস। কাজের পর এই ডিমটা রাখিস পিরিচে। নিজে থেকেই ডিমটা ঘুরবে। কিনতে চাইলে এমনিতে দিস না। ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের সঙ্গে দেখা করতে চাইবি।'

মারুশকা বাবা-ইয়াগাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আঁধার হয়ে উঠল বন, হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। পা ফেলতেও ভয় করে মারুশকার। এমন সময় এল এক বেড়াল। লাফিয়ে মারুশকার কোলে উঠে ঘড়ঘড় করে বললে:

'ভয় পেও না মারুশকা, এগিয়ে যেও। যত এগোবে তত ভয়ানক হয়ে উঠবে বনটা। কিন্তু থেমো না আর খবরদার, পিছনদিকে তাকিও না।'

বেড়ালটা মারুশকার পায়ে গা ঘষে চলে গেল! মারুশকা তো এগিয়ে চলে। যত এগোয় বনও তত গভীর, তত অন্ধকার হয়ে ওঠে। তবু হেঁটেই চলে মারুশকা। আরো এক জোড়া লোহার জুতো ক্ষয়ে গেল, লোহার দণ্ড ভেঙ্গে গেল, লোহার টুপিটা ছিঁড়ে গেল। মারুশকা এসে পড়ল একটা কুঁড়েঘরের

সামনে। কুঁড়েটা একটা মুরগীর পায়ের উপর বসানো। চারিদিকে বেড়া। আর খুঁটির ডগায় সব মাথার খুলি, তাতে আগুন জ্বলছে।

মারুশকা বলল:

'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও! ভেতরে যাব, রুটি খাব।'

বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ওর দিকে মুখ করে দাঁড়াল কুঁড়েঘর। মারুশকা ঢুকে গেল ভিতরে। দেখে, ডাইনী, বাবা-ইয়াগা — খেংরাকাঠি পা, বসেছে ড্যাং ড্যাং, ঘর জোড়া তার ঠ্যাং, ঠোঁট উঠেছে তাকে, ছাত ঠেকেছে নাকে।

মারুশকাকে দেখে ডাইনী বলল:

'হাউমাউখাউ, রুশীর গন্ধ পাউ! কীরে সুন্দরী, কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?'

'ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের খোঁজে চলেছি, ঠাকুমা।'

'আমার বোনের কাছে গিয়েছিলি?'

'গিয়েছিলুম, ঠাকুমা।'

'বেশ। তবে আমি তোকে সাহায্য করব, সুন্দরী। এই সোনার ছুঁচ রুপোর ফ্রেমটা নে। ছুঁচটা নিজে নিজেই লাল মখমলে সোনালি রুপোলি নক্সা তুলবে। কেউ কিনতে চাইলে দিস না। ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের সঙ্গে দেখা করতে চাইবি।'

বাবা-ইয়াগাকে ধন্যবাদ দিয়ে মারুশকা চলল। বনের মধ্যে মড়মড় করে, দুমদাম করে, শনশন করে। ঝোলানো মাথার খুলিগুলো থেকে ঠিকরে ঠিকরে পড়ে ভূতুড়ে আলো। ভয়ে মরে মারুশকা। হঠাৎ কোথা থেকে একটা কুকুর দৌড়ে এল:

'ভেউ, ভেউ, মারুশকা, ভয় করো নে লক্ষ্মীটি। এগিয়ে যেও, বন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। পিছনদিকে তাকিও না।'

এই বলেই কোথায় উধাও। মারুশকা হাঁটে তো হাঁটে। আরো ঘন কালো হয়ে ওঠে বনটা। পা ঠেকে ঠেকে যায়, আস্তিন বেধে বেধে যায়... হাঁটে আর হাঁটে মারুশকা, পিছনে তাকায় না।

অনেক দিন, নাকি অল্প দিন, কে জানে। লোহার জুতো ক্ষয়ে গেল, লোহার দণ্ড ভেঙে গেল, লোহার টুপিটা ছিঁড়ে গেল। পৌঁছল মারুশকা বনের মধ্যে ঘাসে ঢাকা ফাঁকা একটা জায়গায়; দেখে, মুরগীর পায়ের ওপর একটা কুঁড়েঘর। লম্বা লম্বা খুঁটি দিয়ে ঘের দেওয়া। খুঁটির ডগায় ডগায় আগুনে ধকধক করছে ঘোড়ার মাথার খুলি।

মারুশকা বলল:

'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও!'

বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মারুশকার দিকে মুখ করে দাঁড়াল কুঁড়েঘর। মারুশকা ভিতরে ঢুকে গেল। দেখে, ডাইনী, বাবা-ইয়াগা — খেংরাকাঠি পা, বসেছে ড্যাং ড্যাং, ঘর জোড়া তার ঠ্যাং, ঠোঁট উঠেছে তাকে, ছাত ঠেকেছে নাকে। একটি দাঁত শুধু নড়বড় করছে মুখে। মারুশকাকে দেখে গরগর করে উঠল বুড়ীটা:

'হাউমাউখাউ, রুশীর গন্ধ পাউ! কীরে সুন্দরী, কাজ আছে কি করার, নাকি কাজের ভয়ে ফেরার?'

'আমি চলেছি ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের খোঁজে।'

'তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, সুন্দরী। কিন্তু আমি তোকে সাহায্য করব। এই নে রুপোর তকলি, সোনার টাকু। টাকুটা হাতে ধরলেই নিজে নিজে সোনার সুতো কাটা হবে।'

'অনেক ধন্যবাদ, ঠাকুমা।'

'ধন্যবাদ পরে দিস, এখন কথা শোন! টাকুটা যদি কিনতে চায় দিস না, ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের সঙ্গে দেখা করতে চাইবি।'

মারুশকা বাবা-ইয়াগাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলল তার পথ ধরে। বনে তখন ঘড়ঘড় গর্জন, গুরুগুরু ডাক, সাঁইসাঁই আওয়াজ। প্যাঁচারা পাক খেয়ে পড়ে, ইঁদুরেরা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে — সবই মারুশকার গায়ে। হঠাৎ একটা পাঁশুটে নেকড়ে কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল:

'ভয় নেই মারুশকা, আমার পিঠে চড়ে বসো, পিছনে তাকিও না।'

মারুশকা তখন নেকড়ের পিঠে চড়ে বসতেই এক পলকে উধাও। সামনে তার অঢেল স্তেপ, মখমলী মাঠ, মধুর নদী, হালুয়ার পাড়, মেঘ-ছোঁয়া উ'চু পাহাড়। ছুটতে ছুটতে নেকড়ে ওকে নিয়ে এল এক স্ফটিকের পুরীর সামনে। তার জালি-কাজের অলিন্দ, কারু-কাজের জানলা। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে রাণী।

নেকড়ে বলল, 'তাহলে এবার পিঠ থেকে নামো, মারুশকা, রাজপুরীতে দাসীর কাজ নাও গে।'

মারুশকা নেকড়ের পিঠ থেকে নেমে পেঁটলাটা নিয়ে নেকড়েকে অনেক ধন্যবাদ দিল। রাণীর কাছে কুর্নিশ করে মারুশকা বলে:

'জানি না কী বলে ডাকব, কী মানে মান্যি করব, আপনার বাড়ীতে কি দাসী লাগবে?'

রাণী বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাপু, অনেক দিন থেকে একটি দাসী খুঁজছি যে সুতো কাটতে, কাপড় বুনতে, নক্সা তুলতে জানে।'

মারুশকা বলল, 'এ সবই পারি।'

'তাহলে এসো, কাজে লেগে যাও!'

রাজবাড়ীর দাসী হল মারুশকা। দিনভর কাজ করে, তারপর রাত হতেই রুপোর পিরিচ সোনার ডিমটা বের করে বলে:

'রুপোর পিরিচে সোনার ডিম ঘুরে যা, ঘুরে যা। দেখিয়ে দে, কোথায় আমার ফিনিস্ত।'

আর অমনি সোনার ডিমটা ঘোরে আর ঘোরে আর সামনে এসে দাঁড়ায় ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত। চেয়ে চেয়ে মারুশকার আর সাধ মেটে না, দু'চোখ তার জলে ভেসে যায়।

'ফিনিস্ত আমার, ফিনিস্ত! কেন ছেড়ে গেলে এই হতভাগিনীকে। কেঁদে যে আর বাঁচি না...'

রাণী সে কথা শুনতে পেয়ে বলে:

'মারুশকা, তোমার রুপোর পিরিচ সোনার ডিম আমায় বেচে দাও।'

মারুশকা বলল, 'না, এ আমার বিক্রীর নয়, তবে তুমি যদি আমায় ঝলমলে বাজ ফিনিস্তকে দেখতে দাও তাহলে এটা তোমায় এমনিই দিয়ে দেব।'

রাণী ভেবে চিন্তে বলল:

'বেশ, তাই হোক। রাতে ও যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন তোমায় দেখতে দেব।'

রাত হলে মারুশকা ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের ঘরে গেল। দেখে তার আদরের ফিনিস্ত গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। সে ঘুম ভাঙে না। দেখে দেখে মারুশকার আর সাধ মেটে না। তার মধুঢালা মুখে চুমু খেল মারুশকা, নিজের ধবধবে বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ঘুমিয়েই রইল তার আদরের ধন ফিনিস্ত। কিছুতেই জাগল না। ভোর হয়ে গেল, তবুও মারুশকা তার ফিনিস্তের ঘুম ভাঙাতে পারল না...

সারাদিন সে কাজ করল। তারপর সন্ধ্যাবেলায় সে নিয়ে বসল তার রুপোর ফ্রেম সোনার ছুঁচ। সেলাই হতে থাকে, আর মারুশকা বলে:

'ফুল তুলে যা, ফুল তুলে যা। সেই তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছবে আমার ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত।'

রাণী সে কথা শুনতে পেয়ে বলল:

'মারুশকা, তোমার সোনার ছুঁচ রুপোর ফ্রেম আমায় বেচে দাও।'

মারুশকা বলল, 'বিক্রী আমি করব না। তবে তুমি যদি আমায় ঝলমলে বাজ ফিনিস্তকে দেখতে দাও তাহলে অমনিই দিয়ে দেব।'

ভাবল রাণী, ভেবে দেখল, তারপর বলল:

'বেশ, তাই সই। রাত্তিরে এসে ওকে দেখে যেও।'

রাত এল। মারুশকা শোবার ঘরে ঢুকে দেখল তার ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত অঘোরে ঘুমিয়ে।

'ওগো ফিনিস্ত, ওগো আমার ঝলমলে বাজ, ওঠো, ওঠো, ঘুম ভেঙে ওঠো!'

ফিনিস্ত কিন্তু অঘোরে ঘুমিয়ে। মারুশকা হাজার চেষ্টা করেও তাকে জাগাতে পারল না।

ভোর হয়ে গেল। কাজকর্মে লাগল মারুশকা, রুপোর তকলি আর সোনার টাকু নিয়ে বসল। তা দেখে রাণী বলে:

'বেচে দাও মারুশকা, বেচে দাও!'

মারুশকা বলল:

'বেচার জন্যে বেচব না। তবে যদি তুমি আমায় ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের সঙ্গে কেবল এক ঘণ্টা থাকতে দাও তাহলে তোমায় অমনিই দিয়ে দিতে পারি।'

রাণী বলল, 'বেশ।'

মনে মনে ভাবল, "জাগাতে তো আর পারবে না।"

রাত্তির হল। মারুশকা এসে ঢুকল শোবার ঘরে, কিন্তু ফিনিস্ত আগের মতই অঘোরে ঘুমিয়ে।

'ওগো ফিনিস্ত, ওগো আমার ঝলমলে বাজ, ওঠো, ওঠো, ঘুম থেকে জাগো!'

ফিনিস্ত কিন্তু ঘুমিয়েই রইল। কিছুতেই জাগল না।

মারুশকা কত চেষ্টা করল তাকে জাগাতে, কিন্তু কিছুতেই পারল না। এদিকে ভোর হয় হয়।

মারুশকা কেঁদে ফেলল। বলল:

'প্রাণের ফিনিস্ত, ওঠো গো, চোখ মেলে দেখো, দেখো তোমার মারুশকাকে, বুকে তাকে জড়িয়ে ধরো!'

ফিনিস্তের খোলা কাঁধের ওপর তখন মারুশকার চোখের জল ঝরে পড়ল, সে চোখের জলের ছ্যাঁকা লেগে নড়ে উঠল ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত। চোখ মেলে দেখল — মারুশকা! অমনি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল তাকে। বলল:

'একি সত্যিই তুমি আমার মারুশকা! তুমি তবে তিনজোড়া লোহার জুতো ক্ষইয়ে, তিনটে লোহার দণ্ড ভেঙে, তিনটে টুপি ছিঁড়ে সত্যিই এলে? আর কেঁদো না। চলো এবার বাড়ী যাই।'

ওরা বাড়ী যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগল। কিন্তু রাণী তা দেখতে পেয়ে হুকুম দিল ঢেঁড়া দিতে, স্বামীর বেইমানী রটিয়ে দিতে।

রাজরাজড়া সওদাগররা সব জড়ো হল, পরামর্শ করতে লাগল ঝলমলে বাজ ফিনিস্তকে কী দণ্ড দেওয়া যায়।

ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল:

'আপনারাই বলুন আসল বৌ কে? যে আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে, না যে আমায় বেচতে চায়, ঠকাতে চায়?'

সবাই তখন মেনে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, মারুশকাই তার বৌ।

তাই সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল তারা। নিজেদের দেশে ফিরে গেল। সেখানে বিয়ের দিন তোপের পর তোপ পড়ল, শিঙ্গার পর শিঙ্গা বাজল আর ভোজটা হল এমন জমকালো যে এখনো লোকে তার কথা ভোলেনি।

সিভ্‌কা-বুর্কা

এক যে ছিল বুড়ো, তার তিন ছেলে। বড় দুই ছেলে চাষবাস দেখত, মাথা উঁচিয়ে চলত, বেশভূষা করত। ছোট ছেলে বোকা ইভান তেমন কিছু নয়। সারাদিন সে বাড়ীতেই চুল্লীর উপরের তাকে বসে কাটাত। আর মাঝে মাঝে বনে যেত ব্যাঙের ছাতা তুলতে।

বুড়োর যখন মরবার সময়, তখন একদিন তিন ছেলেকে ডেকে বললে:

'আমি মরে গেলে পর পর তিন রাত আমার কবরে রুটি নিয়ে আসিস।'

মরে গেল বুড়ো। কবর দেওয়া হল তাকে। সেই রাত্রে বড় ভাইয়ের কবরে

যাওয়ার পালা। কিন্তু বড় ভাইয়ের আলসেমি লাগে, নাকি ভয় পায়। ছোট ভাই বোকা ইভানকে বলে:

'ইভান, আজ যদি তুই আমার বদলে বাবার কবরে যাস, তবে তোকে একটা পিঠে কিনে দেব।'

ইভান তক্ষুণি রাজি। রুটি নিয়ে চলে গেল বাবার কবরে। বসে বসে অপেক্ষা করে। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে বুড়ো বাবা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল:

'কে ওখানে? আমার বড় ছেলে নাকি? বল তো শুনি রুশদেশের খবর? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছা কাঁদছে?'

ইভান বলল, 'বাবা, এই যে আমি, তোমার ছেলে। রুশদেশ শান্তিতে আছে, বাবা!'

বুড়ো তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে আবার কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর ইভান পথে থামতে থামতে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বাড়ী ফিরল।

বাড়ী ফিরতে বড় ভাই জিজ্ঞেস করল:

'হ্যাঁ রে, বাবাকে দেখলি?'

ইভান বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'রুটি খেল?'

'হ্যাঁ খেল, পেট পুরে।'

আর একটা দিন কেটে গেল। সেদিন মেজ ভাইয়ের যাবার পালা। আলসেমি করেই হোক বা ভয় পেয়েই হোক মেজ ভাই বলে:

'ইভান, তুই বরং আজ আমার বদলে যা, তোকে এক জোড়া লাপ্‌তি বানিয়ে দেব।'

ইভান বলল, 'বেশ।'

রুটি নিয়ে ইভান আবার গেল কবরের কাছে। অপেক্ষা করে বসে রইল। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে ইভানের বুড়ো বাবা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল:

'কে ওখানে? আমার মেজ ছেলে নাকি? বল তো শুনি রুশদেশের খবর? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছা কাঁদছে?'

ইভান জবাব দিল:

'আমি তোমার ছেলে, বাবা। রুশদেশ বেশ শান্তিতেই আছে।'

বুড়ো তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। পথে থেমে থেমে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বাড়ী ফিরল ইভান। বাড়ী ফিরতে মেজ ভাই জিজ্ঞেস করল:

'হ্যাঁ রে, রুটি খেল বাবা?'

'খেল, পেট পুরে খেল।'

তৃতীয় রাত্তির। সেদিন ইভানের যাবার পালা। ইভান দাদাদের বলল:

'দু'রাত্তির আমি গেছি। আজ তোমরা কেউ যাও। আমি বাড়ীতে ঘুমিয়ে নিই।'

দাদারা বলল:

'সে কী রে ইভান, তোর তো বেশ জানা শোনা হয়ে গেছে, তুই বরং যা।'

'তা বেশ, আমিই যাব।'

রুটি নিয়ে ইভান চলে গেল। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে ইভানের বুড়ো বাবা উঠে এল। জিজ্ঞেস করল:

'কে ওখানে? আমার ছোট ছেলে ইভান নাকি? বল শুনি রুশদেশের খবর? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছা কাঁদছে?'

ইভান জবাব দিল:

'আমি ইভান, বাবা, তোমার ছেলে। রুশদেশ বেশ শান্তিতে আছে।'

বাপ তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে বলল:

'তুই একমাত্র আমার কথা শুনলি। পর পর তিন রাত্তির আমার কবরে

আসতে একটুও ভয় পাসনি। এবার এক কাজ কর, খোলা মাঠে গিয়ে চীৎকার করে ডাকবি: "সিভ্‌কা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!" ঘোড়াটা তোর সামনে আসবে, তুই ওর ডান কান দিয়ে ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে আসিস। দেখবি তোর রূপ খুলে যাবে। তারপর ঘোড়ায় চেপে যথা ইচ্ছা তথা যাস।'

বুড়ো বাবা ইভানকে একটা লাগাম দিল। ইভান লাগামটা নিয়ে বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে পথে পথে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে বাড়ী ফিরল। বাড়ী ফিরতেই ভাইয়েরা জিজ্ঞেস করল:

'কিরে, বাবার সঙ্গে দেখা হল?'

ইভান বলল, 'হল।'

'রুটি খেল?'

'পেট পুরে খেল। বললে কবরে আর আসতে হবে না।'

এদিকে হয়েছে কি, রাজা তখন চারদিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিয়েছেন — রাজ্যের যত রূপবান, আইবুড়ো, কুমারদের সব তাঁর রাজদরবারে উপস্থিত হওয়া চাই। রাজকন্যা লাবণ্যবতীর জন্যে ওক গাছের বারো খুঁটির ওপর, বারো কুঁদো দিয়ে এক কোঠা বানান হয়েছে। সেই কোঠার একেবারে ওপরে রাজকন্যা বসে থাকবেন, আর যে ঘোড়ার পিঠে বসে এক লাফে পৌঁছে রাজকন্যার ঠোঁটে চুমু খেতে পারবে, রাজা তাকেই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা লাবণ্যবতীকে দেবেন। তা সে যে ঘরের ছেলেই হোক।

ইভানের ভাইয়েদের কানেও একথা পৌঁছতে দেরি হল না। বললে:

'দেখা যাক ভাগ্য পরীক্ষা করে।'

তেজী ঘোড়াদুটোকে ওরা বেশ করে যবের ছাতু খাওয়াল। তারপর নিজেরা ফিটফাট পোষাক পরে, বাবরি চুলটি আঁচড়ে তৈরী হল। ইভান তখন চিমনির পেছনে চুল্লীর তাকে বসে। বলল:

'আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না দাদা, আমিও একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে আসি!'

'দূর, হতভাগা, তুই বরং বনে ব্যাঙের ছাতা খুঁজে বেড়া গে যা, লোক হাসিয়ে দরকার নেই!'

বড় দু'ভাই তেজী ঘোড়ায় চড়ে টুপি বাঁকিয়ে, চাবুক চালিয়ে, শিস দিতেই — একরাশ ধুলোর মেঘ আকাশে। ইভান তখন বাবার দেওয়া লাগামটা নিয়ে চলে গেল খোলা মাঠে। তারপর বাবার কথামত ডাকলে:

'সিভ্‌কা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!'

কোত্থেকে কে জানে, ছুটে এল ঘোড়া। তার খুরের দাপে মাটি কাঁপে, নাক দিয়ে আগুন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরয়। মাটিতে পা গেঁথে বলে:

'বলো, কী হুকুম!'

ইভান ঘোড়াটার গলা চাপড়ে নিয়ে তাকে লাগাম পরাল, তারপর তার ডান কান দিয়ে ঢুকে, বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে এল। আর কী আশ্চর্য! অমনি সে হয়ে গেল এক সুন্দর তরুণ — কী তার রূপ — সে রূপ বলার নয়, শোনার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজপুরীর দিকে রওনা হল ইভান। ছুটল ঘোড়া কদমে, কাঁপল মাটি সঘনে, পেরিয়ে গিরি কান্তার, মস্ত সেঁকি ঝাঁপ তার।

ইভান এসে পৌঁছল রাজদরবারে, চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বারো খুঁটির ওপর, বারো কুঁদো দিয়ে এক কোঠা। তার চিলেকোঠায় জানলার পাশে বসে আছে রাজকন্যা লাবণ্যবতী।

রাজা অলিন্দে বেরিয়ে এসে বললেন:

'তোমাদের মধ্যে যে তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাফিয়ে উঠে আমার মেয়ের ঠোঁটে চুমু খেতে পারবে, তার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিয়ে দেব, আর যৌতুক দেব অর্ধেক রাজত্ব।'

কুমারেরা সবাই তখন এক এক করে এগিয়ে লাফাল, কিন্তু কোথায় কে, জানলার নাগাল কেউ ধরতে পারল না। ইভানের দুই ভাইও চেষ্টা করলে, কিন্তু অর্ধেকটা পর্যন্ত গেল না। এবার এল ইভানের পালা।

সিভ্‌কা-বুর্কাকে সে কদমে ছুটিয়ে হাঁক পেড়ে, ডাক ছেড়ে লাফ মারলে। কেবল দুটো কুঁদো বাদে সব কুঁদো সে ছাড়িয়ে গেল। ফের আবার ঘোড়া ছুটাল সে। এবারকার লাফে বাকি রইল একটা কুঁদো। ফের ফিরল ইভান, পাক খাওয়ালে ঘোড়াকে, গরম করে তুললে। তারপর আগুনের হল্কার মতো এক প্রচণ্ড লাফে জানলা পেরিয়ে রাজকন্যা লাবণ্যবতীর মধুঢালা ঠোঁটে চুমু খেয়ে গেল ইভান। আর রাজকন্যাও তার হাতের আংটি দিয়ে ইভানের কপালে ছাপ এঁকে দিল।

লোকজনেরা সব 'ধরো, ধরো!' করে চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু ইভান ততক্ষণে উধাও।

সিভ্‌কা-বুর্কাকে ছুটিয়ে ইভান এল সেই খোলা মাঠে। তারপর ঘোড়ার বাঁ কান বেয়ে উঠে ডান দিয়ে বেরিয়ে এল, আর অমনি সে ফের হয়ে গেল সেই বোকা ইভান। সিভ্‌কা-বুর্কাকে ছেড়ে দিয়ে সে রওনা হল বাড়ীর দিকে। যেতে যেতে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে নিলে। বাড়ী এসে ন্যাকড়া দিয়ে কপালটা বেঁধে চুল্লীর উপরের তাকে উঠে শুয়ে রইল।

ভাইয়েরাও যথা সময়ে ফিরে এসে বলতে লাগল, কোথায় গিয়েছিল, কী দেখল।

'খাসা খাসা সব জোয়ান, একজন কিন্তু সবার সেরা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক লাফে উঠে রাজকন্যার ঠোঁটে চুমু খেয়ে গেছে। দেখলাম কোত্থেকে এল, দেখা গেল না কোথায় গেল।'

চিমনির পিছন থেকে ইভান বলে:

'আমি নই তো?'

ভাইয়েরা সে কথা শুনে ভীষণ চটে গেল:

'বাজে বকিস না, হাঁদা কোথাকার! তার চেয়ে চুল্লীর উপর বসে বসে ব্যাঙের ছাতা গেল।'

ইভান তখন কপালের পটিটা খুলে ফেলল, যেখানে রাজকন্যা ছাপ মেরেছিল আংটি দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই কুঁড়েঘরটা আলোয় আলোয় ভরে গেল। ভাইয়েরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'কী, করছিস কী, হাঁদা কোথাকার! ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিবি যে!'

পরদিন রাজবাড়ীতে বিরাট্ ভোজ। পাত্র মিত্র, জমিদার প্রজা, ধনী গরীব, বুড়ো বাচ্চা — সকলের নেমন্তন্ন।

ইভানের ভাই দুজনও ভোজে খেতে যাবে বলে তৈরী। ইভান বলল:

'দাদা, আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো!'

'কী বললি? তোকে নিয়ে যাব? লোকে হাসবে। তার চেয়ে তুই এখানে চুল্লীর উপরে বসে বসে ব্যাঙের ছাতা গেল।'

দু'ভাই তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়ীর দিকে চলে গেল। আর পায়ে হেঁটে ইভান গেল ওদের পেছন পেছন। রাজপুরীতে পেঁৗছে দূরে এককোণে বসে রইল ইভান। রাজকন্যা লাবণ্যবতী তখন নিমন্ত্রিতদের প্রদক্ষিণ করতে সুরু করেছে। হাতে তার মধু পাত্র। তা থেকে সে এক এক জনকে মধু ঢেলে দেয় আর দেখে কপালে তার আংটির ছাপ আছে কিনা।

সকলকে প্রদক্ষিণ করে এল রাজকন্যা, বাদ রইল কেবল ইভান। ইভানের দিকে রাজকন্যা যত এগোয় তত তার বুক দুরদুর করে। ইভানের সারা গায়ে কালি, মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল।

রাজকন্যা লাবণ্যবতী জিজ্ঞেস করে:

'কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো? কপালে তোমার পটি বাঁধা কেন?'

ইভান বলল, 'পড়ে গিয়ে কেটে গেছে।'

রাজকন্যা পটি খুলে ফেলতেই সারা রাজপুরী আলোয় আলোয় ভরে গেল। রাজকন্যা চেঁচিয়ে উঠল:

'এ তো আমারই ছাপ, একেই তো আমি বরণ করেছি।'

রাজামশাই কাছে এসে বলেন:

'কী যতো বাজে কথা, এ যে একেবারে কালিঝুলি মাখা এক হাঁদা!'

ইভান রাজাকে বললে:

'রাজামশাই, অনুমতি দিন একবার মুখ ধুয়ে আসি।'

রাজামশাই অনুমতি দিলেন। ইভান উঠোনে গিয়ে বাবার কথামত হাঁক দিল:

‘সিভ্‌কা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!’

অমনি কোত্থেকে কে জানে, ছুটে এল ঘোড়া। তার খুরের দাপে মাটি কাঁপে, নাক দিয়ে আগুন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরয়। ইভান তার ডান কান দিয়ে ঢুকে, বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে এল, আর অমনি সে হয়ে গেল সেই রূপবান তরুণ — সে রূপ বলার নয়, শোনার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়। সব লোকে একেবারে আহামরি করে উঠল।

অমনি সব কথা মিটে গেল, বিয়ের ভোজ চলল ধুমধাম করে।

রাজপুত্র ইভান আর পাঁশুটে নেকড়ে

এক যে ছিল রাজা। নাম তার বেরেন্দেই। রাজার তিন ছেলে। ছোটটির নাম ইভান।

চমৎকার এক বাগান ছিল রাজার, সেই বাগানে ছিল আপেল গাছ। সেই গাছে আবার সোনার আপেল হত।

কে যেন রাজবাগানে চুপিচুপি ঢোকে, সোনার আপেল চুরি করে। তা দেখে রাজার মনে আর শান্তি নেই। পাইক পেয়াদা ছুটল, কিন্তু কেউ চোর ধরতে পারল না।

রাজার ভীষণ মন খারাপ। খাওয়া দাওয়া বন্ধ। ছেলেরা বাবাকে সান্ত্বনা দেয়। বলে:

'দুঃখ করো না বাবা, আমরা নিজেরাই বাগানে পাহারা দেব।'

বড় ছেলে বলল:

'আজ আমার পাহারা দেবার পালা।'

এই বলে সে বাগানে গিয়ে সারা সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিল। কিন্তু কারও দেখা নেই। বড় রাজপুত্র তাই নরম ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলা রাজা বললে:

'শুভসংবাদ কিছু আছে কী? দেখলি কে রোজ চুরি করে?'

'না বাবা, সারারাত্তির একটিবারও চোখ বুজিনি, কিন্তু কাউকে তো দেখলাম না।'

পরদিন রাত্তিরে মেজ রাজকুমার গেল পাহারা দিতে। কিন্তু সেও ঘুমিয়ে কাটাল। আর পরদিন সকালে সেও বলল কোনো চোর সে দেখেনি।

এবার ছোট রাজকুমারের পালা। রাজপুত্র ইভান বাগানে পাহারা দিতে গেল। দুদণ্ড বসতেও তার ভয় হয়, কী জানি কেউ যদি ঢুকে পড়ে। ঘুম পেলেই ইভান শিশির দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলে, অমনি ঘুম টুম কোথায় চলে যায়।

তারপর মাঝরাত পেরতেই অবাক কাণ্ড — বাগানে আলো। সে আলো বাড়ে আর বাড়ে। সারা বাগান আলোময়। দেখে কি, আগুনে-পাখি আপেল গাছে বসে বসে সোনার আপেল ঠোকরাচ্ছে।

ইভান চুপিচুপি গাছের কাছে গিয়ে খপ্ করে পাখিটার লেজ চেপে ধরল। পাখিটা কিন্তু হাত ছাড়িয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল। কেবল একটা পালক রয়ে গেল রাজপুত্রের হাতে।

পরদিন সকালে রাজপুত্র ইভান এল বাপের কাছে।

'কী খবর? চোর দেখলি?'

'ধরতে পারিনি বাবা, কিন্তু দেখেছি কে রোজ চুরি করে। এই দেখো চোরের চিহ্ন। এ হল আগুনে-পাখি।'

রাজা ইভানের হাত থেকে পালকটা নিলে। সেই থেকে সুরু হল খাওয়া দাওয়া, আবার মুখে হাসি। কিন্তু আবার একদিন রাজার মনে ভাবনা দেখা দিল।

তিন কুমারকে ডেকে বললে:

'স্নেহের ছেলেরা আমার, যা না তোরা ঘোড়ায় গিয়ে ওঠ, সারা পৃথিবী খুঁজে দেখ। আগুনে-পাখির দেখা কোথাও পাস কিনা।'

রাজপুত্ররা বাপকে কুর্নিশ করে ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বড় রাজকুমার এক দিকে চলল, মেজ গেল অন্য দিকে, ছোটটি আরেক পথে ঘোড়া ছোটাল।

রাজপুত্র ইভান ঘোড়ায় চলেছে অনেকদিন নাকি অল্পদিন, কে জানে। গ্রীষ্মের দিন। ক্লান্ত হয়ে ইভান ঘোড়া থেকে নেমে, তার সামনের পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘুমতে গেল।

অনেকক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ, কতক্ষণ কাটল কে জানে। ঘুম থেকে উঠে রাজপুত্র দেখে ঘোড়া নেই। ঘোড়া খুঁজতে গেল রাজপুত্র। হাঁটতে হাঁটতে শেষকালে এক জায়গায় এসে দেখে, ঘোড়ার কয়েকটা হাড় পড়ে আছে কেবল, তাও আবার চাঁছা পোঁছা পরিষ্কার।

রাজপুত্রের ভীষণ দুঃখ হল। ঘোড়া ছাড়া এ দূরের দেশে যাবে কোথায়?

ভাবে, "তা কী আর হয়েছে, কাজে নেমেছি, উপায় তো নেই।"

এই ভেবে রাজপুত্র পায়ে হেঁটেই চললে। হাঁটতে হাঁটতে রাজপুত্র আর পারে না। নরম ঘাসে বসে বসে দুঃখ করে রাজপুত্র। হঠাৎ দেখে, কোথা থেকে একটা পাঁশুটে নেকড়ে দৌড়তে দৌড়তে তার দিকেই আসছে।

পাঁশুটে নেকড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী রাজপুত্র ইভান, বসে বসে দুঃখ করছো, হেঁট করেছো মাথা?'

'দুঃখ না করে কী করি বলো নেকড়ে, আমার তেজী ঘোড়াটা যে নেই।'

'আমিই সেটাকে খেয়ে ফেলেছি রাজপুত্র ইভান... তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। বলো তো, দূর দেশে এলে কেন, কোন পথে চলেছো?'

'বাবা আমায় পাঠিয়েছেন সারা পৃথিবী ঘুরে দেখতে, আগুনে-পাখির খোঁজ করতে।'

'আরে ছ্যা, তোমার ঐ ঘোড়ায় চড়ে তুমি তিন বছরেও আগুনে-পাখির কাছে পৌঁছতে পারতে না। আমিই কেবল জানি আগুনে-পাখির বাসা কোথায়।

বেশ, আমিই যখন তোমার ঘোড়া খেয়ে ফেলেছি, তখন আজ থেকে আমিই তোমার ন্যায়-ধম্মে কাজ করব। আমার পিঠে বসে বেশ করে জাপটে ধরো।'

রাজপুত্র নেকড়ের পিঠে উঠে বসল। অমনি পাঁশুটে নেকড়েও ছুট লাগাল: পলকে পেরয় নীল বন, নিমেষে ডিঙোয় সরোবর। অনেকদিন নাকি অল্পদিন, শেষকালে ওরা এসে পৌঁছল এক উঁচু কেল্লার কাছে। পাঁশুটে নেকড়ে বলল:

'রাজপুত্র ইভান, বলি শোনো, ভুলো না। পাঁচিল বেয়ে উঠে যাও। কোনো ভয় নেই। আমরা ভাল সময়ে এসেছি, প্রহরীরা সব ঘুমচ্ছে। কোঠায় দেখবে জানলা। সেই জানলায় সোনার খাঁচা। সেই খাঁচায় আছে আগুনে-পাখি। পাখিটাকে বুকের তলায় লুকিয়ে নিয়ে চলে আসবে। কিন্তু মনে রেখো, খাঁচাটা ছুঁয়ো না যেন!'

রাজপুত্র ইভান দেওয়াল বেয়ে উঠে দেখে কোঠা, জানলায় সোনার খাঁচা আর সোনার খাঁচায় সেই আগুনে-পাখি। রাজপুত্র পাখিটা নিয়ে বুকের তলায় লুকিয়ে রাখল। কিন্তু খাঁচাটা থেকে কিছুতেই আর সে চোখ ফেরাতে পারে না। বুক তার দুলে উঠল: "আহা, কী সুন্দর সোনার খাঁচাটা! ছেড়ে যাই কী করে!" নেকড়ের বারণ সে ভুলে গেল। তারপর যেই না রাজপুত্র খাঁচাটা ছুঁয়েছে, অমনি সারা কেল্লায় হৈচৈ। বেজে উঠল রামশিঙা, কাঠি পড়ল কাড়া-নাকাড়ায়। প্রহরীরা জেগে উঠে ইভানকে ধরে নিয়ে গেল রাজা আফ্রনের কাছে।

রাজা ভীষণ রেগে জিজ্ঞেস করলে:

'কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো?'

'আমি রাজা বেরেন্দেইয়ের ছেলে, রাজপুত্র ইভান।'

'ছি ছি! লজ্জার কথা! রাজার ছেলে হয়ে কিনা শেষে চুরিবিদ্যা!'

'কিন্তু রাজামশাই, আপনার পাখিটি যে আমাদের বাগানে আপেল চুরি করতে আসত।'

'তুমি যদি বাছা ভালোমানুষের মতো এসে চাইতে, তাহলে আমি নিজে সম্মান করে তোমার বাবাকে পাখিটি উপহার দিতুম। কিন্তু এখন? তোমাদের এই কলঙ্ক চারিদিকে রাষ্ট্র করে দেব... যাই হোক, এবারের মতো তোমায় মাপ করে দিতে পারি, তবে একটি সর্তে। কুসমান নামে এক রাজার আছে

স্বর্ণকেশরী ঘোড়া। তুমি যদি আমাকে সেই ঘোড়াটা এনে দিতে পারো, তবে আমি তোমায় এই খাঁচাসমেত আগুনে-পাখিটা দিয়ে দেব।'

মনের দুঃখে রাজপুত্র পাঁশুটে নেকড়ের কাছে ফিরে গেল।

নেকড়ে বলল, 'আমি যে তোমায় খাঁচায় হাত দিতে বারণ করেছিলাম! আমার কথা কেন শুনলে না?'

রাজপুত্র বলল, 'যাক গে, মাপ করো নেকড়ে, ক্ষমা করে দাও!'

'আহা, বড়ো বললেন, ক্ষমা করে দাও ... যাক গে, চড়ে বসো আমার পিঠে। নেমেছি যখন কাজে, না করা কি সাজে!'

রাজপুত্রকে পিঠে করে আবার ছুটল নেকড়ে। অনেকদিন নাকি অল্প দিন, শেষ পর্যন্ত তারা এসে পৌঁছল সেই কেল্লায়, স্বর্ণকেশরী ঘোড়া যেখানে থাকে।

'পাঁচিল বেয়ে উঠে যাও, রাজপুত্র, প্রহরীরা সব ঘুমিয়ে আছে। আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে এসো, কিন্তু খবরদার লাগামটা ছুঁয়ো না।'

রাজপুত্র পাঁচিল বেয়ে উঠে দুর্গে ঢুকল। প্রহরীরা সব ঘুমচ্ছে। আস্তাবলে গিয়ে স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে ধরল রাজপুত্র। কিন্তু লাগামটা না ছুঁয়ে সে থাকতে পারল না — একে সোনার লাগাম, তার আবার দামী জড়োয়ার কাজ — যেমন ঘোড়া তার তেমনি লাগাম।

যেই না রাজপুত্র লাগামটা ছুঁয়েছে, অমনি দুর্গের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। বেজে উঠল রামশিঙা, কাড়া-নাকাড়া। প্রহরীরা জেগে উঠে ইভানকে ধরে নিয়ে গেল রাজা কুসমানের কাছে।

'কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো?'

'আমি রাজপুত্র ইভান।'

'ছি ছি, কী বকাটেপনা, ঘোড়া চুরি! সাধারণ একটা চাষীও একাজ করবে না। তা যাক গে, তোমাকে মাপ করতে পারি, যদি তুমি আমার একটা কাজ করে দাও। রাজা দালমাতের একটি মেয়ে আছে, রূপসী ইয়েলেনা। তুমি যদি সেই মেয়েকে হরণ করে এনে দিতে পারো, তবে তোমায় স্বর্ণকেশরী ঘোড়াটি দিয়ে দেব, তার সঙ্গে লাগামটাও।'

আরো বেশী মনের দুঃখে রাজপুত্র পাঁশুটে নেকড়ের কাছে ফিরে গেল।

নেকড়ে বলল, 'লাগামে হাত দিতে তোমায় আগেই তো বারণ করেছিলাম! আমার কথায় কান দিলে না তো।'

'যাক গে, আমায় ক্ষমা করো নেকড়ে, মাপ করে দাও।'

'বড়ো বললেন, ক্ষমা করো!.. যাক গে, কী আর করা, আমার পিঠে চড়ে বসো।'

রাজপুত্রকে পিঠে নিয়ে আবার ছুটে চলল নেকড়ে। ছুটতে ছুটতে এসে পেঁছিল রাজা দালমাতের কেল্লায়। চারপাশে সখীবাঁদী নিয়ে রূপসী ইয়েলেনা তখন কেল্লার বাগানে পায়চারি করছে। পাঁশুটে নেকড়ে বলল:

'এবার তুমি নয় আমিই যাব, তুমি ফিরতি পথ ধরে ফিরে যাও, শীগ্‌গিরই আমি তোমার নাগাল ধরব।'

ফিরতি পথে ফিরে চলল রাজপুত্র ইভান। আর পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পাঁশুটে নেকড়ে ঢুকল বাগানে। ঝোপের পেছনে লুকিয়ে থেকে সে উঁকি দিয়ে দেখে, সখীবাঁদী নিয়ে পায়চারি করছে রূপসী ইয়েলেনা। বেড়াতে বেড়াতে ইয়েলেনা তার সঙ্গীদের চেয়ে একটু পেছিয়ে পড়তেই পাঁশুটে নেকড়ে তাকে চট করে ধরে, পিঠে ফেলে উধাও।

পথে যেতে যেতে রাজপুত্র দেখে, পাঁশুটে নেকড়ে ফিরে আসছে, পিঠে তার রূপসী ইয়েলেনা। রাজপুত্রের খুসি আর ধরে না। নেকড়ে বলল:

'তুমিও পিঠে উঠে বসো জলদি করে, নয়ত ধরে ফেলবে।'

ফিরতি পথে ছুটে চলল পাঁশুটে নেকড়ে, পিঠে তার রূপসী ইয়েলেনা আর রাজপুত্র ইভান বসে। পলকে পেরয় সুনীল বন, নিমেষে ডিঙোয় সরোবর। অনেকদিন নাকি অল্পদিন, শেষ পর্যন্ত তারা এসে পেঁছিল রাজা কুসমানের দেশে। নেকড়ে জিজ্ঞেস করল:

'কী রাজপুত্র, মুখে রা নেই, মন খারাপ?'

'মন খারাপ না করে কী করি বলো। এমন সুন্দরীকে ছেড়ে দিই কী করে? রূপসী ইয়েলেনার বদলে কিনা একটা ঘোড়া।'

'বেশ, সুন্দরীকে ছেড়ে দিও না। ওকে কোথাও লুকিয়ে রেখে আমিই রূপসী ইয়েলেনা হয়ে যাব। তুমি আমায় নিয়ে যেও রাজার কাছে।'

এই বলে তারা রূপসী ইয়েলেনাকে বনের মধ্যে একটা কুঁড়েঘরে লুকিয়ে

রাখল। নেকড়ে শূন্যে একটা ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে পড়তেই, ওমা, একেবারে রূপসী ইয়েলেনার প্রতিমূর্তি। রাজা কুসমানের কাছে নিয়ে যেতে রাজা তো ভারি খুশী, ভারি কৃতজ্ঞ। বললে:

'অনেক ধন্যবাদ রাজপুত্র ইভান, তুমি আমার কনে এনে দিয়েছো। আজ থেকে লাগামসমেত স্বর্ণকেশরী ঘোড়াটা তোমার হল।'

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে রূপসী ইয়েলেনার কাছে ফিরে গেল, তারপর ইয়েলেনাকে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।

রাজা কুসমান তো ওদিকে বিয়ের উৎসবে মত্ত। সারাদিন ধরে চলল খাওয়া দাওয়ার ধূম। তারপর রাত্তিরে শোবার সময় হতে রাজা ইয়েলেনাকে নিয়ে এল শোবার ঘরে। বৌকে নিয়ে শুতে না শুতেই রাজা দেখে, কোথায় তার সুন্দরী, এ যে একটা নেকড়ের মুখ! ভীষণ ভয় পেয়ে বিছানা থেকে উল্টে পড়ল রাজা। আর নেকড়েও সেই সুযোগে লাফিয়ে পড়ে দে ছুট।

দৌড়তে দৌড়তে পাঁশুটে নেকড়ে নাগাল ধরল রাজপুত্রের। জিজ্ঞেস করল:

'রাজপুত্র, অমন মুখভার কেন?'

রাজপুত্র বলল, 'মুখভার না করে কী করি বলো, এমন ধন স্বর্ণকেশরী ঘোড়া, তাকে কিনা দিতে হবে আগুনে-পাখির বদলে।'

'ভেবো না রাজপুত্র, আমি তোমায় সাহায্য করব।'

রাজা আফ্রনের রাজ্যে পৌঁছল ওরা। নেকড়ে বলল:

'ঘোড়াটাকে আর ইয়েলেনাকে লুকিয়ে রাখো। আমি স্বর্ণকেশরী ঘোড়া হব, তুমি আমায় রাজার কাছে নিয়ে যেও, বুঝলে!'

ঘোড়াটাকে আর রূপসী ইয়েলেনাকে ওরা বনে লুকিয়ে রেখে এল। পাঁশুটে নেকড়ে এক ডিগবাজী খেয়েই হয়ে গেল স্বর্ণকেশরী ঘোড়া। রাজপুত্র তাকে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা ভীষণ খুশী হয়ে রাজপুত্রকে সোনার খাঁচাশুদ্ধ আগুনে-পাখি দিয়ে দিলে।

রাজপুত্রও ফিরে গেল বনে। রূপসী ইয়েলেনাকে বসাল স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায়। হাতে নিল সোনার খাঁচায় আগুনে-পাখি। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ী ফিরে চলল।

এদিকে হয়েছে কী, রাজা আফ্রন রাজপুত্রের দেওয়া ঘোড়ার পিঠে যেই চড়তে গেছে, ব্যস — ঘোড়াটা অমনি হয়ে গেল এক পাঁশুটে নেকড়ে। আঁতকে উঠে রাজা যেখানে ছিল সেখানেই উল্টে পড়ল, নেকড়ে ততক্ষণে এক দৌড়ে নাগাল ধরল রাজপুত্রের।

'এবার তাহলে বিদায় দাও রাজপুত্র, আর বেশী দূর আমি যেতে পারব না।'

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তিনবার আভূমি কুর্নিশ করলে, পাঁশুটে নেকড়েকে সম্মান করে ধন্যবাদ দিলে। নেকড়ে বলল:

'চিরদিনের মতো বিদায় দিও না কিন্তু, আবার হয়ত আমায় দরকার হতে পারে।'

রাজপুত্র মনে মনে ভাবে, "আবার কী দরকার হবে? আমার সব ইচ্ছেই তো পূর্ণ হয়ে গেছে!" তারপর স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায় উঠে রূপসী ইয়েলেনাকে বসিয়ে হাতে সোনার খাঁচায় আগুনে-পাখি নিয়ে দেশে ফিরে চলল রাজপুত্র ইভান। নিজের দেশে পেঁাছে রাজপুত্র ভাবল একটু খেয়ে নেওয়া যাক। সঙ্গে একটু রুটি ছিল, দুজনে তাই চিবিয়ে ঝরণার টাটকা জল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

রাজপুত্র ইভান সবে ঘুমিয়েছে, এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে এল তার অন্য ভাইয়েরা। আগুনে-পাখির খোঁজে ওরা নানা দেশ ঘুরে এখন বাড়ী ফিরছে খালি হাতে।

রাজপুত্র ইভান সবকিছু পেয়ে গেছে দেখে ওরা ঠিক করল:

'এসো, ভাইকে মেরে ফেলা যাক, তাহলে ওর সব কিছুই আমাদের হয়ে যাবে!'

এই ভেবে দুই ভাই মিলে ইভানকে মেরে স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায় চড়ে, আগুনে-পাখি নিয়ে, রূপসী ইয়েলেনাকেও ঘোড়ায় বসিয়ে শাসাল:

'দেখো, বাড়ী গিয়ে এর একটি কথাও বলবে না কিন্তু!'

রাজপুত্র ইভান পড়ে আছে মাটিতে, মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে দাঁড়কাকগুলো। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল পাঁশুটে নেকড়ে। খপ্ করে একটা দাঁড়কাক আর তার ছানাকে ধরে বলল:

'উড়ে যা দাঁড়কাক, শীগ্‌গির আমায় জীয়ন জল মরণ জল এনে দে। এনে দিলে তবে তোর ছানাকে ছেড়ে দেব।'

দাঁড়কাক কী আর করে! উড়েই গেল, আর নেকড়ে বসে রইল দাঁড়কাকের ছানাকে নিয়ে। উড়ল অনেক দিন, নাকি অল্প দিন কে জানে, শেষ পর্যন্ত জীয়ন জল মরণ জল নিয়ে ফিরে এল সে। রাজপুত্র ইভানের গায়ে ক্ষতের উপর নেকড়ে মরণ জল ছিটিয়ে দিতেই জখমগুলো সব সেরে গেল। তারপর জীয়ন জল ছিটিয়ে দিতেই রাজপুত্র ইভান বেঁচে উঠল আবার।

'ইস্‌, খুব ঘুমিয়েছি!'

নেকড়ে বলল, 'খুবই ঘুমিয়েছো বটে, তবে আমি না থাকলে আর তোমার সে ঘুম ভাঙত না। তোমার নিজের ভাইয়েরাই তোমায় মেরে রেখে সব ধন নিয়ে চলে গেছে। শীগ্‌গির আমার পিঠে ওঠো।'

পেছু ধাওয়া করে ওরা অচিরেই দুই ভাইকে ধরে ফেলল। নেকড়ে তাদের টুকরো টুকরো করে সারা মাঠে ছড়িয়ে দিলে টুকরোগুলো।

রাজপুত্র ইভান তখন নেকড়েকে কুর্নিশ করে চিরদিনের মতো বিদায় নিল।

রাজপুত্র ইভান বাড়ী ফিরে গেল স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায় চড়ে। বাবার জন্যে এনেছে আগুনে-পাখি আর নিজের জন্যে রূপসী ইয়েলেনা।

রাজা বেরেন্দেই তো মহা খুশী। কত কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। রাজপুত্র বলল পাঁশুটে নেকড়ে তাকে কী রকম সাহায্য করেছে, ভাইয়েরা তাকে কী ভাবে ঘুমের মধ্যে মেরে রেখেছিল, নেকড়ে তাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

সব কথা শুনে রাজার ভীষণ দুঃখ হল প্রথমে। তবে শীগ্‌গিরই সে দুঃখ কেটে গেল। আর রাজপুত্র ইভান রূপসী ইয়েলেনাকে বিয়ে করে সুখেস্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল।

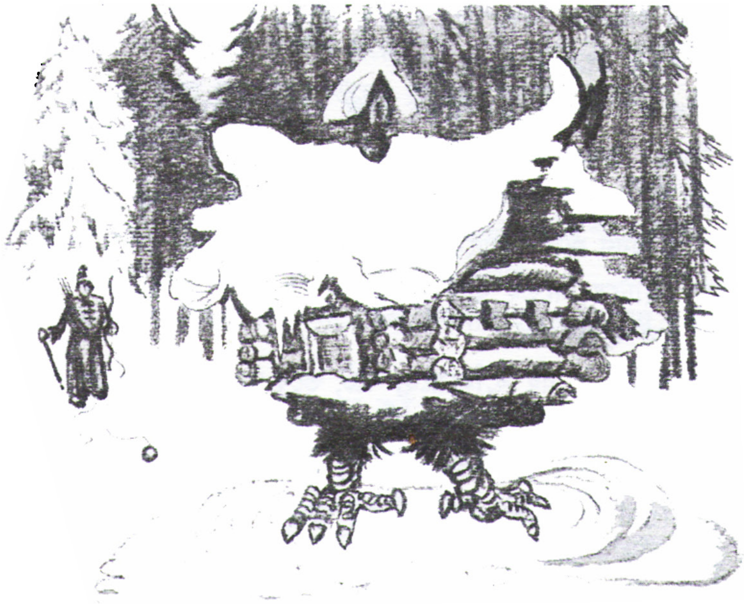

অ-জানি দেশের না-জানি কী

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজা বিয়ে থা করেনি, একাই থাকে। তার কাছে এক তীরন্দাজ কাজ করত। তার নাম আন্দ্রেই।

একদিন আন্দ্রেই শিকার করতে গেছে। সারাদিন বনে ঘুরে ঘুরেও তার কপাল খুলল না, শিকার মিলল না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, আন্দ্রেই বাড়ী ফিরে চলল। হঠাৎ দেখে, গাছের মাথায় একটা ঘুঘু বসে।

আন্দ্রেই ভাবল, “ওটাকেই মারা যাক।”

আন্দ্রেই তীর মারল পাখির ডানায়। গাছের উপর থেকে সোঁদা মাটির উপর পড়ে গেল পাখিটা। আন্দ্রেই তুলে নিয়ে গলা মুচড়ে থলিতে পুরতে যাবে, হঠাৎ পাখিটা মানুষের গলায় কথা কয়ে উঠল।

'মেরো না, তীরন্দাজ আন্দ্রেই, গলা আমার কেটে ফেলো না। জীবন্ত বাড়ী নিয়ে গিয়ে জানলায় রেখে দিও। যেই ঝিমতে সুরু করব, অমনি তোমার ডান হাত দিয়ে চড় মেরো আমায়। দেখবে তোমার ভাগ্য কেমন খুলে যায়।'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না আন্দ্রেই: এ কী? দেখতে ঠিক পাখির মতো, আবার মানুষের মতো কথা বলে! আন্দ্রেই পাখিটা বাড়ী নিয়ে গিয়ে জানলার উপর রেখে দেখতে লাগল কী হয়।

কিছুক্ষণ পরে ঘুঘুটা ডানার তলায় মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুঘুটা কী বলেছিল মনে পড়ল আন্দ্রেই-এর। ডান হাত দিয়ে ঘুঘুটাকে সে চড় মারল। ঘুঘুটা মাটিতে পড়ে হয়ে গেল এক কন্যে, রাজকুমারী মারিয়া। কী তার রূপ, সে রূপ বলার নয়, কওয়ার নয়, রূপকথাতেই পরিচয়।

রাজকুমারী মারিয়া তীরন্দাজকে বলল:

'হরণ করলে যখন, করো ভরণ পোষণ। ভোজের জন্যে তাড়া নেই, বিয়ে করো। হাসিখুশি সতীলক্ষ্মী বৌ পাবে।'

সেই কথাই ঠিক হল। তীরন্দাজ আন্দ্রেই রাজকুমারী মারিয়াকে বিয়ে করে দুজনে মনের সুখে থাকতে লাগল। আন্দ্রেই কিন্তু তার কাজ ভোলে না। রোজ সকালে আলো ফুটতে না ফুটতেই বনে গিয়ে বনমোরগ শিকার করে রাজবাড়ীর রসুইঘরে দিয়ে আসে।

এইভাবে দিন কাটে। একদিন রাজকুমারী মারিয়া বলল:

'আমরা বড় গরীবের মতো দিন কাটাচ্ছি, আন্দ্রেই।'

'তা ঠিক বলেছো।'

'একশ' রুবল জোগাড় করে আমায় কিছু রেশম কিনে এনে দাও, তাহলে আমাদের অবস্থা ঠিক ফেরাতে পারব।'

রাজকুমারী মারিয়া যা বলল তাই করল আন্দ্রেই। বন্ধুদের কাছে গিয়ে কারও কাছে এক রুবল, কারও কাছে দুই রুবল, এইভাবে একশ' রুবল ধার করে রেশম কিনে বাড়ী ফিরল। রাজকুমারী মারিয়া বলল:

'এবার শুতে যাও। রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

আন্দ্রেই শুতে গেল। বুনতে বসল রাজকুমারী মারিয়া। সারারাত ধরে বুনে মারিয়া এমন একটা গালিচা তৈরী করল, যা পৃথিবীতে কেউ দেখেনি। গালিচার ওপরে গোটা রাজ্যের ছবি আঁকা, সহর-গ্রাম, মাঠ-বনের নক্সা তোলা, তার আকাশে পাখি, বনে পশু, সমুদ্রে মাছ, আর সবকিছুর উপর চাঁদের আলো, রবির কিরণ...

সকালবেলা মারিয়া স্বামীকে গালিচাটা দিয়ে বলল:

'সওদাগরদের হাটে গিয়ে বেচে এসো। কিন্তু দেখো নিজে মুখে দাম বলো না, যা দেবে তাই নিও।'

আন্দ্রেই গালিচা হাতে ঝুলিয়ে চলল সওদাগরদের হাটে।

আন্দ্রেইকে দেখেই তক্ষুণি এক সওদাগর দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল:

'কত দাম চাও, ভাই?'

'তুমি সওদাগর, তুমিই বলো!'

সওদাগর ভেবে ভেবে আর কিছুতেই দাম বলতে পারে না। তারপর এল আর একজন, আরো একজন, এক এক করে ভিড় জমে গেল সওদাগরের। সকলেই গালিচাটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর অবাক হয়, কিন্তু কেউ আর দাম বলতে পারে না।

সেই সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিল রাজার এক মন্ত্রী। কী ব্যাপার দেখবার জন্যে গাড়ী থেকে নেমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলল:

'নমস্কার সওদাগরেরা, সাগরপারের মানুষেরা! কী ব্যাপার?'

'না, গালিচাটার দাম ঠিক করতে পারছি না।'

রাজার মন্ত্রী তো গালিচাটার দিকে তাকিয়ে হতবাক।

জিজ্ঞেস করল, 'বলো তীরন্দাজ, সত্যি করে বলো তো, চমৎকার এই গালিচাটা তুমি কোথায় পেলে?'

'না, আমার বৌ বানিয়েছে।'

'কত দাম চাও তুমি?'

'আমি জানি না, বৌ বলে দিয়েছে দরাদরি কোরো না, যা দেবে তাই নেব।'

'তাহলে এই নাও দশ হাজার।'

আন্দ্রেই টাকা নিয়ে গালিচাটা দিয়ে বাড়ী ফিরে চলল। মন্ত্রী প্রাসাদে ফিরে গালিচা দেখাল রাজাকে।

নিজের সমস্ত রাজত্বটা চোখের সামনে মেলা দেখে রাজা তো হতভম্ব। আহামরি করে বলে:

'যাই বলো মন্ত্রী, তোমাকে আর এ গালিচা ফিরিয়ে দিচ্ছি নে।'

কুড়ি হাজার রুবল রাজা নগদ ধরে দিলে মন্ত্রীকে। মন্ত্রী টাকা পেয়ে ভাবল: "যাক গে। আমি আর একখানা ফরমাশ দেব, এর চেয়েও সুন্দর।"

গাড়ী চড়ে মন্ত্রী চলে গেল সহরতলীতে। সেখানে তীরন্দাজ আন্দ্রেই-এর বাড়ী খুঁজে বের করে দরজায় টোকা মারতে লাগল। দরজা খুলে দিল রাজকুমারী মারিয়া। মন্ত্রী এক পা দিল চৌকাঠের ওপারে, কিন্তু অন্য পা তার আর ওঠে না। কথা সরে না মুখে। কী জন্যে এসেছিল সব ভুলে গেল। সামনে তার এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা, রূপ দেখে তার আশ মেটে না।

মন্ত্রী কী বলে শোনার জন্যে রাজকুমারী মারিয়া দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু যখন দেখল মন্ত্রী একটি কথাও বলছে না, তখন মুখ ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। সম্বিত ফিরে এল মন্ত্রীর। বাড়ী ফিরে চলল। কিন্তু সেইদিন থেকে মন্ত্রীর খাওয়া দাওয়া গেল ঘুচে। সারাক্ষণ খালি সে তীরন্দাজের বৌয়ের কথা ভাবে।

রাজা বেশ বুঝলে মন্ত্রীর একটা কিছু হয়েছে, তাই একদিন জিজ্ঞেস করলে ব্যাপার কী।

'কী আর বলি রাজামশাই, তীরন্দাজের বৌকে দেখে আর কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমায় যেন যাদু করে ফেলেছে, কিছুতেই সে মায়া কাটাতে পারছি না।'

রাজা ভাবলে, "আমিও একবার তীরন্দাজের বৌকে দেখে আসি।" সাধারণ জামাকাপড় পরে রাজা গেল সহরতলীতে। আন্দ্রেই-এর বাড়ী খুঁজে বের করে দরজায় টোকা মারল। দরজা খুলে দিল রাজকুমারী মারিয়া। রাজা এক পা বাড়াল চৌকাঠের দিকে, কিন্তু অন্য পা আর তার ওঠে না। মুখে আর কথা সরে না। হাঁ করে রাজা এই অপূর্ব মুখের স্বর্গীয় রূপ দেখতে লাগল।

রাজা কী বলে তার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল রাজকুমারী মারিয়া। কিন্তু রাজা যখন একটি কথাও বললে না, তখন মুখ ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ভীষণ দুঃখ হল রাজার। ভাবলে, "আমিই বা কেন একা থাকি। এই তো আমার উপযুক্ত এক সুন্দরী কন্যা। এমন মেয়ের রাজরাণী হওয়াই সাজে, তীরন্দাজের বৌ নয়।"

প্রাসাদে ফিরে, রাজার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি এল — স্বামী বেঁচে থাকতেও বৌ চুরি করে আনবে। মন্ত্রীকে ডেকে বললে:

'একটা উপায় বের করো মন্ত্রী, কী করে ঐ তীরন্দাজ আন্দ্রেইকে তাড়ান যায়। আমি ওর বৌকে বিয়ে করতে চাই। তুমি যদি আমায় সাহায্য করো, তবে সহর, গ্রাম, সোনাদানা অনেক কিছু উপহার দেব। আর যদি না করো তবে তোমার গর্দান যাবে।'

মন্ত্রীর ভীষণ ভাবনা হল। মাথা হেঁট করে ফিরে গেল, কিছুতেই আর আন্দ্রেইকে তাড়ানর ফন্দি বের করতে পারে না। মনের দুঃখে মন্ত্রী গেল শুঁড়ীখানায় মদ খেতে।

শুঁড়ীখানার এক নেশাখোর, গায়ে তার ছেঁড়া কাপড় জামা, সে এসে মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে:

'মনভার কেন রাজমন্ত্রী, মাথা হেঁট কেন?'

'দূর হ, হতভাগা কোথাকার!'

'আমায় তাড়িয়ে না দিয়ে যদি একটু মদ খাওয়াও, তবে খুব ভাল বুদ্ধি দিতে পারি।'

মন্ত্রী লোকটিকে এক গেলাশ মদ খাইয়ে তার দুঃখের কথা খুলে বলল।

লোকটি বলল:

'কাজটা তেমন কঠিন নয়, তীরন্দাজ আন্দ্রেই তো ভারী সরল মানুষ, তবে ওর বৌ ভারী বুদ্ধিমতী, যাক গে, এমন একটা ফন্দি বের করতে হবে যাতে কিছুতেই ও পার না পায়। এক কাজ করো, বাড়ী গিয়ে রাজাকে বলো আন্দ্রেইকে হুকুম দিক পরলোকে গিয়ে ও দেখে আসুক রাজামশাইয়ের বাবা বুড়ো রাজা কেমন আছে। আন্দ্রেই একবার গেলে আর ফিরবে না।'

বদমাইসটাকে ধন্যবাদ দিয়ে মন্ত্রী ছুটে গেল রাজার কাছে।

'আন্দ্রেইকে সরিয়ে দেবার একটা উপায় বের করেছি।' বললে কোথায় পাঠাতে হবে তাকে, কী কাজে। রাজা ভীষণ খুশী হয়ে তক্ষুণি তীরন্দাজ আন্দ্রেইকে ডেকে পাঠাল।

'দেখো আন্দ্রেই, তুমি এতদিন ন্যায়ধর্ম্মে আমার কাজ করেছো। আজ আর একটি কাজ আমার করো। পরলোকে গিয়ে দেখে আসতে হবে আমার বাবা কেমন আছেন। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান...'

আন্দ্রেই বাড়ী ফিরে মন খারাপ করে চৌকিতে বসে রইল।

রাজকুমারী মারিয়া বলল:

'মন খারাপ কেন আন্দ্রেই, বিপদ হয়েছে কিছু?'

রাজা কী হুকুম করেছে আন্দ্রেই সব কথা খুলে বলল।

রাজকুমারী মারিয়া বলল:

'এ নিয়ে এত ভাবনা? এ আবার কাজ নাকি, এত নেহাত ছেলেখেলা, আসল কাজই বাকি। যাও, শোও গে, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

পরদিন সকালে আন্দ্রেই ঘুম থেকে উঠতেই রাজকুমারী মারিয়া এক থলি শুকনো রুটি আর একটা সোনার আংটি দিয়ে বলল:

'রাজামশাইকে গিয়ে বলো, মন্ত্রীকে তোমার সঙ্গে যেতে হবে, তুমি সত্যিই পরলোকে গিয়েছিলে কিনা মন্ত্রী তার সাক্ষী থাকবে। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে সোনার আংটিটা সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিও, আংটি তোমায় পথ দেখিয়ে দেবে।'

বৌকে বিদায় জানিয়ে শুকনো রুটি আর আংটি নিয়ে আন্দ্রেই রাজার কাছে গিয়ে বলল মন্ত্রীকে সঙ্গে দিতে হবে। রাজা আপত্তি করতে পারল না।

মন্ত্রী আর আন্দ্রেই দুজনে পথে বেরল। আংটিটা গড়িয়ে দিল আন্দ্রেই। খোলা মাঠ, পানা জলা, নদী, হ্রদ পেরিয়ে আন্দ্রেই চলল আংটির পিছু পিছু। আর আন্দ্রেই-এর পিছনে পিছনে কোনোক্রমে আসে রাজার মন্ত্রী।

হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেলে ওরা কিছু শুকনো রুটি খেয়ে নেয়, তারপর আবার হাঁটা দেয়।

অল্পদুর নাকি অনেকদুর, শেষ পর্যন্ত এসে পড়ল এক বিজিবিজি গহন বনের মধ্যে। সেখানে এক গভীর খাদের মধ্যে নেমে থেমে গেল আংটিটা।

আন্দ্রেই আর মন্ত্রী কিছু শুকনো রুটি খাবে বলে বসল। এমন সময় দেখে কি, বুড়ো থুত্থুড়ে রাজাকে দিয়ে কাঠ বইছে দুই শয়তান। সে কাঠের ভার কী! রাজার দু'দিকে দুই শয়তান বসে লাঠি মেরে মেরে তাকে চালাচ্ছে।

আন্দ্রেই বলল:

'দেখো দেখো, রাজার মরা বাবা না?'

মন্ত্রী বলল, 'তাই তো বটে। এযে দেখি সে-ই বোঝা বইছে।'

আন্দ্রেই চীৎকার করে শয়তানদুটোকে ডেকে বললে:

'ও মশাইরা! বুড়োটাকে একবার ছেড়ে দাও না, দুটো কথা আছে।'

শয়তানরা বলল:

'আমাদের অত সময় নেই। নিজেরাই আমরা কাঠগুলো বয়ে নিয়ে যাব নাকি?'

'আমি তোমাদের একটা তাজা লোক দিচ্ছি, সে কিছুক্ষণ বুড়োর জায়গায় কাজ করতে পারে।'

এই শুনে শয়তানগুলো বুড়োর ঘাড় থেকে জোয়ালটা খুলে মন্ত্রীর ঘাড়ে পরিয়ে দিল। তারপর লাঠি দিয়ে একজন ডাইনে মারে, একজন বাঁয়ে মারে, কুঁজো হয়ে বোঝা টানতে সুরু করল মন্ত্রী।

আন্দ্রেই তখন বুড়ো রাজাকে জিজ্ঞেস করল কেমন তার দিন চলছে।

রাজা বলল, 'কী আর বলব, তীরন্দাজ আন্দ্রেই? এ জগতে এসে বড় কষ্টে দিন যাচ্ছে। ছেলেকে গিয়ে আমার কথা জানিও আর বলো, লোকের সঙ্গে যেন খারাপ ব্যবহার না করে, নইলে এখানে এসে তারও দিন যাবে কষ্টে।'

কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই শয়তানগুলো খালি গাড়ী নিয়ে ফিরে এল। আন্দ্রেই বুড়ো রাজার কাছ থেকে বিদায় নিল, শয়তানদের কাছ থেকে মন্ত্রীকে খালাস করে বাড়ী ফিরে চলল দুজনে।

দেশে পৌঁছে ওরা তো প্রাসাদে গেল। রাজা আন্দ্রেইকে দেখেই ক্ষেপে আগুন।

বললে, 'ফিরে এলে যে বড় আচ্ছা আস্পর্ধা তোমার?'

'না, আপনার বাবার সঙ্গে পরলোকে দেখা করে এসেছি। বুড়ো রাজামশাইয়ের বড় কষ্টে দিন কাটছে। আপনাকে আশীর্বাদ জানিয়ে খুব করে বলেছেন, প্রজার উপর যেন অত্যাচার না করেন।'

'সত্যিই যে পরলোকে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করেছো তার প্রমাণ কী?'

'আপনার মন্ত্রীর পিঠে শয়তানদের লাঠির দাগগুলো দেখুন।'

মোক্ষম প্রমাণ! রাজা আর কী করে, ছেড়ে দিল আন্দ্রেইকে। আর মন্ত্রীকে ডেকে বললে:

'আন্দ্রেইকে সরিয়ে দেবার উপায় বের করো বাপু, নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান।'

মন্ত্রীর এবার আরো দুশ্চিন্তা। শুঁড়ীখানায় গিয়ে মন্ত্রী মদ নিয়ে বসল টেবিলে। অমনি সেই বদমাইসটা এসে হাজির। বলল:

'কিসের এত ভাবনা তোমার, রাজমন্ত্রী? আমায় যদি একটু মদ খাওয়াও তবে আমি ভাল বুদ্ধি বাতলে দিতে পারি।'

মন্ত্রী তখন তাকে এক গেলাশ মদ দিয়ে সব কথা খুলে বলল। নেশাখোরটা বলল:

'রাজাকে গিয়ে বলো আন্দ্রেইকে এক কাজ দিতে — এ বাবা জবর কাজ, দিশা পাওয়াই কঠিন, করা তো দূরের কথা। বলবে তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে, তিন দশের রাজ্যে এক ঘুমপাড়ানী বেড়াল আছে, আন্দ্রেইকে সেটা এনে দিতে হবে...'

রাজমন্ত্রী ছুটে গিয়ে আন্দ্রেইকে সরিয়ে দেবার উপায় বলল রাজাকে। রাজা আন্দ্রেইকে ডেকে পাঠাল।

'শোনো আন্দ্রেই, তুমি আমার একটা কাজ করে দিয়েছো, আর একটা কাজও করে দাও। তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে, তিন দশের রাজ্যে গিয়ে ঘুমপাড়ানী বেড়াল নিয়ে এসো আমার জন্যে। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান।'

মাথা নীচু করে বাড়ী ফিরল আন্দ্রেই। বৌকে বলল রাজা কী কাজ দিয়েছে।

রাজকুমারী মারিয়া বলল, 'এ নিয়ে এত ভাবনা? এ তো কাজ নয়, ছেলেখেলা, আসল কাজই বাকি। যাও, শোও গে, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

আন্দ্রেই ঘুমতে গেল। রাজকুমারী মারিয়া তখন কামারের বাড়ী গিয়ে বলল তিনটে লোহার টুপি, একটা লোহার চিমটে আর তিনটে দণ্ড বানিয়ে দিতে — একটা লোহার, একটা তামার আর তৃতীয়টা টিনের।

পরদিন ভোরে রাজকুমারী মারিয়া আন্দ্রেইকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বলল:

'এই নাও তিনটে টুপি, একটা চিমটে, আর তিনটে দণ্ড — এবার তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে, তিন দশের রাজ্যে যাও। ওখানে পৌঁছবার তিন ভার্স্ট আগে তোমার ভীষণ ঘুম পাবে — ঘুমপাড়ানী বেড়াল তোমায় ঘুম পাড়াবে। কিন্তু খবরদার, ঘুমিয়ে পড়ো না। হাত দিয়ে আড়মোড়া ভাঙবে, পা দিয়ে আড়মোড়া ভাঙবে, মাটিতে গড়াগড়িও দেবে। ঘুমিয়ে পড়লেই কিন্তু বেড়াল মেরে ফেলবে তোমায়।'

কী কী করতে হবে সব বুঝিয়ে বলে আন্দ্রেইকে বিদায় দিয়ে পাঠাল রাজকুমারী মারিয়া।

বলতে এতটুকু কিন্তু করতে এতখানি। তিন দশের রাজ্যে এসে পৌঁছল আন্দ্রেই। ঠিক তিন ভার্স্ট আগে ভীষণ ঘুম পেতে লাগল তার। তখন তিনটে লোহার টুপি মাথায় পরে, হাত দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে, পা দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে এগোয় আন্দ্রেই, দরকার মতো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নেয়।

কোনরকমে নিজেকে জাগিয়ে রাখল আন্দ্রেই, এসে পৌঁছল একটা লম্বা থামের কাছে।

ঘুমপাড়ানী বেড়াল আন্দ্রেইকে দেখেই গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করে গর্জে উঠে থামের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল আন্দ্রেই-এর মাথার উপর। প্রথম টুপিটা ভেঙে, দ্বিতীয়টা ভেঙে, তৃতীয়টা ভাঙতে যাবে, অমনি আন্দ্রেই বেড়ালটাকে চিমটে দিয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দণ্ড দিয়ে আচ্ছা করে পেটাতে লাগল। প্রথমে

মারল লোহার দণ্ড দিয়ে, সেটা ভেঙে যেতে মারল তামার দণ্ড দিয়ে, সেটাও যখন ভেঙে গেল তখন টিনেরটা তুলে নিয়ে পেটাতে লাগল।

টিনের দণ্ডটা বেঁকে যায়, কিন্তু ভাঙে না। কেবল বেঁকে গিয়ে বেড়ালটার গায়ে জড়িয়ে যায়। আন্দ্রেই যত মারে বেড়ালটা তত গল্প শোনায় তাকে — পুরুতদের গল্প, যাজকদের গল্প, পুরুত বাড়ীর মেয়ের গল্প। আন্দ্রেই কিন্তু কোনো কথা না শুনে যত জোর পারে কেবল মেরেই চলে।

বেড়াল আর পারে না। দেখে তুকতাকে চলবে না, তাই অনুনয়-বিনয় সুরু করল:

'ছেড়ে দাও সুজন, যা বলবে তাই করব।'

'আমার সঙ্গে যাবি?'

'যেখানে বলবে যাব।'

আন্দ্রেই বেড়ালটা নিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে সুরু করল। দেশে ফিরে বেড়ালটাকে নিয়ে গেল রাজার কাছে। বলল:

'তা, হুকুম তামিল করেছি, ঘুমপাড়ানী বেড়াল নিয়ে এসেছি।'

রাজা তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে চায় না। বললে:

'তা ঘুমপাড়ানী বেড়াল, দেখাও দেখি তোমার তেজ!'

বেড়াল অমনি থাবায় শান দেয়, রাজাকে আঁচড়ায়, এই বুঝি রাজার বুক চিরে জ্যান্ত হৃৎপিণ্ডটাই বের করে আনে।

ভয় পেয়ে গেল রাজা:

'থামাও ওকে বাপু তীরন্দাজ আন্দ্রেই।'

আন্দ্রেই বেড়ালটাকে শান্ত করে খাঁচায় পুরল, নিজে ফিরে গেল রাজকুমারী মারিয়ার কাছে। দুটিতে মনের আনন্দেই থাকে। রাজার কিন্তু বুকের মধ্যে আরো বেশী জ্বালাপোড়া। একদিন মন্ত্রীকে ডেকে বললে:

'যে ক'রে পারো, উপায় করো, তীরন্দাজ আন্দ্রেইকে সরাও। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান।'

রাজমন্ত্রী সোজা গেল শুঁড়ীখানায়। ছেঁড়া জামা পরা সেই বদমাইসটাকে

খুঁজে বার করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে সাহায্য চাইল। বদমাইসটা তার মদের গেলাশ উজাড় করে গোঁফ মুছে বললে:

'রাজামশাইকে গিয়ে বলো, আন্দ্রেই অ-জানি দেশ থেকে না-জানি কী নিয়ে আসুক। একাজ আন্দ্রেই সারা জীবনেও করতে পারবে না, ফিরেও আর আসবে না।'

ছুটে গিয়ে রাজাকে সব বলল মন্ত্রী। রাজা আন্দ্রেইকে ডেকে পাঠালে। বললে:

'তুমি আমায় দুটো কাজ করে দিয়েছো, এবার তৃতীয় কাজটাও করো। অ-জানি দেশ থেকে না-জানি কী-কে নিয়ে এসো। যদি পারো, রাজার মতো খেলাৎ করব। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান।'

আন্দ্রেই বাড়ী ফিরে চৌকিতে বসে কাঁদতে লাগল।

রাজকুমারী মারিয়া বলল:

'কী গো, এমন মনভার কেন গো? আবার কোনো বিপদ নাকি?'

আন্দ্রেই বলল, 'কী আর বলি, তোমার রূপই আমার কাল হল। রাজা হুকুম করেছেন অ-জানি দেশ থেকে না-জানি কী আনতে হবে।'

'হ্যাঁ, এটা একটা কাজের মতো কাজ! কিন্তু কিছু ভেবো না। শোও গে যাও, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

রাত হতেই রাজকুমারী মারিয়া খুলে বসল তার যাদুর বই। পড়ে পড়ে তারপর বই ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসল: রাজামশাইয়ের কাজটার কথা বইয়ে কিছুই লেখা নেই। তখন রাজকুমারী মারিয়া অলিন্দে গিয়ে রুমাল বের করে নাড়তে লাগল। অমনি উড়ে এল যত পাখি, ছুটে এল যত পশু।

রাজকুমারী মারিয়া বলল:

'বনের পশু, আকাশের পাখি, বলো তো! পশু—তোমরা সব জায়গায় চরে বেড়াও, পাখি—তোমরা সব জায়গায় উড়ে বেড়াও। শোনোনি কখনো কী করে অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী আনা যায়?'

পশুপাখির দল বলল:

'না, রাজকুমারী, সে কথা আমরা শুনিনি।'

আবার রুমাল নাড়ল রাজকুমারী মারিয়া। পশুপাখির দল নিমেষের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। রাজকুমারী তৃতীয় বার রুমাল নাড়তেই এসে দাঁড়াল দুই দৈত্য।

‘কী আজ্ঞা, কী হুকুম?’

‘বিশ্বাসী দাসেরা আমার, নিয়ে চলো আমায় মহাসমুদ্রের মাঝখানে।’

দৈত্যদুটো রাজকুমারী মারিয়াকে ধরে মহাসমুদ্রের ঠিক মাঝখানে নিয়ে গিয়ে গভীর জলে দাঁড়িয়ে পড়ল উঁচু স্তম্ভের মতো। রাজকুমারীকে দুই হাতে তুলে ধরে রাখল জলের ওপর। রাজকুমারী মারিয়া একবার রুমাল নাড়তেই সমুদ্রের যত মাছ, যত প্রাণী সব এসে হাজির।

‘সমুন্দুরের মাছ, সমুন্দুরের প্রাণী, তোমরা তো সবখানে সাঁতরে বেড়াও, সব দ্বীপে যাও, শোনোনি কখনো কী করে অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী আনা যায়?’

‘না, রাজকুমারী, সে কথা আমরা শুনিনি।’

মুষড়ে পড়ল রাজকুমারী মারিয়া। দৈত্যদুটোকে বলল বাড়ী নিয়ে যেতে। দৈত্যদুটো তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিল বাড়ীর অলিন্দে।

পরদিন সকালে আন্দ্রেইকে বিদায় দেবার জন্যে রাজকুমারী মারিয়া তাড়াতাড়ি ঘুম ছেড়ে উঠল। তারপর আন্দ্রেইকে এক সুতোর গোলা আর একটা নক্সা কাটা গামছা দিয়ে বলল:

‘সামনে এই সুতোর গোলা গড়িয়ে দেবে। ওটা যে দিকে গড়াবে সে দিকে যেও। আর যেখানেই থাকো হাত মুখ ধোবার সময় পরের গামছায় মুছো না, আমার গামছায় মুছো।’

আন্দ্রেই রাজকুমারী মারিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চারদিককে নমস্কার করে সহরের ফটক পার হল। তারপর সুতোর গোলা গড়িয়ে দিল সামনে। সুতোর গোলা গড়ায়, আন্দ্রেইও পিছন পিছন যায়।

বলতে এতটুকু কিন্তু করতে এতখানি। চলতে চলতে আন্দ্রেই কত রাজ্য, কত আজব দেশ পেরিয়ে গেল। সুতোর গোলা গড়াতে গড়াতে ছোট হতে হতে ক্রমে একেবারে মুরগীর ডিমের মতো হয়ে গেল। তারপর এত ছোট হয়ে গেল

যে আর চোখেই পড়ে না… আন্দ্রেই তখন একটা বনের কাছে এসে দেখে মুরগীর পায়ের উপর একটা ছোট কুঁড়েঘর।

আন্দ্রেই বলল, 'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও তো!'

কুঁড়েঘরটা ঘুরে গেল। আন্দ্রেই ঘরে ঢুকে দেখে, এক পাকাচুলো বুড়ী ডাইনী বেঞ্চিতে বসে বসে টাকু ঘোরাচ্ছে।

'হাউমাউখাউ, রুশীর গন্ধ পাউ। কখনো চোখে দেখিনি যারে, সে দেখি এল আমার দ্বারে। জ্যান্ত তোকে ভেজে খাব, হাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়াব।'

আন্দ্রেই বলল:

'হয়েছে, হয়েছে বুড়ী বাবা-ইয়াগা। হঠাৎ ভবঘুরেকে খাওয়ার সখ কেন? ভবঘুরের তো কেবল হাড্ডি চামড়াই সার। আগে চানের জল গরম করো, ধোয়াও, চান করাও, তারপর খেও।'

বাবা-ইয়াগা তো চানের আগুন জেৱলে জল গরম করল। আর আন্দ্রেই গা ধুয়ে বেরিয়ে এল বৌয়ের দেওয়া গামছায় গা মুছতে মুছতে।

বাবা-ইয়াগা জিজ্ঞেস করল:

'এ গামছা তুমি পেলে কী করে? এ যে দেখি আমার মেয়ের হাতের নক্সা তোলা।'

'তোমার মেয়েই যে আমার বৌ। সেই আমাকে গামছাটা দিয়েছে।'

'ও তাই নাকি বাছা! এসো এসো, তুমি যে আমার কত আদরের জামাই!'

বাবা-ইয়াগা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে কত রকম খাবার, কত রকম পানীয়, কত রকমের সব ভাল ভাল জিনিস টেবিলের উপর সাজিয়ে দিল। আন্দ্রেই কোন ভণিতা না করে বসেই খাবার কাজে লেগে গেল। বাবা-ইয়াগা পাশে বসে বসে নানা প্রশ্ন করতে লাগল কী করে আন্দ্রেই রাজকুমারী মারিয়াকে বিয়ে করল, তারা বেশ সুখেস্বচ্ছন্দে আছে কিনা। আন্দ্রেই সব কথা তাকে জানাল। তারপর রাজা যে তাকে অ-জানি দেশের না-জানি কী আনতে পাঠিয়েছে সে কথাও বলল।

আন্দ্রেই বলল, 'তুমি যদি আমায় একটু সাহায্য করতে বুড়ী।'

'কী আর বলব বাছা, হায় হায়, এমন তাজ্জবের তাজ্জব, আমিও কখনো শুনিনি। ও কথা জানে কেবল এক বুড়ী ব্যাঙ। সে আজ তিনশ' বছর হল জলায় বাস করছে... যাক গে, কিছু ভেবো না, শুতে যাও। রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।'

আন্দ্রেই শুয়ে পড়ল আর বাবা-ইয়াগা দুটো বার্চ গাছের ঝাঁটা নিয়ে উড়ে চলে গেল সেই জলার কাছে। সেখানে গিয়ে ডেকে বলল:

'ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ বুড়ী ব্যাঙ, বেঁচে আছো?'

'আছি।'

'বেরিয়ে এসো জলা থেকে।'

জলার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বুড়ী ব্যাঙ। বাবা-ইয়াগা বলল:

'না-জানি কী কোথায় জানো কি?'

'জানি।'

'তাহলে দয়া করে বলে দাও কোথায়। আমার জামাইকে রাজা অ-জানি দেশ থেকে না-জানি কী আনতে পাঠিয়েছেন।'

বুড়ী ব্যাঙ বলল:

'আমি নিজেই তাকে নিয়ে যেতুম, কিন্তু বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছি। অতটা লাফের সাধ্যি নেই। তোমার জামাইকে বলো আমায় এক ভাঁড় টাটকা দুধের মধ্যে করে নিয়ে যাক জ্বলন্ত নদীতে। তখন বলব।'

বাবা-ইয়াগা ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ বুড়ী ব্যাঙকে নিয়ে উড়ে এল বাড়ী। এক ভাঁড় টাটকা দুধ দুইয়ে বুড়ী ব্যাঙকে তার মধ্যে রাখল। পরদিন খুব ভোরে আন্দ্রেইকে তুলে দিয়ে বলল:

'তা জামাই, তৈরি হয়ে নাও, টাটকা দুধের ভাঁড়টা ধরো, এতে বুড়ী ব্যাঙ আছে। আমার ঘোড়ায় চড়ে চলে যাও জ্বলন্ত নদীতে। সেখানে ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে বুড়ী ব্যাঙকে ভাঁড় থেকে বের করো। বুড়ী ব্যাঙ তোমায় সব বলে দেবে।'

আন্দ্রেই তৈরী হয়ে ভাঁড়টা হাতে নিল, তারপর বাবা-ইয়াগার ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিল। অনেক দিন, নাকি অল্প দিন, শেষ পর্যন্ত জ্বলন্ত নদীর কাছে

পৌঁছল আন্দ্রেই। সে নদী লাফিয়ে পেরবে এমন জন্তু নেই, উড়ে যাবে এমন পাখি নেই।

আন্দ্রেই ঘোড়া থেকে নামতে বুড়ী ব্যাঙ বলল:

'এবার বাছা, আমায় ভাঁড় থেকে বের করে নাও। নদী পেরতে হবে।'

আন্দ্রেই বুড়ী ব্যাঙকে ভাঁড় থেকে বের করে মাটিতে রাখল।

'এবার সুজন, আমার পিঠে চড়ে বসো।'

'সেকি দিদিমা, তুমি যে এতটুকু, আমার চাপে পিষে যাবে।'

'ভয় নেই, কিছু হবে না, ভাল করে ধরে থাকো।'

বুড়ী ব্যাঙের পিঠে চেপে বসল আন্দ্রেই। ব্যাঙ অমনি নিজেকে ফোলাতে সুরু করল। ফুলতে ফুলতে একটা বিচালির আঁটির মতো বড় হয়ে উঠল ব্যাঙ।

'চেপে ধরেছো তো শক্ত করে?'

'হ্যাঁ দিদিমা, ধরেছি।'

আবার ব্যাঙ ফুলতে সুরু করল। ফুলতে ফুলতে বড় হয়ে গেল একটা বিচালির গাদার মতো।

'চেপে ধরেছো তো শক্ত করে?'

'হ্যাঁ দিদিমা, ধরেছি।'

আবার ফুলতে সুরু করল ব্যাঙ। ফুলতে ফুলতে এবার সে ঘন বনের চেয়েও উঁচু হয়ে গেল। তারপর এক লাফে একেবারে জ্বলন্ত নদীর ওপারে। ওপারে গিয়ে আন্দ্রেইকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে সে আবার আগের মতো ছোটটি হয়ে গেল।

'চলে যাও সুজন, এই পায়ে হাঁটা পথ ধরে, দেখবে এক কোঠা বাড়ী—অথচ কোঠা নয়, কুঁড়েঘর—অথচ কুঁড়ে নয়, চালা—অথচ চালা নয়। গিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে চুল্লীর পিছনে দাঁড়িয়ে থেকো। সেখানেই পাবে না-জানি কী।'

পথ ধরে চলল আন্দ্রেই, দেখে, এক পুরনো কুঁড়েঘর, কিন্তু কুঁড়ে নয়। জানালা নেই, অলিন্দ নেই, বেড়া দিয়ে ঘেরা। আন্দ্রেই ভিতরে ঢুকে চুল্লীর পিছনে লুকিয়ে রইল।

একটু পরেই বনের মধ্যে হুড়মুড়, ঘড়ঘড় শব্দ। ঘরে এসে ঢুকল এক বুড়ো আঙ্গুলে দাদা, তার দাড়ি শাদা শাদা। ঢুকেই সে চীৎকার করে উঠল:

'ওহে নাউম বেয়াই, খেতে দাও!'

মুখ থেকে কথা খসতে না খসতেই শূন্যি থেকে একটা টেবিল এসে হাজির। টেবিলের ওপর এক পিপে বিয়র আর একটা রোস্ট করা ধারালো ছুরি বেঁধান আস্ত ষাঁড়। দাড়ি-শাদা-শাদা বুড়ো আঙ্গুলে দাদা, ষাঁড়টার সামনে বসে ধারালো ছুরিটা বের করে মাংস কাটে, রসুন ঘষে, খায় দায়, তারিফ করে।

ষাঁড়টার আপাদমস্তক শেষ করল সে, বিয়রের পিপে খালি করে দিল। বলল:

'ওহে নাউম বেয়াই, এঁটো পরিষ্কার করে নাও!'

অমনি সঙ্গে সঙ্গে হাড়গোড়, বিয়র পিপেশুদ্ধ কোথায় মিলিয়ে গেল টেবিলটা... বুড়ো আঙ্গুলে দাদা কতক্ষণে বেরিয়ে যায় আন্দ্রেই সেই অপেক্ষায় রইল। তারপর বেরিয়ে যেতেই চুল্লীর পিছন ছেড়ে এসে আন্দ্রেই ভরসা করে ডেকেই ফেলল:

'নাউম বেয়াই, আমায় কিছু খেতে দাও...'

কথাটা মুখ থেকে বেরতে না বেরতেই কোত্থেকে যেন একটা টেবিল এসে গেল। আর তার উপর কত রকম খাবার দাবার, মধু মদ।

আন্দ্রেই টেবিলে বসে বলল:

'নাউম বেয়াই, তুমিও বসো, একসঙ্গে খাওয়া যাক।'

কাউকে দেখা গেল না, কিন্তু উত্তর এল:

'ধন্যবাদ তোমায় সুজন! কত বছর ধরে এখানে কাজ করছি, কিন্তু কেউ কোনদিন আমায় একটুকরো পোড়া রুটিও খেতে দেয়নি। আর তুমি আমাকে টেবিলে বসে খেতে ডাকলে!'

আন্দ্রেই তো হতবাক। কাউকে দেখা যাচ্ছে না অথচ খাবারগুলো যেন ঝেঁটিয়ে সাফ হচ্ছে। আপনা থেকেই মদ আর মধুতে গেলাশ ভরে উঠছে। আপনা থেকেই খুটখুট করছে গেলাশ।

আন্দ্রেই বলল:

'নাউম বেয়াই, একবার দেখা দাও না!'

'না, আমাকে তো দেখা যায় না। আমি হলাম না-জানি কী।'

'নাউম বেয়াই, তুমি আমার কাছে কাজ করবে?'

'করব না কেন। দেখছি, লোকটা তুমি ভালো।'

খাওয়া শেষ হলে আন্দ্রেই বলল:

'টেবিলটা পরিষ্কার করে চলো আমার সঙ্গে।'

কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আন্দ্রেই আশেপাশে তাকাল।

'নাউম বেয়াই, আছো তো এখানে?'

'হ্যাঁ আছি, ভয় নেই। তোমায় আমি ছেড়ে যাব না।'

হাঁটতে হাঁটতে আন্দ্রেই এসে পোঁছল জ্বলন্ত নদীর পাড়ে। সেখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করে ছিল ব্যাঙ।

'কী সুজন, না-জানি কী পেলে?'

'পেয়েছি, দিদিমা।'

'তাহলে এবার আমার পিঠে চড়ে বসো।'

আন্দ্রেই পিঠে চড়ে বসল আর ব্যাঙ নিজেকে ফোলাতে সুরু করল আবার। তারপর এক লাফে আন্দ্রেইকে জ্বলন্ত নদী পার করে দিল।

আন্দ্রেই ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ বুড়ী ব্যাঙকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজের দেশের পথ ধরল। আন্দ্রেই একটু যায় আর মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে:

'কি নাউম বেয়াই, আছো তো?'

'আছি আছি, কোনো ভয় নেই তোমার। ছেড়ে যাব না।'

আন্দ্রেই হাঁটে আর হাঁটে। দূরের পথ। এলিয়ে পড়ে তার সবল পা, নেতিয়ে পড়ে তার ধবল হাত।

বলে, 'ওহ, কী ক্লান্তই না হয়ে পড়েছি!'

নাউম বেয়াই বলল:

'আগে বললে না কেন? আমি তোমায় পলকের মধ্যে বাড়ী পোঁছে দিতুম।'

হঠাৎ একটা ঝড় এসে আন্দ্রেইকে পাহাড়, পর্বত, বন, সহর, গ্রাম পেরিয়ে

উড়িয়ে নিয়ে চলল। এক গভীর সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় আন্দ্রেই ভয় পেয়ে বলল:

'নাউম বেয়াই, একটু বিশ্রাম করতে পারলে হত!'

অমনি থেমে গেল হাওয়া। আন্দ্রেই নামতে লাগল। দেখে কি, যেখানে নীল ঢেউ গজরাচ্ছিল, সেখানে একটা দ্বীপ হয়ে গেছে। সে দ্বীপে এক সোনার ছাদওয়ালা প্রাসাদ আর তার চারদিক ঘিরে অপরূপ বাগান... নাউম বেয়াই আন্দ্রেইকে বলল:

'বিশ্রাম করো গে, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাও আর সমুদ্রের দিকে নজর রেখো। তিনটে সওদাগরী জাহাজ আসবে। তাদের নেমন্তন্নে ডেকো, ভালো করে আপ্যায়ন করো। ওদের কাছে তিনটে আজব জিনিস আছে, চেয়ে নিও। তার বদলে আমায় দিয়ে দিও। ভয় নেই, আমি আবার ফিরে আসব।'

অনেকদিন নাকি অল্প দিন, দেখে কি, তিনটে জাহাজ পশ্চিম থেকে এগিয়ে আসছে। নাবিকরা দেখে একটা দ্বীপ, তার মধ্যে অপরূপ বাগানে ঘেরা সোনার ছাদওয়ালা এক প্রাসাদ।

ওরা বলাবলি করল, 'কী আশ্চর্য! কতবার এই পথে গেছি, নীল ঢেউ ছাড়া কিছুই চোখে পড়েনি তো। চলো জাহাজ তীরে লাগাই!'

জাহাজ তিনটে নোঙ্গর ফেলল। আর তিনজন সওদাগর ডিঙি করে এগিয়ে এল পাড়ের দিকে। তীরন্দাজ আন্দ্রেই আগেই সেখানে অভ্যর্থনার জন্যে হাজির।

'আসুন, আসুন অতিথি সজ্জন।'

সওদাগররা যত দেখে তত অবাক হয়। আগুনের মতো জ্বলছে পুরীর ছাদ। গাছে গাছে পাখির গান, পথে পথে অপরূপ সব প্রাণী।

'বলো তো সুজন, কে এখানে এমন আশ্চর্য প্রাসাদ বানালে?'

'আমার চাকর নাউম বেয়াই এসবই বানিয়েছে এক রাতের মধ্যে।'

আন্দ্রেই অতিথিদের নিয়ে গেল পুরীর ভেতরে। বলল:

'ওহে নাউম বেয়াই, আমাদের কিছু খেতে দাও তো!'

হঠাৎ শূন্য থেকে একটা টেবিল এসে দাঁড়াল। আর তার উপর নানা রকম চর্ব্য-চোষ্য-পানীয়। যা মন চায় সব। সওদাগররা একেবারে অবাক। বলল:

'এসো আমরা বদলাবদলি করি। তোমার চাকরটিকে আমাদের দাও, তার বদলে আমাদের যে কোনো একটা আজব জিনিস তুমি চাও দেব।'

'বেশ, তা কী কী আজব জিনিস তোমাদের আছে?'

এক সওদাগর জামার নীচ থেকে একটা মুগুর বের করল। কেবল বলতে হবে: "দে তো মুগুর হাড় গুঁড়িয়ে!" ব্যস, অমনি মুগুর লেগে যাবে কাজে। যত বড়ো পালোয়ানই হোক না কেন, তার হাড় গুঁড়িয়ে ছাড়বে।

আর এক সওদাগর পোষাকের নীচ থেকে বের করল একটা কুড়ুল। সোজা করে কুড়ুলটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা মাত্রই খটাখট খটাখট ঘা পড়তে লাগল আর তৈরি হয়ে গেল একটা জাহাজ। খটাখট খটাখট—হয়ে গেল আর একটা জাহাজ। একেবারে পাল তোলা, কামান লাগানো, মাঝিমাল্লায় ভরা। জাহাজগুলো চলতে সুরু করল, কামানে তোপ পড়ল, মাঝিমাল্লারা হুকুম চাইল।

সওদাগর কুড়ুলটা উল্টে রাখা মাত্র জাহাজ-টাহাজ সব মিলিয়ে গেল। যেন কিছুই ছিল না।

এবার তৃতীয় সওদাগর পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে বাজাতে আরম্ভ করল, অমনি এক দল সৈন্য এসে হাজির: তাদের কেউ সওয়ারী, কেউ পদাতিক কারো হাতে বন্দুক, কারো কাছে কামান। কুচকাওয়াজ সুরু হয়ে গেল, তুরীভেরী বেজে উঠল, আকাশে উড়ল পতাকা, ঘোড়সওয়াররা হুকুম চাইল!

সওদাগর তারপর বাঁশির অন্য মুখে ফুঁ দিতেই, ব্যস—ভোঁ ভোঁ, মিলিয়ে গেল সব।

তীরন্দাজ আন্দ্রেই বলল:

'তোমাদের আজব জিনিসগুলো ভালোই, তবে আমারটার দাম আরও বেশী। আমার চাকর, নাউম বেয়াইকে বদলি করতে পারি যদি তোমরা ঐ তিনটে জিনিসই আমায় দিয়ে দাও।'

'একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ভাই?'

'নয়ত বদলি করব না, বুঝে দেখো।'

সওদাগরেরা ভেবে দেখল: "মুগুর, কুড়ুল, বাঁশি দিয়ে আমাদের কীই বা হবে? তার বদলে নাউম বেয়াই পেলেই ভাল। রাতে দিনে খাওয়া দাওয়ার কোনো ভাবনাই থাকবে না।"

সওদাগরেরা আন্দ্রেইকে মুগুর, কুড়ুল, বাঁশি দিয়ে দিল। তারপর চীৎকার করে বলল:

'ওহে নাউম বেয়াই, আমরা তোমায় নিয়ে যাব। ধম্মমতে কাজ করবে তো?'

আওয়াজ শোনা গেল:

'করব না কেন? যার কাছেই কাজ করি আমার কাছে সবাই সমান।'

সওদাগররা তখন জাহাজে ফিরে গিয়ে ফুর্তি জমাল। খায়, দায়, আর কেবলি হুকুম দেয়:

'নাউম বেয়াই, এই আনো, সেই আনো!'

খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত তারা বেদম মাতাল হয়ে যেখানে ছিল সেখানেই ঢুলে পড়ল।

ওদিকে তীরন্দাজ আন্দ্রেই প্রাসাদে একা বসে বসে মন খারাপ করে আর ভাবে: "হায় হায়, কোথায় গেল আমার সেই অনুগত চাকর নাউম বেয়াই?"

'এই যে আমি, কী চাই?'

আন্দ্রেই তো মহা খুশী।

'বাড়ী ফেরার সময় হয়েছে, ঘরে আমার কচি বৌ! নাউম বেয়াই, এবার বাড়ী নিয়ে চলো।'

আবার একটা জোর ঝড় উঠল আর আন্দ্রেইকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলল একেবারে তার নিজের দেশে।

এদিকে তো ঘুম থেকে জেগে উঠে সওদাগরদের গা ম্যাজম্যাজ করে, তেষ্টায় ছাতি ফাটে।

'ওহে নাউম বেয়াই, দেখি, কিছু খাবার দাবার এনে দাও তো, একটু চাঙ্গা করে দাও।'

কত হাঁক, কত ডাক, কিছুতেই কিছু হয় না। তাকিয়ে দেখে, দ্বীপ কোথায় মিলিয়ে গেছে। চারদিকে কেবল ফুঁসে উঠছে নীল ঢেউ।

সওদাগররা ভীষণ চটে গেল। "আচ্ছা বদ লোক তো, আমাদের এমন করে ঠকাল!" কিন্তু তখন আর উপায় নেই, পাল খাটিয়ে যেদিকে যাবার সেদিকে গেল।

তীরন্দাজ আন্দ্রেই এদিকে দেশে গিয়ে তার কুঁড়েঘরটার পাশে নামল। কিন্তু দেখে কী, কোথায় তার কুঁড়েঘর, একটা পোড়া কালো চিমনি ছাড়া আর কিছুই সেখানে নেই।

দুঃখে মাথা নীচু করে সে সহর ছেড়ে চলে গেল নীল সমুদ্রের ধারে এক বিজন জায়গায়। সেখানে বসে আছে তো আছেই। হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এল একটা ঘুঘু। মাটি ছুঁতেই ঘুঘু পাখিটা হয়ে গেল আন্দ্রেই-এর বৌ রাজকুমারী মারিয়া।

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে তখন কত কথা, কত কুশল, সবকিছু শুধোয়, সবকিছু বলে।

রাজকুমারী মারিয়া বলল:

'যে দিন থেকে তুমি বাড়ী ছেড়ে গেছো, সেদিন থেকে আমি বনে বনে ঝোপে ঝাড়ে ঘুঘু হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। তিন তিন বার রাজা আমার খোঁজে লোক পাঠিয়েছে। আমায় খুঁজে না পেয়ে বাড়ীটাই পুড়িয়ে দিয়েছে।'

আন্দ্রেই বলল:

'নাউম বেয়াই, নীল সমুদ্রের পাড়ে একটা প্রাসাদ তৈরী করে দিতে পারো?'

'কেন পারব না? নিমেষের মধ্যেই করে দিচ্ছি।'

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই প্রাসাদ একেবারে তৈরী। আর সে কী জমকালো প্রাসাদ, রাজপ্রাসাদের চেয়েও ঢের ভাল। চারদিকে সবুজ বাগান। গাছে গাছে পাখির গান, পথে পথে কত অপরূপ প্রাণী।

তীরন্দাজ আন্দ্রেই আর রাজকুমারী মারিয়া ঢুকল প্রাসাদে। জানলার পাশে

বসে তারা দুই দোঁহা গল্প করে, দেখে দেখে আর আশ মেটে না। এই ভাবে মহা আনন্দে দিন কাটে, একদিন যায়, দুদিন যায়, তিন দিন যায়।

রাজা ওদিকে শিকার করতে গিয়ে দেখে, নীল সমুদ্রের ধারে আগে যেখানে কিচ্ছু ছিল না, সেখানে একটা মস্ত প্রাসাদ।

‘আমার অনুমতি না নিয়ে কোন হতভাগা আমারই জমিতে বাড়ী তুলেছে?’

তক্ষুণি দূত ছুটল। খোঁজখবর নিয়ে জানাল সেই যে তীরন্দাজ আন্দ্রেই, সে এই প্রাসাদ বানিয়ে তার বৌ রাজকুমারী মারিয়াকে নিয়ে বসবাস করছে।

রাজা গেল আরো ক্ষেপে। দূত পাঠাল খবর আনতে সত্যিই আন্দ্রেই অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী এনেছে কিনা।

আবার দূত ছুটল। ফিরে এসে খবর দিল:

‘হ্যাঁ মহারাজ, আন্দ্রেই সত্যিই অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী নিয়ে এসেছে।’

এই কথা শুনে তো রাজা একেবারে রেগে আগুন, তেলে বেগুন। তক্ষুণি সৈন্যসামন্ত ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিল সমুদ্র তীরে গিয়ে আন্দ্রেই-এর প্রাসাদ যেন ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়। তীরন্দাজ আন্দ্রেই আর রাজকুমারী মারিয়াকে যেন হত্যা করা হয় নিষ্ঠুরভাবে।

আন্দ্রেই দেখে, প্রবল এক সৈন্যবাহিনী তাকে আক্রমণ করতে আসছে। তক্ষুণি সে কুড়ুলটা টেনে নিয়ে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। কুড়ুল চলল খটাখট খটাখট — অমনি জাহাজ ভাসল সমুদ্রে। খটাখট খটাখট — অমনি আর একটা জাহাজ। একশ’ বার কুড়ুল চলল, একশ’ জাহাজ পাল তুলে দাঁড়াল সমুদ্রে।

আন্দ্রেই বাঁশিটা বের করে বাজাতেই হাজির হল সৈন্যদল। তাদের কেউ সওয়ারী, কেউ পদাতিক, কারো হাতে বন্দুক, কারো কাছে কামান, কারো কাছে নিশান।

সেনাপতিরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসে, হুকুমের জন্যে দাঁড়ায়। আন্দ্রেই হুকুম দিল যুদ্ধ সুরু করো। অমনি তুরীভেরী কাড়া-নাকাড়া রণবাদ্য বেজে উঠল। এগোতে সুরু করল সৈন্যদল। পদাতিকরা ছারখার করে রাজসৈন্য।

ঘোড়সওয়াররা ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দী করতে থাকে। একশ' জাহাজের কামান থেকে গোলা ছোটে।

রাজা দেখল, সৈন্যরা তার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে, নিজেই ছুটলে তাদের থামাতে। আন্দ্রেই তখন তার মুগুরটা বের করে বলল:

'দে মুগুর রাজার হাড় গুঁড়িয়ে!'

অমনি মুগুর তিড়িং লাফে মাঠ পেরিয়ে ধেয়ে গেল। রাজাকে ধরে ফেলে তার কপালে এমন এক ঘা কষিয়ে দিল যে রাজা সেখানেই লুটিয়ে পড়ল প্রাণ হারিয়ে।

অমনি যুদ্ধ থেমে গেল। সহরের সব লোকেরা সহর থেকে বেরিয়ে এসে তীরন্দাজ আন্দ্রেইকে তাদের রাজা হবার জন্যে মিনতি করতে লাগল।

আন্দ্রেইও আপত্তি করল না। বিরাট এক ভোজ দিয়ে রাজকুমারী মারিয়াকে নিয়ে সারা জীবন সুখেস্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে লাগল সে।

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান

অনেককাল আগে ছিল এক বুড়ো আর বুড়ী। বুড়ো রোজ পশুপাখি মেরে আনত। সেই খেয়েই বেঁচে থাকত। বয়স অনেক হল, কিন্তু ধনসম্পদ নেই। বুড়ী তাই নিয়ে রোজ দুঃখ করত, ঘ্যানঘ্যান করত:

'সারা জীবন কেটে গেল, না পেলাম একটা ভালো কিছু খেতে, না পেলাম ভালো কিছু পরতে। ছেলেপুলেও নেই যে বুড়ো বয়সে আমাদের দেখাশোনা করে।'

বুড়ো সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘দুঃখ করো না বুড়ী, দুঃখ করো না। যতদিন আমার এই দুটো হাত আর দুটো পা আছে, ততদিন খাওয়া জোটাব। তার পরের কথা ভেবে কী হবে।’

এই বলে বুড়ো চলে গেল শিকারে।

সেদিন সকাল থেকে রাত অবধি বুড়ো বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াল, কিন্তু একটা পাখি পশু কিছুই মারতে পারল না। খালি হাতে বাড়ী ফিরতে মন চাইছিল না। কিন্তু উপায় নেই। ওদিকে সূর্য ডুবে যাচ্ছে — বাড়ী ফেরার সময় হল।

বুড়ো যেই বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছে, অমনি ডানার আওয়াজ শোনা গেল। ঝোপ থেকে মাথা তুললে অপূর্ব সুন্দর একটা বড়মতো পাখি।

কিন্তু নিশানা ঠিক করতে করতেই উড়ে পালিয়ে গেল পাখিটা।

‘দেখা যাচ্ছে কপালে নেই!’

যে ঝোপ থেকে পাখিটা বেরিয়ে এসেছিল বুড়ো সেখানে উঁকি দিয়ে দেখে, একটা বাসা, তাতে তেত্রিশটা ডিম।

‘নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল,’ এই বলে বুড়ো তার কোমরের বাঁধুনিটা এঁটে নিয়ে তেত্রিশটা ডিমই তার পোষাকের মধ্যে পুরে বাড়ীমুখো রওনা দিল।

চলতে চলতে বুড়োর কোমরের বাঁধুনি কখন গেল আলগা হয়ে, আর ডিমগুলো সব ফাঁক দিয়ে পড়ে যেতে লাগল।

একটা করে ডিম পড়ে, আর তার ভিতর থেকে একটি করে তরুণ বেরিয়ে আসে। এমনি করে করে বত্রিশটা ডিম পড়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বত্রিশটি তরুণ।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ই বুড়ো তার কোমরের বাঁধুনিটা এঁটে দেওয়ায় তেত্রিশ নম্বর ডিমটা আর পড়ল না। বুড়ো তারপর যেই পিছন ফিরে তাকিয়েছে, — একেবারে অবাক কাণ্ড, দেখে কি, বত্রিশটি সুকুমার তরুণ তার পিছন পিছন আসছে, চোখে মুখে গড়নে চলনে একেবারে হুবহু এক। ছেলের দল সমস্বরে বলে উঠল:

'তুমি যখন আমাদের খুঁজে পেয়েছো, তখন তুমিই আমাদের বাবা, আমরা তোমার ছেলে, বাড়ী নিয়ে চলো আমাদের।'

বুড়ো ভাবল, "বুড়োবুড়ী আমাদের একটি ছেলেও ছিল না, আর আজ একেবারে একসঙ্গে বত্রিশটি!"

সবাইকে নিয়ে বাড়ী এসে বুড়ো ডাকল:

'বুড়ী, ও বুড়ী! এতদিন তো খালি ছেলে ছেলে করে দুঃখ করতে। এই নাও বত্রিশটি ফুটফুটে ছেলে। জায়গা করো, ছেলেদের খাওয়াও।'

বুড়ো বুড়ীকে সব ঘটনা খুলে বলল।

বুড়ী তো সেখানেই থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ দিয়ে রা বেরল না। গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তারপর হঠাৎ ছুটল খাবার জায়গা করতে। বুড়ো ওদিকে কোমরের বাঁধুনিটা খুলে যেই পোষাকটা ছাড়তে গেছে, অমনি তেত্রিশ নম্বর ডিমটা গেল পড়ে আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আর একটি তরুণ।

'আরে, তুমি আবার কোথা থেকে এলে?'

'আমিও তোমার ছেলে, ক্ষুদে ইভান।'

তখন বুড়োর মনে পড়ল সত্যিই তো সে পাখির বাসায় তেত্রিশটা ডিমই পেয়েছিল।

'ঠিক আছে, ক্ষুদে ইভান, তুমিও তবে খেতে বসে যাও।'

তেত্রিশটি ছেলে কিন্তু খেতে বসামাত্রই বুড়ীর ভাঁড়ারে যা ছিল সব শেষ হয়ে গেল, টেবল ছেড়ে উঠতে হল ভরপেটেও নয়, খালি পেটেও নয়।

রাত কাটাল ছেলেরা। পরদিন সকালে ক্ষুদে ইভান বুড়োকে বলল:

'বাবা, আমাদের নিয়ে যখন এসেছো, কাজও দাও।'

'কিন্তু কী কাজ দিই? বুড়োবুড়ী আমরা, জীবনে কখনও না দিয়েছি হাল, না বুনেছি বীজ। আমাদের না আছে ঘোড়া, না আছে লাঙ্গল।'

ক্ষুদে ইভান বলল, 'নেই, তো নেই! কী আর করা যাবে। লোকের কাছে গিয়ে কাজ করব। বাবা, তুমি কামারের কাছে গিয়ে আমাদের জন্যে তেত্রিশটা কাস্তে গড়িয়ে আনো।'

বুড়ো গেল কামারের কাছে কাস্তে গড়াতে, আর এদিকে ক্ষুদে ইভান আর তার ভাইয়েরা মিলে ততক্ষণে বানিয়ে ফেলল তেত্রিশটা কাস্তের হাতল আর তেত্রিশটা আঁচড়া।

বুড়ো কামারঘর থেকে ফিরে এলে পর ক্ষুদে ইভান সবাইকে যন্ত্রপাতি বেঁটে দিয়ে বললে:

'চলো যাই মজুর খাটব, রোজগার করব, নিজেদের পেট চালাতে হবে, বাবা-মাকেও দেখতে হবে।'

তারপর বুড়ো বাবা-মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ভাইয়েরা। গেল তারা একটুখানি নাকি অনেকখানি, অনেকক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ, দেখল সামনে একটা মস্ত সহর। সেই সহর থেকে তখন রাজার গোমস্তা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল। ওদের দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল:

'ওহে জোয়ানেরা, কাজ করতে যাচ্ছো, নাকি কাজ থেকে ফিরছো? যদি খাটতে চাও, তবে আমার সঙ্গে এসো, ভাল কাজ আছে।'

ক্ষুদে ইভান জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কাজটা কী, বলবে।'

গোমস্তা বলল, 'তেমন কঠিন কিছু নয়। রাজার খাস মাঠের ঘাস তোমাদের কেটে, শুকিয়ে, আঁটি বেঁধে, গাদা করে রাখতে হবে। তোমাদের সর্দার কে?'

কেউ উত্তর দিল না। ক্ষুদে ইভান এগিয়ে এসে বলল:

'চলো, কাজ বুঝিয়ে দাও।'

গোমস্তা তখন তাদের রাজার খাস মাঠে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল:

'তিন সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে তো?'

ইভান বলল:

'যদি ঝড় জল না হয়, তবে তিন দিনেই হয়ে যাবে।'

সে কথায় গোমস্তা ভারি খুশী হয়ে বলল:

'তবে কাজে লেগে যাও, মজুরি ঠকাব না, খোরাক যা লাগবে সব পাবে।'

ক্ষুদে ইভান বলল:

'আমাদের আর কিছুই চাই না, কেবল তেত্রিশটা ষাঁড়ের রোস্ট, তেত্রিশ বালতি মদ, আর প্রত্যেককে একটা করে কালাচ* দিও, তাতেই হবে।'

গোমস্তা চলে গেল। তেত্রিশ ভাই কাস্তেতে শান দিয়ে এমন ফুর্তিসে টান লাগালে যে আওয়াজ উঠল শনশন। কাজ চলল খুব জোর। সন্ধ্যার মধ্যেই সব ঘাস কাটা হয়ে গেল। এদিকে রাজার রসুইঘর থেকে এল তেত্রিশটা ষাঁড়ের রোস্ট, তেত্রিশ বালতি মদ আর প্রত্যেকের একটা করে কালাচ। তেত্রিশ ভাই প্রত্যেকে আধখানা করে ষাঁড়, আধ বালতি করে মদ, আর আধখানা করে কালাচ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন চনচনে রোদ উঠলে তেত্রিশ ভাই ঘাসগুলো শুকিয়ে আঁটি বেঁধে সন্ধ্যার মধ্যেই গাদা দিয়ে ফেলল। তারপর আবার তারা প্রত্যেকে আধখানা করে কালাচ দিয়ে আধখানা করে ষাঁড় আর আধ বালতি মদ খেল। তারপর ক্ষুদে ইভান তার এক ভাইকে পাঠিয়ে দিল রাজদরবারে।

বললে, 'বলো গিয়ে আমাদের কাজ দেখে যাক।'

গোমস্তাকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরল। পেছু পেছু রাজামশাইও তার মাঠে এসে হাজির। প্রত্যেকটি গাদা গুণে গুণে মাঠের সবটা ঘুরে ঘুরে দেখল রাজা — একটি ঘাসের শিষও কোথাও নেই। বললে:

'চটপট আমার খাস জমির ঘাস কেটে বিচালি বানিয়ে গাদা দিয়েছো তোমরা ভালোই। এর জন্যে তোমাদের বাহবা দিচ্ছি, তাছাড়া দিচ্ছি একশ'টি রুবল আর চল্লিশ-ভাঁড়ি মদের পিপে। কিন্তু আর একটা কাজ তোমাদের করতে হবে। এই বিচালি পাহারা দাও। প্রত্যেক বছর কে এসে যেন এ সব বিচালি খেয়ে যায়, কিছুতেই চোরকে ধরতে পারছি না।'

ক্ষুদে ইভান বলল:

'হুজুর মহারাজ, আমার ভাইয়েদের আপনি বাড়ী যেতে দিন, আমি একাই পাহারা দেব।'

রাজার তাতে আপত্তি হল না। ভাইয়েরা সব রাজদরবারে গিয়ে তাদের পাওনা টাকা নিয়ে ভাল পানাহার করে বাড়ী ফিরল।

---

* কালাচ — শাদা রুটি।

ক্ষুদে ইভান ফিরে গেল রাজার সেই খাস মাঠে। রাত্তিরে সে না ঘুমিয়ে রাজার বিচালি পাহারা দেয়। আর দিনের বেলা খাওয়া দাওয়া করে জিরিয়ে নেয় রাজার রসুইঘরে।

দেখতে দেখতে হেমন্তকাল এসে গেল। রাত্তিরগুলো তখন বড় বড় আর অন্ধকার। একদিন এক সন্ধ্যায় ক্ষুদে ইভান একটা বিচালির গাদায় খড় জড়িয়ে শুয়ে আছে, চোখে ঘুম নেই। ঠিক রাত দুপুরে চারিদিক হঠাৎ যেন দিনের আলোয় ভরে গেল। ক্ষুদে ইভান মাথা বের করে দেখে কী, স্বর্ণকেশরী একটা মাদী ঘোড়া। ঘোড়াটা সমুদ্রের বুক থেকে লাফিয়ে উঠে সোজা ছুটে এল বিচালির গাদার দিকে। তার খুরের দাপে মাটি কাঁপে, সোনালী কেশর হাওয়ায় ওড়ে, নাক দিয়ে আগুন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরয়।

ঘোড়াটা এসেই বিচালি খেতে লেগে গেল। পাহারাদার ক্ষুদে ইভান সুযোগ বুঝেই লাফিয়ে পড়ল ঘোড়াটার পিঠে। বিচালির গাদা ছেড়ে রাজার খাস মাঠের মধ্যে দিয়ে তখন সে কী ছুট ঘোড়াটার। ক্ষুদে ইভান বাঁ হাতে ধরেছে ঘোড়ার কেশর, ডান হাতে চামড়ার চাবুক। চাবুক মেরে মেরে জলায় শ্যাওলায় ঘোড়াকে ছোটাতে লাগল ক্ষুদে ইভান।

জলায় শ্যাওলায় ছুটে ছুটে শেষে পেট পর্যন্ত পাঁকের মধ্যে ডুবে গিয়ে থামল ঘোড়াটা। বলল:

'ক্ষুদে ইভান, আমায় তুমি ধরেছো, সওয়ার হয়ে থেকেছো, বশে আনতেও পেরেছো। আর আমায় মেরো না, কষ্ট দিয়ো না, আজ থেকে আমি তোমার সব কথা শুনব।'

ক্ষুদে ইভান তখন ঘোড়াটাকে নিয়ে রাজার আস্তাবলে বেঁধে রেখে নিজে গিয়ে রসুইঘরে ঘুমিয়ে রইল। পরদিন ইভান রাজাকে গিয়ে বলল:

'হুজুর মহারাজ, আপনার খাস মাঠ থেকে বিচালি চুরি কে করত আমি বের করেছি। চোরটাকেও ধরেছি। চলুন দেখবেন।'

স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে দেখে রাজা তো ভীষণ খুশী।

বললে, 'তা ইভান, হলে কী হয় ক্ষুদে ইভান, আসলে বড় বুদ্ধিমান,

তোমার ভালো কাজের জন্যে আজ থেকে তোমায় আমি আমার প্রধান সহিস করে দিলুম।'

সেই থেকে ছেলের নাম হয়ে গেল ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান।

ক্ষুদে ইভান রাজার আস্তাবলে কাজ করতে লাগল। সারারাত না ঘুমিয়ে সে রাজার ঘোড়ার দেখাশোনা করে। তার ফলে রাজার ঘোড়াগুলোর দিনে দিনে চেকনাই বাড়ল আর পুরুষ্টু হয়ে উঠল। গা তাদের রেশমের মতো চকচক করে, লেজ ফুলিয়ে কেশর ফুলিয়ে দাঁড়ায়—সত্যিই দেখবার মতো।

রাজামশাই ভারি খুশী। প্রশংসা আর ধরে না।

'বাহবা, ক্ষুদে ইভান বড় বদ্ধিমান! এমন সহিস আমি জীবনে দেখিনি।'

কিন্তু আস্তাবলের পুরোনো সহিসদের হিংসে হল।

'কোথাকার একটা গেঁয়ো ভূত এসে বসেছে আমাদের উপর। রাজার আস্তাবলের প্রধান সহিস হবে কিনা ওই লোকটা?'

সবাই মিলে ওরা ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগল। ক্ষুদে ইভান কিন্তু নিজের কাজ করে চলে। কোনো কিছুই টের পেল না।

একদিন এক নেশাখোর চৌকিদার এল রাজার আস্তাবলে।

বলল, 'এক ঢোক মদ দাও তো হে। কাল রাত থেকে মাথাটা বড় ধরে আছে। যদি মদ খাওয়াও তবে তোমাদের এই প্রধান সহিসের হাত থেকে ছাড়া পাবার ফন্দি বাৎলে দেব।'

এই কথা শুনে সহিসরা সানন্দে ওকে মদ খাওয়াল। চৌকিদার তার মদের পাত্র শেষ করে বলল:

'আমাদের রাজামশাইয়ের ভারি ইচ্ছে, আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল জোগাড় করেন। এই আজব জিনিসের খোঁজে কত ভাল ভাল জোয়ান গেছে নিজে থেকে, আরো কত গেছে বাধ্য হয়ে, কিন্তু তাদের একজনও আর ফিরে আসেনি। তোমরা এক কাজ করো, রাজামশাইকে গিয়ে বলো যে ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বড়াই করে বলেছে যে সে অনায়াসে এই সব জিনিস এনে দিতে পারে। রাজা তখন ওকেই পাঠাবেন, তাহলে আর কোনদিনই সে ফিরে আসবে না।'

পুরোনো সহিসরা চৌকিদারকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আর এক পাত্র মদ খাওয়াল। তারপর চলে গেল একেবারে সোজা রাজবাড়ীর সদর অলিন্দের দিকে। সেখানে গিয়ে তারা রাজার ঘরের জানলার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করতে লাগল। দেখতে পেয়ে রাজা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল:

'কী বলাবলি করছো হে? কী চাও, কী?'

'না মহারাজ, বিশেষ কিছুই না, তবে প্রধান সহিস ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বড়াই করে বলছিল যে সে আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল এনে দিতে পারে। সেই নিয়েই আমাদের মধ্যে তর্ক হচ্ছিল, কেউ বলছিল আনতে পারবে, কেউ বলছিল কেবল বরফট্টাই।'

এই কথা শুনে রাজামশাইয়ের মুখের চেহারাই বদলে গেল, হাত পা কাঁপতে লাগল। ভাবল, "আঃ, যদি একবার এই দুর্লভ জিনিসগুলো পাই, তবে সব রাজা আমায় হিংসে করবে। কত লোককে পাঠালাম কিন্তু একজনও ফিরে এল না!"

তক্ষুণি রাজা প্রধান সহিসকে ডেকে পাঠাল।

প্রধান সহিস আসামাত্রই চেঁচিয়ে উঠল রাজা:

'দেরি করো না ইভান, বেরিয়ে পড়ো, আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল এনে দাও।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বলল:

'কি বলছেন মহারাজ, আমি তো এসব জিনিসের নাম কোনদিন কানেও শুনিনি, যাব কোথায়?'

রাজামশাই তা শুনে রেগে উঠে মাটিতে পা ঠুকে বলল:

'কী, রাজার কথার ওপর কথা! যদি আনতে পারো তবে উপযুক্ত পুরস্কার পাবে, আর যদি না পারো তবে গর্দান যাবে।'

মনের দুঃখে উঁচু মাথা নিচু করে ফিরে এল ক্ষুদে ইভান। এসে তার সেই স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে লাগাম পরাতে লাগল। ঘোড়া জিজ্ঞেস করল:

'কী কর্তা, মন খারাপ কেন, বিপদ কিছু হয়নি তো?'

'মন খারাপ না করে কী করি বলো, রাজা বলেছেন আপনি-বাজা বাদ্য,

নাচিয়ে হাঁস আর রগচুড়ে বেড়াল এনে দিতে হবে। আমি তো কোনদিন তাদের কথা কানেও শুনিনি।'

স্বর্ণকেশরী ঘোড়া বলল, 'এ আর এমন কী ব্যাপার, আমার পিঠে চড়ে বসো, ডাইনী বুড়ী বাবা-ইয়াগার কাছে গিয়ে জেনে নেব, এসব আজব জিনিস কোথায় পাওয়া যেতে পারে।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান তাই তখন দূরে পাল্লায় পাড়ি দেবার জন্যে তৈরী হল। ঘোড়ায় উঠতে দেখা গেল, কিন্তু দেখাই গেল না তার ছুটে যাওয়া।

গেল সে অল্প পথ নাকি অনেক পথ, অল্প দিন নাকি অনেক দিন, এল এক গহন বনের মধ্যে, এমন আঁধার, দিনের আলো ঢুকতে পায় না। ঘুরতে ঘুরতে স্বর্ণকেশরী ঘোড়া তার রোগা হয়ে গেল, ক্ষুদে ইভান নিজেও কাহিল। বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় আসতেই দেখে এক মুরগীর পা, পায়ের গোড়ালির বদলে একটা টাকু আর সেই পায়ের উপর একটা কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরটা পূব থেকে পশ্চিমে পাক খাচ্ছে। ক্ষুদে ইভান কুঁড়েঘরটার কাছে গিয়ে বলল:

'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। থাকতে আসিনি চিরকাল, রাত পোয়ালে যাব কাল।'

কুঁড়েঘর ইভানের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। ক্ষুদে ইভান তার ঘোড়াটাকে একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এক ধাক্কায় দরজা খুলল। খুলে দেখে কী, না বাবা-ইয়াগা খেংরাকাঠি পা, খাঁড়ার মতো বেঁকে, নাকটা ছাতে ঠেকে, হামানদিস্তা পাশে, বুড়ী মিটিমিটি হাসে।

বাবা-ইয়াগা অতিথিকে দেখে খনখনিয়ে উঠল:

'কতদিন যে শুনিনি কানে, আজ দেখি রুশী মোর এখানে। বলো তো কিসের জন্যে এসেছো!'

'দিদিমা, এই কি তোমার অতিথি সৎকারের ধারা? খিদেয় ঠাণ্ডায় যে মরছে আগেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ? আমাদের রুশ দেশে অতিথি এলে আগে তাকে খাইয়ে দাইয়ে স্নান করতে দেয়, জিরতে বলে, তারপর নামধাম, কেন, কী, সব বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করে।'

'বাবা রে বাবা, আমি বুড়ী মানুষ, রাগ করো না বাছা। এদেশটা তো আর রাশিয়া নয়। দাঁড়াও বাবা, আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

বুড়ী তাড়াতাড়ি সব জোগাড় যন্ত্র করতে লাগল। চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাবার সাজাল টেবিলে, অতিথিকে ডেকে বসাল। তারপর দৌড়ে গেল চানের ঘরে চুল্লী জ্বালাতে। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান খুব আরাম করে গরম জলে চান করে নিল। বাবা-ইয়াগা বিছানা পেতে দিলে, শোয়ালে ইভানকে, তখন বিছানার পাশে বসে তাকে জিজ্ঞেস করলে:

'এবার বলো, তো সুজন? নিজের ইচ্ছেয় এসেছো, নাকি অনিচ্ছায় আসতে হয়েছে? কোথায় যাবে?'

ইভান বলল, 'রাজামশাই আমায় পাঠিয়েছেন আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল আনতে। এগুলো কোথায় পাওয়া যায় যদি বলে দাও দিদিমা, তবে চিরকাল তোমার গুণ গাইব।'

'ওগুলো কোথায় আছে, সে তো জানি বাছা, কিন্তু পাওয়া যে ভারি শক্ত। কত কুমার আনতে গেল, কিন্তু তাদের কেউ ফেরেনি।'

'কিন্তু দিদিমা, যা হবার তা হবেই! বরং আমায় সাহায্য করো, কোথায় যাব বলে দাও।'

'আহা বাছা রে, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। দেখি তোমায় একটু সাহায্য করে। স্বর্ণকেশরীকে রেখে যাও, আমার কাছে সে ভালই থাকবে। আর এই সুতোর গোলা নাও। কাল বেরবার সময় এই সুতোর গোলাটাকে মাটিতে ফেলে দিও, তারপর সুতোর গোলা যে দিকে গড়িয়ে যাবে সেদিকে যেও। এই ভাবে তুমি আমার মেজো বোনের কাছে গিয়ে পেঁছবে। সুতোর গোলা তাকে দেখালেই সে যা সন্ধান জানে বলে দিয়ে তোমায় সাহায্য করবে, তোমাকে আমাদের বড়ো বোনের কাছে পাঠিয়ে দেবে।'

পরের দিন বুড়ী তার অতিথিকে ভোর হবার আগেই তুলে দিয়ে খাইয়ে দাইয়ে এগিয়ে দিল। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বাবা-ইয়াগার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ধন্যবাদ দিয়ে দূরের পথে পাড়ি দিল। বলতে সহজ কিন্তু করতে কঠিন।

যাই হোক সুতোর গোলাটা গড়িয়েই চলে আর ক্ষুদে ইভান চলে তার পিছন পিছন।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিনদিন যায়, শেষকালে গোলাটা এসে থামল এক চড়াইয়ের পায়ের কাছে। পায়ের গোড়ালির বদলে একটা টাকু আর সেই পায়ের উপর একটা কুঁড়েঘর। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান ডেকে বলল:

'কুঁড়েঘর, ও কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও।'

সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়েঘর ঘুরে দাঁড়াল। দরজা খুলতেই ইভান শুনতে পেল হেঁড়ে গলার আওয়াজ:

'কতদিন যে শুনিনি কানে, রুশীর গন্ধ পাইনি, মানুষের মাংস খাইনি। মানুষ আজ যে নিজেই হাজির। কী চাই তোমার?'

ক্ষুদে ইভান সুতোর গোলাটা দেখাতেই সে অবাক হয়ে বলে উঠল:

'আরে আরে, তুমি তো দেখি আমার বোনের কাছ থেকে আসছো, তবে তো তুমি পর নও, আদরের অতিথি। আগে বললেই পারতে।'

তারপর ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছোটাছুটি লাগাল বুড়ী। আর যত রাজ্যের ভাল ভাল খাবার মদ এনে টেবিল সাজিয়ে অতিথিকে ডেকে বসাল।

বুড়ী বললে, 'আগে খেয়ে দেয়ে জিরিয়ে নাও, তারপর কাজের কথা হবে।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান তো পেট পুরে খেয়ে দেয়ে বিছানায় শুয়ে জিরোতে লাগল। আর বাবা-ইয়াগার মেজো বোন তার বিছানার পাশে বসে জিজ্ঞেস করতে লাগল সব বৃত্তান্ত। কে সে, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে; সব কথা তাকে বলল ক্ষুদে ইভান। শুনে টুনে বাবা-ইয়াগা বলল:

'পথ তো বেশী দূরের নয়, তবে জানি না তুমি শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে থাকবে কিনা। নাগ জ্‌মেই গরীনীচ হল আমাদের বোন-পো। আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল সব তারই সম্পত্তি। কত তরুণ কুমার গেছে, কিন্তু কেউ ফিরে আসেনি। সবাই নাগের হাতে মারা পড়েছে। এই নাগ আমার দিদির ছেলে। এই কাজে এখন দিদির সাহায্য চাই, নয় তো বাছা তুমিও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। আজ আমার যাদু দাঁড়কাককে পাঠাব,

দিদিকে আগেই সাবধান করে দিতে হবে। যা হোক, এখন তুমি ঘুমোও, কাল খুব ভোরে ডেকে দেব।'

রাতটা ঘুমাল ক্ষুদে ইভান, ভোর বেলা উঠে হাতমুখ ধুল। বাবা-ইয়াগা তাকে খাইয়ে দাইয়ে হাতে একটা লাল পশমের গোলা দিয়ে পথ দেখিয়ে বিদায় নিল। গোলা চলল গড়িয়ে আর ইভান চলল তার পিছন পিছন।

সকাল থেকে সন্ধ্যে আর সন্ধ্যে থেকে সকাল—ইভান হে'টেই চলেছে। ক্লান্ত হয়ে ইভান পশমের গোলাটা হাতে তুলে নিয়ে একটুকরো রুটি আর এক ঢোক ঝরণার জল খেয়ে নেয়, তারপর আবার হাঁটে।

তিন দিন পূর্ণ হলে গোলাটা একটা বড় বাড়ীর সামনে এসে থামল। বারোটা পাথরের উপরে বাড়ী, বারোটা থামের উপর। চারিদিকে তার উ'চু বেড়া।

কুকুর ডেকে উঠতেই বাবা-ইয়াগাদের বড়ো বোন অলিন্দে দৌড়ে এল। কুকুরটাকে শান্ত করে সে বলল:

'এসো এসো, বাছা, তোমার কথা আমি সবই জানি। আমার বোনের দূত, যাদু দাঁড়কাক, আমার কাছে এসেছিল। তোমার দায়-দুঃখে সাহায্য করার উপায় একটা করা যাবে। তার আগে বরং ঘরে ঢুকে খাওয়া দাওয়া সেরে নাও।'

খাওয়ালে, দাওয়ালে। তারপর বললে:

'তোমার এখন লুকিয়ে থাকতে হবে — আমার ছেলে জ্‌মেই গরীনীচ-এর আসার সময় হয়ে গেল। বাড়ী ফেরার সময় ক্ষিদে তেষ্টায় ওর মেজাজ একেবারে তিরিক্ষি হয়ে থাকে। তোমায় আবার গিলে না খায়।'

বড়ো বোন মাটির নিচের গুদামঘরের দরজা খুলে দিল। বলল:

'নিচে গিয়ে বসে থাকো। না ডাকলে এসো না।'

তারপর দরজা বন্ধ করতে না করতেই সে কী হুড়মুড় দুমদাম আওয়াজ। দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল জ্‌মেই গরীনীচ। সারা ঘর কে'পে উঠল।

'রুশী মানুষের গন্ধ পাই যে!'

'কী যে বলিস, বাবা, কতবছর হয়ে গেল একটা পাঁশুটে নেকড়েও আসে না, একটা ঝলমলে বাজও ওড়ে না, রুশী মানুষের গন্ধ আসবে কোথা থেকে? পৃথিবীময় ঘু'ড়ে বেড়াস, ও গন্ধ তুই-ই নিয়ে এসেছিস।'

একথা বলে বুড়ী টেবিল সাজাতে লেগে গেল। উনুন থেকে বার করল একটা তিনবছর বয়সের ষাঁড়ের রোস্ট্, টেবিলে বসালে বড় এক বালতি মদ। জ্মেই গরীনীচ এক ঢোকে সবটা মদ শেষ করে আস্ত ষাঁড়ের রোস্টটা মুখে পুরে দিল। খেয়ে দেয়ে বড় ফুর্তি হল তার।

বললে, 'মা, কার সঙ্গে একটু ফুর্তি করা যায় বলো তো, অন্তত গাধা পিটোপিটি তাস খেলবার একটা সঙ্গী থাকলেও হত!'

'গাধা পিটোপিটি তাস খেলে ফুর্তি করে সময় কাটানোর মতো একজন সঙ্গী আমি দিতে পারি, কিন্তু ওর কোনও অনিষ্ট করবি না তো?'

'ভয় নেই মা, আমি তাকে কিছু করব না। কেবল ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছে একটু তাস খেলি, ফুর্তি করি।'

'কিন্তু বাবা, যা বললি মনে রাখিস,' এই বলে বাবা-ইয়াগা গুদামঘরের ডালা খুলে বলল:

'ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান, উঠে এসো। বাড়ীর কর্তাকে মান্য করে একটু তাস খেলো।'

তাই সুরু হল তাস খেলা। জ্মেই গরীনীচ বলল:

'বাজি রইল যে জিতবে সে যে হারবে তাকে খেয়ে ফেলবে।'

সারারাত খেলা চলল। বাবা-ইয়াগার সাহায্য নিয়ে ভোর নাগাদ ক্ষুদে ইভান হারিয়ে দিল জ্মেই গরীনীচকে।

তখন জ্মেই গরীনীচ মিনতি করে বলল:

'এ বাড়ীতেই থেকে যাও সুজন। কাল সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর আবার খেলব, দেখি জিতি কিনা।'

এই বলে সে উড়ে চলে গেল। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান সেই ফাঁকে পেট ভরে খেয়ে দিব্যি একটা ঘুম দিয়ে নিল। বাবা-ইয়াগা তাকে খাওয়াল দাওয়াল।

সূর্য ডোবার পর ফিরে এল জ্মেই গরীনীচ। একটা আস্ত ষাঁড়ের রোস্ট আর বড় বালতির দেড় বালতি মদ খেয়ে বলল:

'এসো, এবার খেলা শুরু করা যাক। দেখো এবার আমি ঠিক জিতব।'

আবার সুরু হল তাস খেলা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জ্মেই গরীনীচ ঘুমে

ঢুলে পড়তে লাগল। আগের রাতটা সে মোটে ঘুমোয়নি, সারা দিনমান কেবল পৃথিবীময় ঢুঁড়ে বেড়িয়েছে। ক্ষুদে ইভান সেই ফাঁকে বাবা-ইয়াগার দৌলতে খেলাটা আবার জিতে নিল। জ্মেই গরীনীচ বলল:

'এবার আমায় কাজে বেরতে হবে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা খেলা হবে বাজির তৃতীয় দফা।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বেশ ভাল করে ঘুমিয়ে টুমিয়ে জিরিয়ে নিল। আর ওদিকে জ্মেই গরীনীচ ফিরল একেবারে হয়রান হয়ে, দু'রাত্তির ঘুমোয়নি, তার ওপর সারাদিন পৃথিবীময় ঢুঁড়ে বেড়িয়েছে। একটা আস্ত ষাঁড়ের রোস্ট আর বড় বালতির দু'বালতি মদ খেয়ে সে তার অতিথিকে ডেকে বলল:

'এসো কুমার, বসে যাও, এবার ঠিক জিতব।'

সে কিন্তু তখন ভারি ক্লান্ত। থেকে থেকেই ঘুমে ঢুলে পড়ছে। ক্ষুদে ইভান এবারেও জিতে গেল।

জ্মেই গরীনীচ তখন ভীষণ ভয় পেয়ে, হাঁটু গেড়ে বসে মিনতি করতে থাকে:

'আমায় খেয়ে ফেলো না সুজন, মেরে ফেলো না! তুমি যা বলবে, তাই করব!'

মায়ের পাও জড়িয়ে ধরে, 'ওকে বলো মা, আমায় যেন ছেড়ে দেয়!'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমানের ঠিক এইটেই চাই।

'বেশ, আমি তিনবার জিতেছি জ্মেই গরীনীচ। তার বদলে তুমি যদি আমায় আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল এই তিনটে জিনিস দাও তবে মিটে যায়।'

জ্মেই গরীনীচ তো আহ্লাদে একেবারে আটখানা। তার অতিথি আর বুড়ী মাকে জড়িয়ে ধরে কী তার আদর।

'এ তো আনন্দ করে দেব, ভবিষ্যতে আরও কত ভাল জিনিস জোগাড় করা যাবে।'

তারপর, কী আয়োজন, মহা ভোজন, ক্ষুদে ইভানকে আদর যত্ন করল জ্মেই গরীনীচ, তার সঙ্গে ভাই ভাই পাতালে। নিজে থেকেই বললে:

'কেন মিছিমিছি আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল বয়ে বয়ে তুমি হাঁটবে। কোথায় যাবে বলো, আমি এক দণ্ডেই পৌঁছে দিচ্ছি।'

বাবা-ইয়াগা বলল, 'এই তো কথার মতো কথা, বাছা! অতিথিকে নিয়ে তুই সোজা চলে যা আমার ছোট বোন, তোর মাসীর কাছে। আর সেখান থেকে ফিরবার সময় তোর মেজো মাসীর সঙ্গেও দেখা করে আসতে ভুলিস না যেন। কতদিন তারা তোকে দেখেনি!'

সাঙ্গ হল ভোজ, ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান তার ওই আজব জিনিসগুলো নিয়ে বাবা-ইয়াগার কাছ থেকে বিদায় নিল। জ্মেই গরীনীচ তাকে তুলে নিয়ে উড়ে চলল আকাশে। একঘণ্টার মধ্যেই বাবা-ইয়াগাদের সবচেয়ে ছোট বোনের বাড়ীতে এসে পেঁছিল তারা। গৃহকর্ত্রী অলিন্দে ছুটে এল, আনন্দ করে বরণ করলে অতিথিদের।

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান সময় নষ্ট না করে স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে পিঠে চড়ে বসল। তারপর ছোটো বোন বাবা-ইয়াগা আর জ্মেই গরীনীচের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চলল নিজের দেশে।

ক্ষুদে ইভান যখন তার আজব জিনিসগুলোকে নিয়ে বহাল-তবিয়তে বাড়ী ফিরল, রাজার কাছে তখন অতিথি এসেছে: তিন জার আর তাদের তিন জারপুত্র, তিন বিদেশী রাজা আর রাজপুত্র, মন্ত্রীসামন্ত পাত্রমিত্র।

ক্ষুদে ইভান ঘরে ঢুকে রাজার হাতে দিল আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল। রাজা তো ভারি খুশী। বললে:

'ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান, কাজ করে দিয়েছো তুমি। এর জন্যে অনেক বাহবা তোমায়। পুরস্কারও দেব। এতদিন তুমি ছিলে প্রধান সহিস। আজ থেকে তুমি হলে আমার অমাত্য।'

কিন্তু মন্ত্রী আর সামন্তেরা নাক সিটকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল:

'একটা সহিস এসে কিনা আমাদের সঙ্গে একাসনে বসবে! ছি-ছি, কী লজ্জার কথা! রাজামশাই কী পেয়েছেন?'

ওদিকে কিন্তু আপনি-বাজা বাদ্য থেকে বাজনা সুরু হয়ে গেল, রগুড়ে বেড়াল তার সঙ্গে গান জুড়ল আর সেই তালে পা মেলাল নাচিয়ে হাঁস। এমন

ফুর্তি লেগে গেল যে বসে থাকা যায় না। মান্যগণ্য অতিথিরাও লেগে গেল নাচতে।

সময় চলে যায় কিন্তু নাচ আর থামে না। জারদের রাজাদের মুকুট ঢলে পড়ে। জারপুত্র, রাজপুত্রেরা ঘুরে ঘুরে নাচে। মন্ত্রীসামন্তেরা ঘামে আর হাঁপায়, কিন্তু থামতে কেউ পারে না। তখন রাজা হাত নেড়ে বললে:

'হয়েছে ইভান, রগড় থামাও। আমরা সব জেরবার হয়ে পড়েছি।'

ক্ষুদে ইভান তখন তিনটে আজব জিনিস থলিতে ভরে ফেলল, শান্তি হল সকলের।

অতিথিরা যে যেখানে ছিল সেখানেই সবাই ধুপধাপ্ বসে পড়ে খাবি খেতে লাগল।

'সত্যিই মজা বটে, রগড় বটে, এমনটি আর কখনো দেখিনি!'

বিদেশী অতিথিরা সবাই হিংসে করতে লাগল। রাজার আর আনন্দ ধরে না।

'রাজামহারাজারা সব এবার আমায় দেখে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরবে। এমন জিনিস আর কারও নেই!'

মন্ত্রীসামন্তের দল কিন্তু বসে বসে ফুস্‌ফুস্ গুজগুজ করতে লাগল:

'এই যদি চলতে থাকে, তবে তো শীগ্‌গিরই এই গেঁয়ো ভূতটাই হয়ে উঠবে রাজ্যের সেরা মানুষ। রাজার চাকরিবাকরিগুলোও পাবে ওর গেঁয়ো জাতভাইগুলো। এখনি যদি ওকে তাড়াবার ব্যবস্থা না করা যায় তবে আমাদের ভুঁইয়া-সামন্তদের কপালে মরণ আছে।'

তাই পরের দিন মন্ত্রীসামন্তেরা সব কী করে রাজার এই নতুন অমাত্যকে তাড়ান যায় তাই ভাবতে লাগল। বুড়ো একজন রায়বাহাদুর বলল:

'নেশাখোর চৌকিদারটাকে ডেকে আনা যাক, সে এ সব ব্যাপারে ওস্তাদ।'

নেশাখোর চৌকিদার এসে কুর্নিশ করে বলল:

'জানি হুজুর, কেন আমায় ডেকেছেন। আমায় যদি আধবালতি মদ খাওয়ান, তবে রাজার নতুন অমাত্যকে কী করে তাড়ান যায় বাতলে দিতে পারি।'

সবাই বলে উঠল, 'বলো, বলো, আধবালতি মদ তুমি নিশ্চয়ই পাবে।'

গলা ভেজাবার জন্যে চৌকিদারকে এক পেয়ালা মদ দেওয়া হল। চৌকিদার তা খেয়ে বলল:

'আমাদের রাজার চল্লিশ বছর হল বৌ মবে গেছে। তারপর থেকে তিনি সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে বিয়ে করবার জন্যে নানা চেষ্টা করে আসছেন, পারেননি। তিন তিন বার তিনি রাজকন্যা আলিওনার রাজ্য আক্রমণ করেছেন। কত সৈন্য মারা গেছে। কিন্তু জয় করতে পারেননি। সুন্দরী রাজকন্যাকে আনার জন্যে এই বার রাজা ক্ষুদে ইভানকে পাঠান। একবার গেলে আর ফিরতে হবে না।'

একথা শুনে মন্ত্রীসামন্তেরা ভারি খুশী। সকাল হতেই তারা রাজার কাছে গেল।

'মহারাজ, খুব বুদ্ধি করে আপনি এই নতুন অমাত্যটিকে খুঁজে বের করেছেন। ঐ আজব জিনিসগুলো আনা কিছু সহজ কাজ নয়। কিন্তু এখন সে বড়াই করে বলছে সে নাকি সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকেও হরণ করে আপনার কাছে এনে দিতে পারে।'

সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনার নাম শুনেই আর রাজা স্থির থাকতে পারল না। সিংহাসন থেকে লাফিয়ে নেমে চেঁচিয়ে উঠল:

'ঠিক বলেছো, এতক্ষণ তো আমার খেয়াল হয়নি! সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে হরণ করতে হলে ওই আসল লোক।'

নতুন অমাত্যকে ডেকে বলল:

'তিন নয়ের দেশ পেরিয়ে তিন দশের রাজ্যে গিয়ে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে নিয়ে এসো।'

তা শুনে ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বলল:

'হুজুর মহারাজ, রাজকন্যা তো আর আপনি-বাজা বাদ্য নয়, নাচিয়ে হাঁসও নয়, রগুড়ে বেড়ালও নয়, থলেতেও তো পোরা যায় না। নিজেই হয়ত আসতেও চাইবে না।'

রাজা কিন্তু রাগে পা ঠুকল, হাত নাড়ল, দাড়ি ঝাড়া দিল। বলল:

'তর্ক করো না! কোনও কথা শুনতে চাই না। যে করে পারো তাকে নিয়ে এসো। যদি সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে আনতে পারো, তবে তোমায় নগর উপনগর দান করব, তোমায় করে দেব আমার রাজ্যের মন্ত্রী। আর যদি না পারো, তবে তোমার গর্দান যাবে!'

রাজার কাছ থেকে ক্ষুদে ইভান ফিরে এল গভীর দুঃখে, মাথায় একরাশ ভাবনা। স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে জিন পরাচ্ছে, ঘোড়া জিজ্ঞেস করল:

'কী ভাবছো, এত মনমরা কেন কর্তা? কোনও বিপদাপদ্ হয়নি তো?'

'বিপদ বড় নয়, তবে খুশিরও কারণ নেই। সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে নিয়ে আসার জন্যে রাজা আমায় পাঠাচ্ছেন। নিজে তিনি তিন বছর ধরে রাজকন্যার জন্যে সম্বন্ধ করেছেন, সম্বন্ধ আর হয়নি, তিন বার যুদ্ধে গেছেন, জয় করতে পারেননি, আর এখন কিনা একলা আমায় পাঠাচ্ছেন নিয়ে আসতে।'

স্বর্ণকেশরী বলল, 'এ আর এমন কী বিপদ, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দুজনে মিলে ঠিক একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।'

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্ষুদে ইভান। ঘোড়ায় উঠতে দেখা গেল, কিন্তু দেখাই গেল না তার ছুটে যাওয়া।

অনেকদিন নাকি অল্পদিন, অনেক দূর নাকি অল্প দূর — ঘোড়া ছুটিয়ে চলল, ইভান এসে পৌঁছল তিন নয়ের রাজ্যে। দেখে — এক মস্ত বেড়া পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্বর্ণকেশরী এক লাফে বেড়া পার হয়ে রাজার খাস বাগিচায় গিয়ে পড়ল। বলল:

'আমি এবার একটা আপেল গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তাতে সোনার আপেল ধরবে। তুমি আমার পিছনে লুকিয়ে থাকো। সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা কাল বেড়াতে এসে সোনার আপেল তুলতে আসবে, তখন তুমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে থেকো না কিন্তু, খপ করে ধরে ফেলো, আমিও তৈরী থাকব। তারপর আর এক মুহূর্তও নষ্ট করো না — সোজা আমার পিঠে উঠে যেও, আমিও পালাব। কিন্তু মনে রেখো, ভুল করলে তুমি আমি কেউ বাঁচব না।'

পরের দিন সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা খাস বাগিচায় বেড়াতে এল। আপেল গাছটা দেখেই সে তার দাসীবাঁদী সখীসহচরীদের ডেকে বলল:

'কী সুন্দর আপেল গাছ! আপেলও আবার সোনার! তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি একটা আপেল পেড়ে নিয়ে আসি।'

রাজকন্যা দৌড়ে যেতেই ক্ষুদে ইভান হঠাৎ কোথা থেকে লাফিয়ে এসে সুন্দরী রাজকন্যার হাত চেপে ধরল। আপেল গাছটিও অমনি স্বর্ণকেশরী ঘোড়া হয়ে গিয়ে মাটিতে পা ঠুকে তাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদে ইভান আলিওনাকে নিয়ে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। রাজকন্যার দাসীবাঁদী সখীসহচরীরা কিন্তু দেখতে পেল।

চীৎকার করে উঠল তারা, প্রহরীরা সব ছুটে এল, কিন্তু রাজকন্যার চিহ্ন নেই। রাজা সব শুনে প্রত্যেকটি পথে ঘোড়সওয়ারদের পাঠিয়ে দিল খোঁজ করতে। পরের দিন কিন্তু তারা সবাই খালি হাতে ফিরে এল। ঘোড়া ছোটানোই সার হল, চোরকে কেউ চোখেও দেখতে পেল না।

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান ততক্ষণে বহু দেশ পেরিয়ে গেছে, নদী হ্রদ উজিয়ে গেছে।

সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা প্রথমটা নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করেছিল, শেষকালে শান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল। একটু করে কাঁদে আর তরুণ কুমারকে চেয়ে দেখে, কাঁদে আর তাকায়। দ্বিতীয় দিন রাজকন্যা ক্ষুদে ইভানের সঙ্গে প্রথম কথা কইলে:

'বলো, কে তুমি, কোন দেশে বাড়ী, কোন বাহিনীর লোক? কোন কুলের ছেলে? কী বলে ডাকব, মান্যি করব?'

'আমার নাম ইভান, সবাই আমায় ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বলে ডাকে। আমি অমুক রাজার অমুক রাজ্য থেকে আসছি, বাবা মা আমার চাষী।'

'ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান, তুমি কি নিজের জন্যেই আমায় হরণ করেছো, নাকি কারো হুকুমে?'

'আমাদের রাজার আদেশে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।'

তা শুনে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা মাথার চুল ছিঁড়ে কাঁদতে সুরু করল:

'ঐ হাঁদা বুড়োটাকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না! তিন বছর ধরে সম্বন্ধ

করেছে, সম্বন্ধ হয়নি, তিনবার রাজ্য আক্রমণ করেছে, কত সৈন্য মারা পড়েছে, জয় করে নিতে পারেনি, এবারও আমায় ও কিছুতেই পাবে না।'

তরুণ কুমারের মনে লাগল কথাগুলো, কিন্তু কিছু বললে না। ভাবল: "আমার যদি এরকম একটি বৌ হত!"

কিছু কাল পরেই ইভান তার নিজের দেশে এসে পড়ল। বুড়ো রাজা এই কয়দিন জানলা ছেড়ে নড়েনি, কেবলি পথ চেয়ে দেখেছে কখন আসে ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান।

ইভান সহরে এসে পেঁছতে না পেঁছতেই রাজা একেবারে তার প্রাসাদের সিংহদ্বারে। ইভান রাজপ্রাঙ্গণে ঢুকতে না ঢুকতেই রাজা দৌড়ে এসে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে নামাল তার ধবধবে হাতদুটি ধরে।

বললে, 'কত বছর ধরে ঘটক পাঠিয়েছি, নিজে গিয়ে সম্বন্ধ করেছি, কিন্তু তুমি কেবলি ফিরিয়ে দিয়েছো, কিন্তু এবার তো আমায় বিয়ে করতেই হবে।'

আলিওনা একটু হেসে বলল:

'এতটা পথ এসে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি, মহারাজ, একটু জিরিয়ে নিতে দিন, তারপর বিয়ের কথা বলবেন।'

রাজা হন্তদন্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে দাসীবাঁদী সখীসহচরীদের ডেকে পাঠাল:

'এই আমার আদরের অতিথির জন্যে ঘর সাজিয়েছো তো?'

'অনেকক্ষণ, মহারাজ।'

'নাও, বরণ করো তোমাদের ভাবী মহারাণীকে, যা বলবে সব শুনবে, কিছুর যেন অভাব না হয়!'

দাসীবাঁদী সখী সহচরীর দল তখন রাজকন্যাকে ঘরে নিয়ে গেল। ইভানকে রাজা বললে:

'সাবাস, ইভান! এই কাজের জন্যে তুমি আমার প্রধান মন্ত্রী হবে, পুরস্কার পাবে তিনটি নগর তিন উপনগর।'

একদিন যায়, দুদিন যায়, রাজার আর ধৈর্য ধরে না। বিয়েটা না চুকিয়ে তার শান্তি নেই। তাই সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে গিয়ে বলে:

'কবে সবাইকে নিমন্ত্রণ করি, কবে হবে বিয়ে?'

রাজকন্যা বলল:

'কিন্তু কী করে বিয়ে হবে, আমার না আছে বিয়ের আংটি, না আছে রথ?'

রাজা বললে, 'ওঃ, এ তো কোনো কথাই নয়, আমার রাজ্যে কত রথ, কত আংটি। তার একটাও যদি তোমার পছন্দ না হয়, তবে আমি সাগর পারে লোক পাঠাব, সেখান থেকে আনিয়ে দেব।'

'না, মহারাজ, আমার নিজের রথ ছাড়া অন্য রথে আমি বিয়েয় যাব না, আমার নিজের আংটি ছাড়া অন্য আংটি বদল করব না।'

রাজা তখন জিজ্ঞেস করলে:

'কিন্তু কোথায় তোমার আংটি, কোথায় বিয়ের রথ?'

'আমার আংটি আছে ঝাঁপিতে, ঝাঁপি আছে আমার রথে, আর আমার রথ আছে বুয়ান দ্বীপের কাছে সমুদ্রের তলে। যতক্ষণ না তাদের আনতে পারছেন, ততক্ষণ বিয়ের কথা বলবেন না।'

রাজামশাই মুকুট খুলে মাথা চুলকাতে লাগল।

'সমুদ্রের তল থেকে রথ? সে আনা যায় কী করে?'

'সে ভাবনা আমার নয়। যে ভাবে পারেন আনুন,' এই বলে রাজকন্যা আলিওনা তার ঘরে চলে গেল।

রাজা একা বসে রইল।

বসে বসে ভাবে আর ভাবে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ক্ষুদে ইভানের কথা।

"ও ঠিক এনে দিতে পারবে!"

তক্ষুণি রাজা তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলল:

'ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী সেবক আমার। তুমি ছাড়া আর কেউ আমায় আপনি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল এনে দিতে পারেনি। তুমিই আমায় সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে এনে দিয়েছো। এখন আমার আরেকটা কাজ করে দিতে হবে — আলিওনার বিয়ের আংটি আর রথ এনে দাও। আংটি আছে ঝাঁপিতে, ঝাঁপি আছে রথে, রথ আছে বুয়ান দ্বীপের কাছে সমুদ্রের তলে। আংটি রথ যদি এনে দিতে পারো, তবে তোমাকে আমার রাজ্যের তিনভাগের একভাগ দিয়ে দেব।'

তা শুনে ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান বলল:

'কিন্তু মহারাজ, আমি তো আর তিমিমাছ নই, সমুদ্রের তল থেকে কী করে আংটি রথ নিয়ে আসব?'

রাজা রেগে উঠে পা ঠুকে চেঁচাল:

'জানতে চাই না, শুনতে চাই না। রাজার কাজ হুকুম করা, তোমার কাজ তা পালন করা। জিনিসগুলো এনে দাও — পুরস্কার পাবে, না আনলে — গর্দান যাবে!'

ইভান তাই আস্তাবলে ফিরে গিয়ে স্বর্ণকেশরীর পিঠে জিন চড়াতে লাগল। স্বর্ণকেশরী জিজ্ঞেস করল:

'কোথায় যাবে কর্তা?'

'আমি নিজেই তা এখনও জানি না, কিন্তু যেতে আমায় হবেই। রাজা হুকুম করেছেন, রাজকন্যার আংটি আর রথ নিয়ে আসতে হবে। আংটি আছে ঝাঁপিতে, ঝাঁপি আছে রথে, আর রথ আছে বুয়ান দ্বীপের কাছে সমুদ্রের তলে। তার খোঁজেই চলেছি।'

স্বর্ণকেশরী বলল:

'একাজটাই হবে সবার কঠিন। পথ দূরের নয়, তবে, কী জানি কী হয়। রথটা কোথায় আছে তা জানি, কিন্তু পাওয়া সহজ নয়। আমি সমুদ্রের তলে গিয়ে রথ টেনে এনে তুলব। কিন্তু সাগরের ঘোড়াগুলো যদি আমায় দেখতে পায় তবে কামড়ে মেরে ফেলবে। সারা জীবনেও আমাকে দেখতে পাবে না, রথও না।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান ভাবনায় পড়ে গেল। অনেক ভেবেচিন্তে শেষকালে বের করলে একটা উপায়। রাজাকে গিয়ে বলল:

'মহারাজ, বারোটা ষাঁড়ের ছাল, বারো পুদ্‌ আলকাতরামাখা দড়ি, বারো পুদ্‌ আলকাতরা আর একটা বড় কড়াই চাই আমার।'

রাজা বলল, 'তোমার যা খুশী, যতটা ইচ্ছে নাও। কেবল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো কাজে।'

তরুণ বীর ইভান তখন গাড়ীতে ষাঁড়ের ছাল, দড়ি আর আলকাতরাভরা বিরাট কড়াই চাপিয়ে তার সঙ্গে স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে যুতে বেরিয়ে পড়ল।

এসে পৌঁছল সমুদ্রের তীরে, রাজার খাস মাঠে। সেখানে নেমে স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে ষাঁড়ের ছালগুলো দিয়ে ঢেকে, ছালগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল।

'সাগরের ঘোড়া তোমায় দেখতে পেলেও সহজে দাঁত বসাতে পারবে না।'

বারোটা ছালই সে জড়িয়ে দিল, বারো পুদ দড়ি দিয়ে তাদের বাঁধল। তারপর আলকাতরা গরম করে ঢেলে দিল — পুরো বারোটি পুদ আলকাতরা মাখালে ছালে দড়িতে।

স্বর্ণকেশরী বলল:

'এখন আর আমার সাগরের ঘোড়াগুলোকে ভয় নেই, তুমি এই মাঠে আমার জন্যে তিনদিন অপেক্ষা করে থাকো। বসে বসে তোমার তারের বাজনাটা বাজাও, কখনও চোখ বুজো না কিন্তু।'

এই বলে স্বর্ণকেশরী সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান একা একা বসে রইল সমুদ্রের তীরে। একদিন গেল, দুদিন গেল, ইভানের চোখে ঘুম নেই, সে তার বাজনা বাজায় আর সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। তিনদিনের দিন কিন্তু ঢুলুনি এল ইভানের। ঘুমে সে ঢলে ঢলে পড়ে, বাজনাও আর তাকে জাগিয়ে রাখতে পারে না। যতক্ষণ পারল ঘুমের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝল, কিন্তু শেষকালে আর না পেরে ঘুমিয়েই পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে, ঘুমের মধ্যে শোনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ইভান চোখ মেলে দেখে কী, তারই স্বর্ণকেশরী ঘোড়া রথ টেনে আনছে তীরে। আর ছ'টা স্বর্ণকেশরী সাগরের ঘোড়া ঝুলছে তার দুপাশে।

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান তার ঘোড়ার কাছে দৌড়ে যেতেই ঘোড়া বলল:

'তুমি যদি আমায় ষাঁড়ের ছাল আর দড়ি বেঁধে আলকাতরা ঢেলে না দিতে, তবে আর আমায় দেখতে পেতে না, সাগরের ঘোড়ারা দল বেঁধে আমায় তেড়ে এসেছিল। ন'টা ছাল একেবারে কুটি কুটি করে ফেলেছে, আরো দুটো ছিঁড়ে ফেলেছে। এই ছ'টা ঘোড়া দড়ি আর আলকাতরায় এমন জোর দাঁত আটকে গেছে যে ছাড়াতে পারেনি। ভালই হয়েছে, এরা তোমার কাজে লাগবে।'

তরুণ বীর ইভান তখন সাগরের ঘোড়াগুলোকে দড়িতে বেঁধে চাবুক বের করে তাদের শিক্ষা দিতে সুরু করল। ঘোড়াদের চাবুক মারে আর বলে:

'মনিব বলে মানবি কিনা বল? আমার হুকুমে চলবি কিনা বল? নইলে তোদের পিটিয়ে মারব, নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দেব!'

সাগরের ঘোড়া ছ'টা তখন হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইতে লাগল:

'কষ্ট দিও না বীর, মেরো না, যা বলবে সব আমরা শুনব। ধম্মমতে কাজ করব। বিপদে আপদে রক্ষা করব।'

তখন ইভান মার বন্ধ করে সাতটা ঘোড়াকেই গাড়ীর সঙ্গে যুতে বাড়ী ফিরল। গাড়ী ছুটিয়ে এল একেবারে সিংহদরজার সামনে। স্বর্ণকেশরী ঘোড়াটা সমেত ছ'টা সাগরের ঘোড়াকে আস্তাবলে রেখে দিয়ে ক্ষুদে ইভান গেল রাজার কাছে।

'মহারাজ, আপনার রথ নিন। গাড়ী-বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে তার যৌতুক।'

রাজার তখন আর ধন্যবাদ দেবারও তর সয় না। এক ছুটে রথ থেকে ঝাঁপিটি নিয়ে একেবারে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনার কাছে।

'আলিওনা, সখ তোমার মিটিয়েছি, সব ইচ্ছে পুরিয়েছি। তোমার ঝাঁপি, তোমার আংটি এনেছি। দেখো, বিয়ের রথ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এবার বলো, কবে আমাদের বিয়ে হবে, কোন তারিখে নেমন্তন্ন করব?'

সুন্দরী রাজকন্যা উত্তর দিল:

'বিয়ে করতে রাজী আছি, ভোজও শীগ্গিরই হতে পারে। তবে অমন শাদাচুলো বুড়ো আসবে বর হয়ে, সেটা আমার মন চাইছে না। লোকে নিন্দে করবে, দোষ ধরবে। দেখে হাসবে, বলবে, "একটা বুড়ো হাবড়ার কচি বৌ।" বুড়োর বউ পরের ধন। লোকের মুখের কথা, চাপা দেবে কে তা! তাই বলি, বিয়ের আগেই আপনি যদি আবার জোয়ান হয়ে যেতে পারেন, তাহলে সব দিক থেকেই ভালো।'

রাজা বলল:

'জোয়ান হতে পারলে তো ভালোই। তুমিই নয় শিখিয়ে দাও কেমন করে

হব। বুড়ো আবার ফিরে জোয়ান হয় এমন কথা তো রাজ্যের কেউ কখনো শোনেনি।'

সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা বলল:

'তিনটে বড় বড় তামার কড়াই চাই। একটাতে থাকবে এক কড়াই ভর্তি দুধ, অন্য দুটোতে ঝরণার জল। একটা জলের কড়াই আর দুধের কড়াইটা আগুনে চড়াবেন। যেই ফুটতে আরম্ভ করবে অমনি আপনি প্রথমে লাফিয়ে পড়বেন দুধের কড়াইতে, তারপর গরম জলেরটাতে আর শেষকালে ঠাণ্ডা জলে। ডুব দিয়ে বেরিয়ে এলেই দেখবেন আপনি আবার কুড়ি বছরের সুন্দর জোয়ান হয়ে গেছেন।'

রাজা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু পুড়ে যাব না তো?'

'আমাদের রাজ্যে একটিও বুড়ো নেই। সবাই এই ভাবে পুনর্যৌবন পায় কিন্তু কেউ তো কোনদিন পুড়ে যায়নি।'

রাজামশাই ফিরে গিয়ে আলিওনার কথামত সব জোগাড় যন্ত্র করল।

দুধ আর জল যখন টগবগ করে উঠল, রাজা তখন আর মন স্থির করতে পারে না। ভীষণ তার ভয়। কড়াই তিনটের চারদিকে কেবলি পায়চারি করে বেড়ায়। হঠাৎ তার মাথায় খেলল:

'আরে, আমি এত ভাবছি কেন? আগে ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান ঝাঁপ দিয়ে চান করে আসুক, দেখি কী হয়। যদি ওর কিছু না হয় তাহলে পরে আমিও ডুব দেব। আর যদি পুড়েই যায় তাহলে কাঁদবার কিছু নেই। ওর ঘোড়া কটা আমার হয়ে যাবে, রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগও দিতে হবে না।'

এই ভেবে রাজা ক্ষুদে ইভানকে ডেকে পাঠাল:

'হুজুর মহারাজ, আবার আপনার কী প্রয়োজন? আমি যে এখনো একটু জিরিয়ে নিতেও পারিনি।'

'বেশীক্ষণ আটকাব না। তুমি কেবল একবার এই কড়াইগুলোতে ঝাঁপ দাও, ব্যস তারপর তোমার ছুটি।'

ক্ষুদে ইভান কড়াইগুলোর দিকে তাকাল। দুটো কড়াইতে জল আর দুধ ফুটছে। কেবল তৃতীয় কড়াইয়ের জলটা ঠাণ্ডা।

ইভান বলল, 'বলেন কী মহারাজ, আপনি আমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চান নাকি? এই বুঝি বিশ্বাসী কর্মচারীর পুরস্কার!'

'আরে, না না ইভান, কোনো বুড়ো যদি ঐ কড়াইগুলোতে একবার করে ডুব দিতে পারে, ব্যস অমনি সে জোয়ান সুপুরুষ হয়ে যাবে।'

'হুজুর মহারাজ, আমি তো এমনিতেই বুড়ো নই, জোয়ান হবার কী আছে আমার?'

ভীষণ রেগে গেল রাজা:

'আচ্ছা বেয়াদব তো হে তুমি! আমার কথার ওপরে কথা। নিজের ইচ্ছেয় যদি ডুব না দাও তবে জোর করে দেওয়াব, যম দুয়ারে পাঠাব।'

ঠিক সেই সময় সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা ছুটে এল ঘর থেকে। সুযোগ বুঝে রাজার অলক্ষ্যে ফিসফিস্ করে ক্ষুদে ইভানকে বলল:

'ঝাঁপ দেবার আগে তোমার সাগরের ঘোড়া আর স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে জানিয়ে দাও। তাহলে আর ভয় থাকবে না।'

রাজাকে বলল:

'দেখতে এলাম যা বলেছি সব ঠিকঠাক আয়োজন করা হয়েছে কিনা।'

এই বলে রাজকন্যা এগিয়ে গিয়ে কড়াইগুলোর মধ্যে উঁকি মেরে দেখল। বলল, 'ঠিক আছে। এবার মহারাজ চান করে নিন। আমি বিয়ের জন্যে তৈরী হই গে।'

এই বলে রাজকন্যা ঘরে চলে গেল। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান রাজার দিকে একবার চেয়ে বলল:

'বেশ, রাজামশাই, শেষবারের মতো আপনার সখ মেটাব। কী আর আছে করবার, মরবে মানুষ একবার। কেবল আমার স্বর্ণকেশরী ঘোড়াটাকে দেখে আসি। আমরা দু'জন একসঙ্গে কত ঘুরে বেড়িয়েছি। কে জানে, হয়ত এই শেষ দেখা।'

'যাও, কিন্তু বেশী দেরী করো না।'

ক্ষুদে ইভান তখন আস্তাবলে গিয়ে তার স্বর্ণকেশরী ঘোড়া আর ছ'টা সাগর ঘোড়ার কাছে সব কথা খুলে বলল। ঘোড়ারা বলল:

'আমরা যেই একসঙ্গে তিনবার ডাকব অমনি তুমি নির্ভয়ে ঝাঁপ দিও।'

ইভান রাজার কাছে ফিরে গিয়ে বলল:

'মহারাজ! আমি প্রস্তুত, এই মুহূর্তে ঝাঁপ দেব।'

ইভান শুনতে পেল ঘোড়াগুলো ডাকছে — এক বার, দুই বার, তিন বার — তিনডাক শোনামাত্র ঝপাং — ইভান একেবারে গরম দুধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর বেরিয়ে এসে গরম জলে লাফিয়ে পড়ল। আর সবশেষে ঠাণ্ডা জলে ডুব দিয়ে ইভান যখন বেরিয়ে এল তখন সে কী তার রূপ! সে রূপ বলার নয়, লেখার নয়, রূপকথাতেই পরিচয়।

রাজা ক্ষুদে ইভানকে দেখে আর ইতস্তত করল না। কোনোক্রমে বেদীর উপর উঠে গরম দুধে ঝাঁপ দিল, সিদ্ধ হতে থাকল সেখানেই।

সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা তখন পড়িমরি ছুটে এল। ক্ষুদে ইভান বড়ো বুদ্ধিমানের ধবধবে হাতটা তুলে নিয়ে আঙুলে পরিয়ে দিলে আংটিটা। মিষ্টি হেসে বললে:

'তুমি আমায় রাজার হুকুমে হরণ করেছো। এখন তো আর রাজা নেই; এখন তোমার যা খুশি। ইচ্ছে হয় আমায় আবার ফিরিয়ে দিও, ইচ্ছে হয় কাছে রেখো।'

ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান সুন্দরী রাজকন্যার হাতটি ধরে বৌ বলে ডাকলে, আঙুলে তার নিজের আংটিটি পরিয়ে দিলে।

তারপর দূত পাঠিয়ে বাবা, মা, তার বত্রিশ ভাইকে বিয়ের নেমন্তন্নে ডেকে আনলে গ্রাম থেকে।

কিছু পরেই রাজবাড়িতে এসে হাজির হল বত্রিশটি তরুণ বীর. আর তার বাবা আর মা।

বিয়ে হল, ভোজ হল। ক্ষুদে ইভান বড় বুদ্ধিমান আর তার সুন্দরী বৌ নিয়ে সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। মা বাপের দেখাশোনা করে।

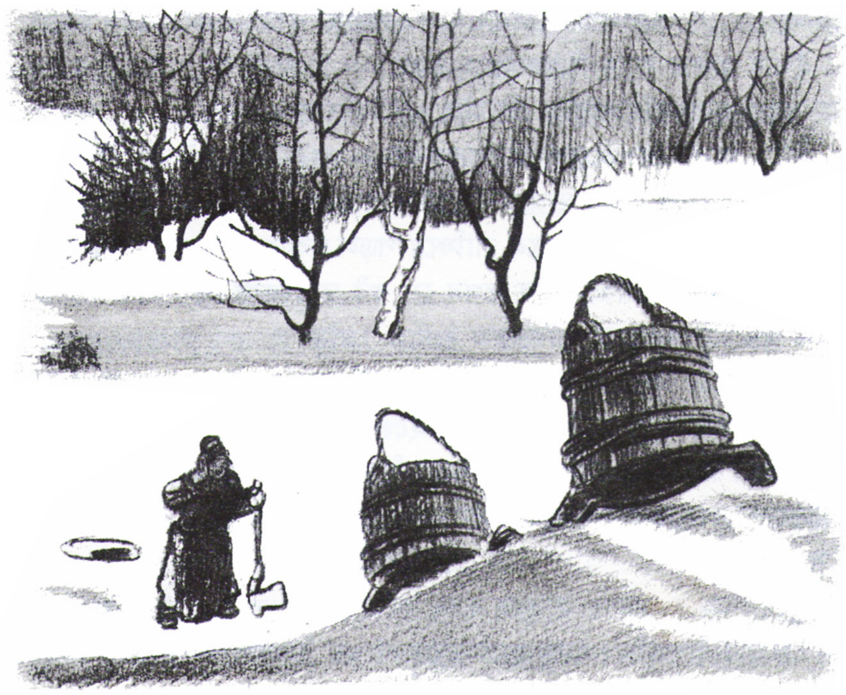

মাছের আজ্ঞায়

এক যে ছিল বুড়ো। বুড়োর তিন ছেলে। দুজন ছিল খুব চালাক চতুর কিন্তু তৃতীয় জন হাঁদা ইয়েমেল্যা।

বড় দু'ভাই সারাক্ষণ কাজ করে আর ইয়েমেল্যা খালি চুল্লীর তাকে শুয়ে থাকে, কোনো কিছু শেখার আগ্রহ নেই।

একদিন বড় ভাইয়েরা হাটে গেছে, তাদের দু'বৌ ইয়েমেল্যাকে বলল:

'ইয়েমেল্যা, যাও তো, জল নিয়ে এসো।'

ইয়েমেল্যা চুল্লীর তাকে শুয়ে শুয়েই বলে:

'ইচ্ছে করছে না...'

'যাও ইয়েমেল্যা, নইলে কিন্তু দাদারা তোমার জন্যে হাট থেকে কিছু আনবে না, দেখো!'

'বেশ, তবে যাচ্ছি।'

তড়াক করে চুল্লী থেকে নেমে ইয়েমেল্যা জামা জুতো পরে বালতি কুড়ুল নিয়ে নদীর দিকে চলল।

নদীতে গিয়ে ইয়েমেল্যা কুড়ুল দিয়ে বরফের গায়ে একটা গর্ত খুঁড়ে দু'বালতি জল তুলল। তারপর বালতিদুটো নামিয়ে রেখে উঁকি দিয়ে দেখল বরফের গর্তের ভিতরে। দেখে কি, একটা মাছ। ধাঁ করে ইয়েমেল্যা মুঠোর মধ্যে মাছটাকে ধরে ফেলল।

'বাঃ, তোফা মাছের ঝোল হবে আজ!'

মাছটা হঠাৎ মানুষের গলায় বলে উঠল:

'ছেড়ে দাও, ইয়েমেল্যা, উপকার করব।'

ইয়েমেল্যা কিন্তু হেসে উঠল:

'তুমি আবার কী উপকার করবে? না হে বাপু, আমি তোমায় বাড়ীতেই নিয়ে যাব, বৌদিদের বলব ঝোল বানিয়ে দিতে। চমৎকার ঝোল হবে।'

কিন্তু মাছটা আবার মিনতি করে বলতে লাগল:

'আমায় ছেড়ে দাও, ইয়েমেল্যা, তুমি যা চাও আমি তাই করব।'

ইয়েমেল্যা বলল, 'ঠিক আছে, তবে আগে দেখাও যে তুমি ফাঁকি দিচ্ছো না, তবে ছেড়ে দেব।'

মাছ বলল:

'তুমি কী চাও, বলো।'

'আমি চাই আমার বালতিদুটো নিজেরাই হেঁটে হেঁটে বাড়ী চলে যাক, কিন্তু এক ফোঁটা জলও যেন চলকে না পড়ে...'

মাছ বলল:

'আমার কথা মনে রেখো, তোমার কিছু দরকার হলে কেবল বলো:

মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায়!'

ইয়েমেল্যা বলে উঠল:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

বালতি, তোরা নিজেরা হেঁটে হেঁটে বাড়ী চলে যা তো!'

যেই না বলা, অমনি সত্যি সত্যি বালতি পাড় বেয়ে উঠতে সুরু করল। ইয়েমেল্যা মাছটাকে সেই বরফের গর্তে ছেড়ে দিয়ে বালতিদুটোর পিছন পিছন হাঁটতে লাগল।

বালতিদুটো গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। গ্রামবাসীরা সব অবাক। ইয়েমেল্যা কিন্তু হাসে আর বালতির পিছন পিছন আসে... বালতিদুটো সোজা ইয়েমেল্যার বাড়ী পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে মাচার উপর উঠে বসল। ইয়েমেল্যাও তার চুল্লীর তাকে উঠে গা গড়ালে।

গেল অনেক দিন, নাকি অল্প দিন। বৌদিরা এসে আবার ইয়েমেল্যাকে বলে:

'ইয়েমেল্যা, শুয়ে আছো যে? বরং কিছু কাঠ চ্যালা করো।'

'আমার ইচ্ছে করছে না...'

'না গেলে কিন্তু হাট থেকে দাদারা তোমার জন্যে কিছু আনবে না।'

ইয়েমেল্যার মোটেই চুল্লীর তাক ছেড়ে যাবার ইচ্ছে ছিল না। মাছের কথা মনে পড়ল তার, ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

যা কুড়ুল গিয়ে কাঠ চ্যালা কর্ আর চ্যালা কাঠ, তোরা বাড়ীতে ঢুকে চুল্লীর মধ্যে লাফিয়ে পড়্।'

যেই না বলা, অমনি সত্যি সত্যি কুড়ুলটা বেঞ্চির তল থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনে কাঠ কাটতে লাগল, আর চ্যালা কাঠগুলোও সার বেঁধে নিজেরাই ঘরের মধ্যে ঢুকে চুল্লীতে লাফিয়ে পড়তে লাগল।

অনেকক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ। বৌদিরা আবার এসে ইয়েমেল্যাকে বলল:

'একটুও কাঠ নেই, ইয়েমেল্যা, যাও বনে গিয়ে কিছু কাঠ কেটে আনো।'

ইয়েমেল্যা চুল্লীর ওপর থেকে বলে:

'তোমরা রয়েছো কী করতে?'

'কী বলছো তুমি, ইয়েমেল্যা? বনে গিয়ে কাঠ কাটা কি আমাদের কাজ?'

'আমার ইচ্ছে করছে না...'

'তবে কোনও জিনিষও পাবে না।'

কী আর করে, ইয়েমেল্যা চুল্লীর তাক থেকে নেমে এসে জুতো জামা পরে দড়ি আর কুড়ুল নিয়ে উঠোনে গেল। তারপর স্লেজে চড়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'ফটক খুলে দাও!'

বৌদিরা বলল:

'করছো কী হাঁদারাম, স্লেজে বসেছো ঘোড়া জোতোনি?'

'ঘোড়া টোড়ার দরকার নেই আমার।' বৌদিরা ফটক খুলে দিল আর ইয়েমেল্যা ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

যা স্লেজ, চলে যা বনে...'

যেই না বলা, অমনি সত্যি সত্যি স্লেজটা এমন জোরে ফটক পার হয়ে দৌড়তে লাগল, যে ঘোড়া ছুটিয়েও তার নাগাল পাওয়া ভার।

বনের পথটা গেছে এক সহরের মধ্যে দিয়ে, স্লেজটা যে কত লোককে উল্টে ফেলে দিল, কত লোককে চাপা দিল, তার আর ইয়ত্তা নেই। সহরের

লোক সব 'ধরো, ধরো, পাকড়ো, পাকড়ো!' করে চেঁচিয়ে উঠল। ইয়েমেল্যা কিন্তু তোয়াক্কাই করল না, কেবল স্লেজটাকে আরও জোর ছোটাল। বনে এসে সে বলে:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

যা কুড়ুল, কিছু শুকনো দেখে ডাল কেটে নিয়ে আয় আর কাঠরা, তোরা স্লেজে উঠে আপনা থেকেই বাঁধা হয়ে যা...'

যেই না বলা, অমনি সত্যি সত্যি কুড়ুল খট্‌খট্‌ খট্‌খট্‌ — শুকনো কাঠ কাটতে লেগে গেল, আর কাঠগুলোও একটার পর একটা স্লেজে উঠে দড়ি বাঁধা হয়ে যেতে লাগল। ইয়েমেল্যা তখন কুড়ুলকে একটা ভীষণ ভারী মুগুর কেটে দিতে হুকুম করল। এমন ভারী যেন তুলতে কষ্ট হয়। তারপর সেই কাঠের বোঝার উপর বসে বলল:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

চল্‌ স্লেজ, বাড়ী চল্‌!'

স্লেজটাও ছুটল বাড়ীমুখো। যে সহরটার অনেক লোককে সে আসার সময় চাপা দিয়েছিল, তারা তো লাঠি সোঁটা নিয়ে তৈরী — কখন সে ফেরে। ইয়েমেল্যাকে তারা ধরে স্লেজ থেকে টেনে নামিয়ে গাল দেয়, পিটোয়।

ব্যাপার সঙ্গীন দেখে ইয়েমেল্যা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠল:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

আয় মুগুর, দে ব্যাটাদের হাড় গুঁড়িয়ে...'

মুগুরও অমনি লাফিয়ে উঠে দে পিটুনি। সহরের লোক দে ছুট। ইয়েমেল্যা তখন বাড়ী ফিরে আবার চুল্লীর তাকে উঠে শুয়ে পড়ল।

অনেক দিন নাকি অল্প দিন — ইয়েমেল্যার কীর্তির কথা রাজার কানে গেল। রাজপ্রাসাদে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠাল রাজা।

রাজার লোক এল ইয়েমেল্যার গ্রামে। তার কুঁড়েঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল:

'তুমিই কি হাঁদা ইয়েমেল্যা?'

চুল্লীর তাকের উপর থেকেই ইয়েমেল্যা বলে:

'তোমার তাতে কী?'

'তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নাও, তোমায় রাজার বাড়ী নিয়ে যাব।'

'আমার ইচ্ছে করছে না...'

রাজার লোকটা রেগে গিয়ে ইয়েমেল্যার গালে মারলে এক চড়। ইয়েমেল্যা তখন ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

দে তো মুগুর হাড় গুঁড়িয়ে...'

সঙ্গে সঙ্গেই মুগুর লাফিয়ে উঠে এমন মার মারলে যে লোকটা কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচল।

রাজার পেয়াদা ইয়েমেল্যাকে কাবু করতে পারেনি শুনে রাজা গেল অবাক হয়ে। মহাসামন্তকে ডেকে বলল:

'হাঁদা ইয়েমেল্যাকে খুঁজে পেতে আমার কাছে ধরে আনা চাই, নইলে তোমার গর্দান যাবে।'

রাজার মহাসামন্ত কিশমিশ, খেজুর আর মিষ্টি-রুটি কিনে নিয়ে সেই সে গ্রামের সেই সে বাড়ীতে এসে বৌদিদের কাছে জিজ্ঞেস করল ইয়েমেল্যা সবচেয়ে কী ভালবাসে।

ওরা বলল, 'ইয়েমেল্যা চায় মিষ্টি কথা। ওর সঙ্গে যদি ভাল ব্যবহার করেন, লাল কাফতান উপহার দেন, তবে যা বলবেন ও তাই করে দেবে।'

মহাসামন্ত তখন ইয়েমেল্যাকে সেই সব কিশমিশ, খেজুর, মিষ্টি-রুটি দিয়ে বলল:

'ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, কেন শুধু শুধু চুল্লীর তাকে শুয়ে আছো? চলো না আমার সঙ্গে রাজার বাড়ী যাই।'

ইয়েমেল্যা বলল, 'এখানেই বেশ আছি...'

'ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, রাজামশাই তোমায় কত ভালোমন্দ খাওয়াবেন। চলো যাই।'

'আমার ইচ্ছে করছে না...'

'ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, রাজামশাই তোমায় দেবেন একটা লাল কাফতান, টুপি, জুতো।'

ইয়েমেল্যা ভেবে চিন্তে বলল:

'ঠিক আছে, আপনি আগে আগে চলে যান, আমি পরে আসছি।'

মহাসামন্ত ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল, ইয়েমেল্যা চুল্লীর তাকে আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বলল:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

চল চুল্লী, আমায় রাজার বাড়ী নিয়ে চল!'

যেই না বলা, অমনি ঘরের কোণ ফেটে গেল, বাড়ীর চাল নড়ে উঠল, একদিকের দেয়াল ধ্বসে পড়ল আর চুল্লীটা নিজে নিজেই বেরিয়ে পড়ে সোজা পথ ধরে রওনা দিল রাজবাড়ীর দিকে।

রাজামশাই তো জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অবাক।

'ওটা কী ব্যাপার?'

মহাসামন্ত বলল:

'আজ্ঞে, ঐ তো ইয়েমেল্যা, তার চুল্লীতে চড়ে আপনার প্রাসাদে আসছে।'

রাজামশাই অলিন্দে এসে বললে:

'শোনো ইয়েমেল্যা, তোমার নামে অনেক নালিশ এসেছে। অনেক লোককে স্লেজ চাপা দিয়েছো তুমি।'

'ওরা আমার স্লেজের নিচে পড়ল কেন?'

রাজার মেয়ে রাজকন্যা মারিয়া সেই সময় জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। ইয়েমেল্যা দেখেই ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

রাজার মেয়ে আমায় ভালবাসুক...'

তারপর বলল, 'চল চুল্লী, বাড়ী চল!'

চুল্লীটা ঘুরে সোজা ইয়েমেল্যার গ্রামে পেঁাছে গেল। তারপর বাড়ী ঢুকে ঠিক নিজের জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইয়েমেল্যাও শুয়ে রইল আগের মতো।

ওদিকে রাজবাড়ীতে তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে। রাজকন্যা মারিয়া ইয়েমেল্যার জন্যে অস্থির, ওকে নইলে বাঁচবে না। রাজাকে সে কত করে বলতে লাগল ইয়েমেল্যার সঙ্গে বিয়ে দিক। বিপদে পড়ে গেল রাজা। মনের দুঃখে শেষে তার মহাসামন্তকে ডেকে বলল:

'যাও, ইয়েমেল্যাকে নিয়ে এসো। জ্যান্ত মরা যে ভাবে পাও, নইলে তোমার গর্দান যাবে।'

মহাসামন্ত তো আবার নানারকম সুন্দর সুন্দর খাবার দাবার, মিষ্টি মদ নিয়ে রওনা হল। সেই সে গ্রামের সেই সে বাড়ীতে গিয়ে রাজভোজ খাওয়াতে লাগল ইয়েমেল্যাকে।

ইয়েমেল্যা পান করল, ভোজন করল, বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। মহাসামন্ত তখন ঘুমন্ত ইয়েমেল্যাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে সোজা চলে গেল রাজার কাছে।

রাজামশাই তখুনি একটা মস্ত লোহা-লাগানো পিপে নিয়ে আসার হুকুম

দিল। ইয়েমেল্যা আর রাজকন্যা মারিয়াকে ভিতরে পুরে পিপেটা আলকাতরা মাখিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হল সমুদ্রে।

বহুক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ, কে জানে। ঘুম ভেঙে ইয়েমেল্যা দেখে — চারিদিকে চাপাচাপি, অন্ধকার।

'কোথায় আমি?'

উত্তর এল, 'আমাদের কপাল খারাপ, আমার আদরের ইয়েমেল্যা! ওরা আমাদের একটা আলকাতরা মাখানো পিপেতে পুরে নীল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে।'

ইয়েমেল্যা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'আমি রাজকন্যা মারিয়া।'

ইয়েমেল্যা বলল:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

আয় তো রে ঝড়ের হাওয়া পিপেটাকে নিয়ে যা শুকনো তীরে, হলুদ বালিতে...'

যেই না বলা, অমনি জোর হাওয়া উঠল, সমুদ্রের বুক দুলে উঠল, আর পিপেটা গিয়ে ঠেকল শুকনো তীরে, হলুদ বালিতে। ইয়েমেল্যা আর রাজকন্যা মারিয়া বেরিয়ে এল বাইরে। রাজকন্যা বলল:

'থাকব কোথায়, ইয়েমেল্যা? তুমি যেমন হোক একটা ঘর তোলো।'

'আমার ইচ্ছে করছে না...'

রাজকন্যা তখন অনেক সাধ্যসাধনা করল। ইয়েমেল্যা বলল:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

এক্ষুণি এখানে সোনার ছাদওয়ালা একটা পাথরের প্রাসাদ হয়ে যাক...'

বলতে না বলতেই সোনার ছাদওয়ালা একটা চমৎকার পাথরের প্রাসাদ হয়ে গেল তাদের চোখের সামনে। চারদিকে তার সবুজ বাগান: ফুল ফুটছে, পাখি গাইছে। রাজকন্যা মারিয়া আর ইয়েমেল্যা প্রাসাদের ভিতর ঢুকে জানলার পাশে বসল।

রাজকন্যা বলল, 'আচ্ছা ইয়েমেল্যা, খুব সুন্দর হয়ে যেতে পারো না তুমি?'

ইয়েমেল্যার ভাবার কিছু ছিল না। বলে উঠল:

'মাছের আজ্ঞায়,
মোর ইচ্ছায় —

হয়ে যাই যেন বীর তরুণ, রূপে অরুণ...'

অমনি এমন সুন্দর হয়ে উঠল ইয়েমেল্যা যে সে রূপ বলার নয়, কওয়ার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়।

এদিকে হয়েছে কী, ঠিক সেই সময় রাজামশাই শিকার করতে এসে দেখে, আগে যেখানে কিচ্ছু ছিল না সেখানে একটা মস্ত প্রাসাদ।

'কার এত বড় আস্পর্ধা, আমার অনুমতি না নিয়ে আমার জমিতে বাড়ী বানায়!'

সঙ্গে সঙ্গে দূত ছুটল খোঁজখবর করতে: কে লোকটা।

দূতেরা ছুটে গিয়ে জানলার নীচ থেকে জিজ্ঞেসাবাদ করে।

ইয়েমেল্যা বলে:

'রাজামশাই আমার ঘরে অতিথি আসুন, আমি নিজে তাঁকে বলব।'

রাজামশাই অতিথ এল, ইয়েমেল্যা তাকে বরণ করে নিয়ে এল পুরীতে, টেবলে বসাল। শুরু হল ভোজ। রাজামশাই চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খায় আর অবাক হয়ে যায়। শেষকালে আর থাকতে পারল না। জিজ্ঞেস করল:

'কে তুমি তরুণ বীর?'

ইয়েমেল্যা বলল, 'হাঁদা ইয়েমেল্যাকে আপনার মনে আছে? সেই যে চুল্লীর মাথায় চড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাকে আর রাজকন্যা

মারিয়াকে আলকাতরা মাখা পিপেতে পুরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন? আমিই সেই ইয়েমেল্যা। ইচ্ছে করলে আপনার সমস্ত রাজত্বটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে পারি আমি।'

রাজামশাই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে ইয়েমেল্যার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। বলল:

'আমার মেয়েকে বিয়ে করো ইয়েমেল্যা, আমার রাজত্ব ভোগ করো, কিন্তু প্রাণে মেরো না!'

অমনি, কী আয়োজন, পান ভোজন। রাজকন্যা মারিয়াকে বিয়ে করে সুখেস্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে লাগল ইয়েমেল্যা। কাহিনী হল সারা, শুনল লক্ষ্মী যারা।

নিকিতা কজেম্যাকা

একবার কিয়েভের কাছে এক নাগের উৎপাত সুরু হল। লোকের কাছ থেকে সে ভেট নিত কম নয়: প্রত্যেক ঘর থেকে একটি করে সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটিকে নিত আর খেয়ে ফেলত।

এবার রাজার মেয়ের পালা। রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে নাগ এল তার গুহায়। কিন্তু খেলে না, রাজকন্যা খুবই সুন্দরী, বিয়ে করে নিল। নাগ চলে যায় তার কাজে, রাজকন্যাকে দরজা বন্ধ করে রাখে যেন পালাতে না পারে।

রাজকন্যার একটা কুকুর ছিল। রাজকন্যার পিছু পিছু এসেছিল কুকুরটা। রাজকন্যা বাবা-মা'র কাছে ছোট একটা করে চিঠি লিখে কুকুরের গলায় বেঁধে

দেয়, আর কুকুরটা যেখানে যাবার ছুটে যায়, উত্তর নিয়ে আসে। একদিন রাজা আর রাণী রাজকন্যাকে লিখে পাঠাল, রাজকন্যা যেন জেনে নেয় নাগের চেয়েও শক্তিশালী কে।

রাজকন্যা নাগের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করতে থাকে, জানতে চেষ্টা করে নাগের চেয়ে কে বলবান। অনেক দিন নাগ কিছু বলেনি, শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, কিয়েভে নিকিতা কজেম্যাকা* আছে, তার গায়ে নাগের চেয়েও জোর। রাজকন্যা সে কথা শুনে রাজাকে লিখে পাঠাল: "নিকিতা কজেম্যাকাকে কিয়েভ সহরে খুঁজে বের করে আমায় উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।"

খবর পেয়ে রাজা তক্ষুণি নিকিতা কজেম্যাকাকে খুঁজে বের করে নিজেই তাকে অনুরোধ করল নাগের কবল থেকে যেন সে তার রাজত্ব আর তার কন্যাকে উদ্ধার করে।

রাজা যখন নিকিতার বাড়ী গেল, নিকিতা তখন চামড়া দলাই করছে, হাতে তার বারোটা চামড়া। স্বয়ং রাজা আসছে তার কাছে এই দেখে নিকিতা ভয়ে এমন কাঁপতে লাগল যে, তার বারোটা চামড়া ছিঁড়ে গেল। একেই রাজা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, তাতে এই লোকসান, ভারী রাগ হয়ে গেল নিকিতার, রাজারাণীর হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই নাগ মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যেতে রাজি হল না।

তখন, পাষণ্ড নাগের উৎপাতে যারা অনাথ হয়েছে তেমন পাঁচহাজার শিশুকে পাঠান হল নিকিতার কাছে। তারা মিনতি করে বলবে নিকিতা যেন রুশ দেশকে এই মহা বিপদ থেকে বাঁচায়।

অনাথ শিশুর দল নিকিতার কাছে গিয়ে তাদের জল ভরা চোখ তুলে নাগ মারবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল। অনাথের চোখের জল দেখে নিকিতার মন করুণায় ভরে গেল। তিনশ' পুদ শণের দড়ি নিয়ে তাতে আলকাতরা মাখাল নিকিতা। নাগের কামড় থেকে বাঁচবার জন্যে বেশ করে নিজের শরীর বেড়ে তা বেঁধে নিল। তারপর চলল লড়াই করতে।

---

* কজেম্যাকা মানে চামার।

নিকিতা এল নাগের গুহার কাছে। নাগ ওদিকে হুড়কো লাগিয়ে বসে আছে গুহায়, কিছুতেই বেরতে চায় না।

নিকিতা হাঁকল, 'শীগ্গির বেরিয়ে আয়, খোলা মাঠে লড়ব, নইলে গুহা তোর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব এখনি।' বলে দরজা ভাঙতে সুরু করে দিল নিকিতা।

নাগ দেখল বিপদ, কী আর করে, বেরিয়ে এসে খোলা মাঠে নিকিতার সঙ্গে লড়াই সুরু করল। অনেক দিন নাকি অল্প দিন, কতদিন লড়াই চলল, শেষ পর্যন্ত নাগকে ভূপাতিত করল নিকিতা, নাগ মিনতি করতে লাগল:

'একেবারে প্রাণে মেরে ফেলো না, নিকিতা। সারা পৃথিবীতে তোমার আর আমার মতো শক্তি আর কারো নেই। চলো আমরা পৃথিবীটা দু'ভাগে ভাগ করে নিই। এক অংশে থাকবে তুমি, অন্য অংশে আমি।'

নিকিতা রাজি হয়ে বলল, 'বেশ, কিন্তু আগে সীমানা ঠিক করা চাই।'

নিকিতা তখন একটা তিনশ' পুদ ওজনের লাঙল বানিয়ে সেটা নাগের ঘাড়ে যুতে মাটি ফেড়ে দাগ দিতে লাগল। সে দাগ গেল কিয়েভ থেকে কাভ্স্প্রিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত।

নাগ বলল, 'কী এবার সারা পৃথিবীটা ভাগ হয়েছে তো?'

নিকিতা বলল, 'মাটি ভাগ হয়েছে বটে, এবার সমুদ্রটাও ভাগ করব, নয়ত কে জানে, তুই হয়ত বলবি আমি তোর জল নিয়ে নিচ্ছি!'

নাগ যখন মাঝ সমুদ্র অবধি গেছে তখন নিকিতা তাকে মেরে তার শরীরটা সমুদ্রে ডুবিয়ে দিল।

নিকিতার পুণ্য কাজ শেষ হল। কাজের জন্যে কিছু সে নিল না। বাড়ী ফিরে আবার সে চামড়ার কাজে লেগে গেল।

ইলিয়া মুরমেৎসের প্রথম অভিযান

অনেক অনেক বছর আগে মুরম সহরের কাছে, কারাচারোভো গ্রামে এক চাষী থাকত, তার নাম ইভান তিমোফেয়েভিচ্। বৌয়ের নাম ইয়েফ্রোসিনিয়া ইয়াকোভলেভনা। তাদের একটিমাত্র ছেলে, ইলিয়া।

ইলিয়া একদিন সাজগোজ করে মা-বাবাকে বলল:

'বাবা-মা শোনো, রাজধানী কিয়েভ নগরে যাব রাজা ভ্লাদিমিরের কাছে। ধর্মমতে জন্মভূমি রাশিয়ার সেবা করব। শত্রুর হাত থেকে রুশ মাটিকে বাঁচাব।'

বুড়ো বাপ ইভান তিমোফেয়েভিচ্ বলল:

'তোমার ভাল কাজে আমার আশীর্বাদ রইল, মন্দ কাজে নয়। সোনাদানার জন্যে নয়, লাভের আশায় নয়, রুশ দেশকে রক্ষা করবে ইমানের নামে, বীরের

গৌরবে। বিনা কারণে মানুষের রক্তপাত করো না; মায়ের চোখে জল ঝরিয়ো না; ভুলে যেও না তুমি চাষীর ছেলে, মাটির ছেলে।'

আভূমি কুর্নিশ করে ইলিয়া ঘোড়ায় লাগাম পরাতে চলে গেল। ঘোড়ার নাম ঝাঁকড়া-লোমো। ইলিয়া জিনের কাপড়টা ঘোড়ার পিঠে ফেলল, তার ওপর দিল আস্তর, তারপর সেই চেরকেসীয় জিনটা। তার বারোটি বন্ধনী রেশমের, আর তেররটা লোহার। শোভার জন্যে নয়, মজবুতির জন্যে।

ইলিয়ার ইচ্ছে হল নিজের শক্তিটা একবার পরীক্ষা করে দেখে।

ঘোড়া ছুটিয়ে ইলিয়া ওকা নদীর তীরে গেল। নদীর পাড়ের উঁচু পাহাড়টায় কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলে দিল জলের মধ্যে। সে পাহাড়ে নদীর খাত বন্ধ হয়ে গেল, নদীটাকে বাঁক নিতে হল অন্য পথে।

ইলিয়া এক টুকরো কালো রুটির ছাল ছিঁড়ে ওকা নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে বললে:

'ওকা, আমার মা! ইলিয়া মুরমেৎসকে খাইয়েছো, দাইয়েছো। তোমায় ধন্যবাদ!'

চলে যাবার আগে ইলিয়া জন্মভূমির এক মুঠো মাটি সঙ্গে নিল। তারপর ঘোড়ায় চড়ে চাবুকটা একবার সজোরে চালাল...

লোকে দেখল ইলিয়া ঘোড়ায় উঠছে। দেখতে পেল না কোথায় গেল। মাঠের মধ্যে জেগে উঠল শুধু একটা ধুলোর মেঘ।

ইলিয়ার চাবুক পড়ে আর ঝাঁকড়া-লোমো এক এক লাফে দেড় ভার্স্ট এগিয়ে যায়। যেখানে ঘোড়ার খুর মাটিতে ঠেকে সেখানেই জেগে ওঠে জলের ফোয়ারা। ইলিয়া একটা করে মস্ত ওক গাছ কেটে তোরণ বানিয়ে দেয় ফোয়ারার ওপর দিয়ে। তোরণের গায়ে খোদাই করে দেয়: "চাষীর ছেলে রুশী বগাতীর ইলিয়া ইভানভিচ এসেছিল এখানে।"

সেই ফোয়ারার ঝরণা আজও তোরণের তল দিয়ে বয়ে চলেছে। রাতের বেলা ভালুক যায় সেখানে ঠাণ্ডা জল খেতে। আর সেই জল খেয়ে খেয়ে তার গায়ে হয় বগাতীরের শক্তি।

এমনি করে ইলিয়া চলল কিয়েভ সহরের দিকে।

চেরনিগভ্ সহরের মধ্যে দিয়ে সিধে রাস্তা। ইলিয়া চলল সেই রাস্তা ধরে। চেরনিগভ সহরে আসতেই শোনে দেয়ালের কাছে ভীষণ গণ্ডগোল: হাজার হাজার তাতার বাহিনী সহর ঘেরাও করেছে। ঘোড়ার খুরের ধুলোয়, মুখের নিঃশ্বাসে সারা পৃথিবী আঁধার, সূর্য ঢাকা পড়েছে। মেঠো খরগোসেরও সাধ্যি নেই গলে যায়, ঝলমলে বাজপাখিরও ক্ষমতা নেই উড়ে যায়। সহরের ভিতর থেকে আসে কান্নার আওয়াজ, আর্তনাদ, সৎকারের ঘণ্টাধ্বনি। সহরের লোকজন সব পাথরের গির্জার মধ্যে ঢুকে দরজা আটকে বসে বসে কাঁদছে, প্রার্থনা করছে, আর মৃত্যুর জন্যে তৈরি হচ্ছে, কারণ চেরনিগভ সহরকে ঘেরাও করেছে তিনজন তাতার রাজা, এক একজনের চল্লিশ হাজার করে সৈন্য।

ইলিয়ার বুকে আগুন জ্বলে উঠল। ঝাঁকড়া-লোমোর রাশ টেনে একটা কাঁচা ওক গাছ শিকড়শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইলিয়া। বাড়ি মারে সে ওক গাছ দিয়ে, ঘোড়ার খুরে মাড়িয়ে দিয়ে যায় শত্রুদের। গাছটা এদিকে হাঁকায় অমনি পথ হয়ে যায়, ওদিকে হাঁকায় অমনি গলি। ইলিয়া ঘোড়া ছুটিয়ে গেল তিন রাজার কাছে। গিয়ে তাদের সোনালী ঝুঁটি ধরে বলল এই কথা:

'ধিক তোদের, তাতার রাজা! কী ভায়ারা, বন্দী করব নাকি মাথা কেটে ফেলব? বন্দী করব কিন্তু রাখব কোথায়? পথে বেরিয়েছি, ঘরে বসে নেই। আমার থলির রুটি নিজের জন্যে, নিষ্কর্মাদের জন্যে নয়। মাথা নেব — সেটায় বগাতীর ইলিয়া মুরমেৎসের গৌরব বাড়বে না। তাই পালা তোদের বাহিনীর এলাকায়, শত্রুমহলে, রাষ্ট্র করে দে, জন্মভূমি রাশিয়া জনশূন্য নয় — সে দেশে আছে মহাবল মহাবীর বগাতীররা, শত্রুরা যেন তা মনে রাখে।'

এই বলে ইলিয়া ঢুকল চেরনিগভ সহরের ভিতর। পাথরের গির্জায় যেখানে সবাই কাঁদছে, কোলাকুলি করছে, শেষ বিদায় নিচ্ছে সেখানে গিয়ে ইলিয়া বলল:

'নমস্কার চেরনিগভবাসী, পুরুষ তোমরা, কাঁদছো কেন, কোলাকুলি করছো, শেষ বিদায় নিচ্ছো?'

'না কেঁদে উপায় কী, তিনজন তাতার রাজা চল্লিশ হাজার করে সৈন্য নিয়ে আমাদের চেরনিগভ সহর ঘেরাও করেছে! মরার অপেক্ষায় আছি।'

'দুর্গের প্রাচীরে উঠে খোলা মাঠে শত্রুবাহিনীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো দেখি,' ইলিয়া বলল।

সকলে প্রাচীরের উপরে উঠে দেখে কী, শিলাবৃষ্টিতে খসে পড়া ফসলের মতো সারা ময়দান ভরে উঠেছে তাতার সৈন্যের মৃতদেহে।

এই দেখে চেরনিগভবাসী সকলে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে নুন আর রুটি, সোনা রুপো আর জড়োয়া কাপড় দিয়ে স্বাগত জানাল ইলিয়াকে।

'তরুণ বীর রুশ বগাতীর, কী তোমার কুল-বংশ, কে তোমার বাপ, কে তোমার মা? তোমার নাম কী? তুমি এসো আমাদের সর্দার হও। আমরা সকলে তোমার কথা মানব, সম্মান করব তোমায়, চর্ব্য-চোষ্য খাওয়াব। ধনে যশে উথলে উঠবে।'

ইলিয়া মুরমেৎস মাথা নাড়ল।

'চেরনিগভের ভালোমানুষেরা শোনো, আমি সাধারণ রুশী বগাতীর, মুরম সহরের কাছে কারাচারোভো গ্রাম, সেই গ্রামের চাষীর ছেলে। লাভের আশায় আমি তোমাদের উদ্ধার করিনি; সোনা রুপোর আমি পরোয়া করি না। রুশ জাতির সুন্দরী কুমারী, অসহায় শিশু আর বৃদ্ধা মায়েদের আমি উদ্ধার করেছি। আমি তোমাদের নেতা হতে চাইনে। আমার ধন আমার শক্তি আর আমার ব্রত রাশিয়ার সেবা, শত্রুর হাত থেকে রক্ষা তাকে করা।'

চেরনিগভবাসীরা তখন সকলে ইলিয়াকে অন্তত একটা দিন থেকে যেতে বলল। তাদের সঙ্গে ভোজ খেয়ে আনন্দ করে যাবার জন্যে অনুরোধ করল। কিন্তু ইলিয়া তাতেও রাজি হল না।

'আমার সময় নেই, ভালোমানুষেরা। রুশদেশ শত্রুর পীড়নে কাঁদছে, আমায় তাড়াতাড়ি গিয়ে যোগ দিতে হবে রাজা ভ্লাদিমিরের সঙ্গে, কাজে লাগতে হবে। পথে খাবার জন্যে আমায় বরঞ্চ কিছু রুটি দাও, তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে দাও ঝরণার জল, আর কিয়েভ যাবার সোজা পথটা দেখিয়ে দাও।'

চেরনিগভবাসী সকলেই ভাবনায় পড়ল, দুঃখ হল:

‘রুশ বগাতীর ইলিয়া মুরমেৎস, কী বলব বলো। কিয়েভ যাবার সোজা পথ ঢেকে গেছে ঘাসে। সে পথ দিয়ে ত্রিশবছর কেউ যায়নি...’

‘তার মানে?’

‘রাখমানের ছেলে, শিসে-ডাকাত সলভেই-এর হাতে সেই পথ। স্মোরোদিনা নদীর ধারে তিনটে ওক গাছের নয়টা ডালের ওপর সে বসে থাকে। সে যখন পাখির গলায় শিস দেয়, জন্তুর গলায় গর্জে ওঠে তখন সমস্ত গাছ মাটিতে নুয়ে পড়ে, ফুলের পাপড়ি খসে যায়, ঘাস যায় শুকিয়ে, আর প্রাণ হারিয়ে মানুষ ঘোড়া সব লুটিয়ে পড়ে। তুমি বরং ঘুর পথে যাও ইলিয়া। সোজা পথে কিয়েভ অবিশ্যি তিনশ’ ভার্স্ট, ঘুর পথে পুরো হাজার ভার্স্ট।’

ইলিয়া মুরমেৎস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে বলল:

‘শিসে-ডাকাত কিয়েভের পথ আটকে রাখবে, জন মানুষকে উৎপাত করবে আর আমি রুশ বীর ঘুর পথে কিয়েভ যাব, এ আমায় শোভা পায় না, এ আমার সম্মানে লাগে। আমি যাব সোজা রাস্তায়, অগম পথে।’

এই বলে ইলিয়া এক লাফে জিনে চড়ে বসল, ঝাঁকড়া-লোমোকে চাবুক লাগল, চেরনিগভবাসীরা দেখতে না দেখতেই নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল সে।

ইলিয়া মুরমেৎস
আর শিসে-ডাকাত সলভেই

বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল ইলিয়া মুরমেৎস। তার ঘোড়া ঝাঁকড়া-লোমো শিখর থেকে শিখরে লাফায়। নদী, হ্রদ পেরিয়ে যায়, টিলা পাহাড় ডিঙিয়ে যায়।

শেষকালে ইলিয়া এসে পৌঁছল ব্রিন্সক বনে। এবার দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়া। আর এগুনো যায় না। চারিদিকে জলা জমি পাঁকে ভরা। পেট অবধি ডুবে গেল ঘোড়া...

ইলিয়া লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ঘোড়াটাকে টেনে তুলে, ডান হাত দিয়ে ওক গাছগুলো শিকড়শুদ্ধ উপড়ে উপড়ে ফেলে এক কাঠের রাস্তা বানিয়ে ফেলল। জলার মধ্যে দিয়ে ত্রিশ ভার্স্ট লম্বা পথ। আজও ভালোমানুষেরা সে পথ ধরে যাতায়াত করে।

এই ভাবে ইলিয়া পেঁছিল স্মোরোদিনা নদীতে।

চওড়া নদী খরস্রোতা, পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে পড়ছে।

ঝাঁকড়া-লোমো ডাক ছাড়ল। তারপর লাফিয়ে ঘন বনের মাথা ছাড়িয়ে পেরিয়ে গেল নদী।

ওপারে তিন ওক গাছের নয় ডালের উপর বসে শিসে-ডাকাত সলভেই। সে গাছের কাছে কোনো বাজ ওড়ে না, জানোয়ার আসে না, সাপ এগোয় না। সবাই শিসে-ডাকাত সলভেইকে ভয় পায়, কে আর সেধে মরণ চাইবে...

ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ কানে যেতেই ওক গাছের মাথায় উঠে ভীষণ গলায় হাঁক দিল সলভেই:

'কোন শয়তান ঘোড়া হাঁকায়, আমার খাস গাছের পাশ দিয়ে যায়, শিসে-ডাকাত সলভেই-এর ঘুম ভাঙায়!'

তারপর যেই সলভেই পাখির গলায় শিস দিল, জন্তুর গলায় গর্জাল, সাপের মতো হিস্‌হিসিয়ে উঠল, অমনি সারা পৃথিবী কেঁপে উঠল, ওক গাছ টলতে লাগল, ফুলের পাপড়ি ঝরে গেল, নেতিয়ে পড়ল ঘাসগুলো। ঝাঁকড়া-লোমো হুমড়ি খেয়ে পড়ল হাঁটুর ওপর।

ইলিয়া কিন্তু অটল হয়ে বসে রইল। মাথার চুলের গোছাও নড়ল না। রেশমী চাবুকটা নিয়ে সে শুধু সজোরে বাড়ি মারল ঘোড়াটাকে।

'খড়ের বস্তা তুই! রুশ বগাতীরের ঘোড়া নস। কোন দিন বুঝি টুনি পাখির শিস শুনিসনি? হেলে সাপের হিস্‌হিসানি কানে যায়নি? এক্ষুণি উঠে দাঁড়া, নিয়ে চল আমায় সলভেই-এর বাসায়, নইলে আমি তোকে নেকড়ের মুখে ফেলে দেব।'

এই শুনে ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে একছুটে একেবারে সলভেই-এর বাসায়।

এত অবাক হয়ে গেল সলভেই, মাথা বার করলে বাসা থেকে।

এক মুহূর্ত দেরি না করে ইলিয়া তার ধনুক টেনে লোহার তীর ছুড়ল। তীরটা ছোটই বলতে হয়, ওজনে পুরো এক পুদ্।

টঙ্কার দিয়ে তীর ছুটল, সলভেই-এর ডান চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে এল। সলভেই তার বাসা থেকে গড়িয়ে পড়ল যেন এক আঁটি খড়। ইলিয়া তখন ওকে ধরে, চামড়ার ফিতে দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল বাঁ রেকাবের সঙ্গে।

সলভেই হাঁ করে তাকিয়ে রইল ইলিয়ার দিকে, মুখ দিয়ে কথা বেরয় না।

'হতভাগা ডাকাত, কী দেখছিস হাঁ করে? রুশ বগাতীরকে দেখিসনি কখনো?'

সলভেই ককিয়ে উঠল, 'হায় রে কপাল! শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি। আমার স্বাধীনতা বুঝি এবার গেল!'

ইলিয়া সোজা রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পেঁছিল সলভেই-এর বাড়ীতে। সে বাড়ীর উঠোনটাই সাত ভার্স্ট লম্বা, তাতে সাতটা খুঁটি। চারিপাশে লোহার বেড়া, প্রত্যেকটি লোহার খুঁটিতে লোহার চুড়ো, প্রত্যেকটি চুড়োয় একটি করে বগাতীরের কাটা মাথা। উঠোনের মাঝখানে একটা জমকালো শ্বেত পাথরের প্রাসাদ, তার সোনার অলিন্দ আগুনের মতো জ্বলছে।

সলভেই-এর মেয়ে বগাতীরের ঘোড়া দেখতে পেয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'দেখ দেখ, আমাদের বাবা সলভেই রাখমানভিচ বাড়ী ফিরছে একটা গেঁয়ো চাষীকে রেকাবে বেঁধে!'

সলভেই-এর বৌ জানলা দিয়ে মুখ বের করে দেখে দু'হাত ছুঁড়ে বলল:

'কী বলছিস বোকা কোথাকার! এ যে একটা গেঁয়ো চাষীই আসছে, তোরই বাবাকে রেকাবে বেঁধে নিয়ে!'

এই শুনে সলভেই-এর বড় মেয়ে পেল্‌কা দৌড়ে উঠোনে গিয়ে একটা নব্বুই পুদ্ ওজনের লোহার ডাণ্ডা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল ইলিয়ার দিকে।

কিন্তু বুদ্ধি করে ইলিয়া ডাণ্ডাটা লুফে নিয়ে ফের সেটাই ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারল। ডাণ্ডাটা গিয়ে সজোরে পেল্‌কার গায়ে লাগল। তক্ষুণি পড়ে মরে গেল পেল্‌কা।

সলভেই-এর বৌ ইলিয়ার পায়ে কেঁদে পড়ল।

'আমাদের সোনা রুপো মণিমুক্তো যা তোমার ঘোড়া বইতে পারে সব নাও বগাতীর, কেবল আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও।'

ইলিয়া উত্তর দিল:

'অসতের দান আমার চাই না। এ সব শিশুর কান্নায়, রুশীর রক্তে ভেজা, চাষীর অন্ন কেড়ে সম্পদ। ধরা পড়লে ডাকাত তখন বন্ধু। ছেড়ে দিলেই দুঃখের আর শেষ হবে না। আমি সলভেইকে নিয়ে কিয়েভ যাচ্ছি। সেখানেই রুটি পাব ক্‌ভাস খাব।'

ইলিয়া ঘোড়া ঘুরিয়ে ছোটাল কিয়েভের পথে, চুপ করে রইল সলভেই, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না।

কিয়েভ সহরে গিয়ে ইলিয়া এসে থামল একেবারে রাজবাড়ীতে, ভ্লাদিমিরের প্রাসাদে। ঘোড়াটাকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে, ডাকাতটাকে রেকাবের সঙ্গেই ঝুলিয়ে রেখে নিজে ঢুকল বৈঠকখানায়।

রাজা ভ্লাদিমির বসে আছেন টেবিলে। খানাপিনা চলেছে। রুশ বগাতীরের দল বসে আছে টেবিল ঘিরে। ইলিয়া ঢুকে কুর্নিশ করে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

'জয় হোক, মহারাজ ভ্লাদিমির, রাণী আপ্রাক্সিয়া! পথিক বীরকে বরণ করবেন কি?'

রক্ত-রবি ভ্লাদিমির জিজ্ঞেস করলেন:

'কোথা থেকে আসছো বীর, কী তোমার নাম? কী তোমার বংশ-কুল?'

'আমার নাম ইলিয়া। আসছি মুরম সহরের কাছ থেকে, কারাচারোভো গ্রামের চাষীর ছেলে। এসেছি আমি চেরনিগভ থেকে সোজা রাস্তা ধরে। আপনার কাছে ধরে এনেছি শিসে-ডাকাত সলভেইকে। আপনার প্রাসাদের

উঠোনেই সে রয়েছে, আমার ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা। একবার কি বাইরে এসে দেখবেন?'

এই কথা শুনে রাজা, রাণী, বগাতীরের দল সকলে টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ইলিয়ার পিছন পিছন ছুটে এসে দাঁড়াল উঠোনে ঝাঁকড়া-লোমো ঘোড়ার কাছে।

দেখে কী, এক আঁটি খড়ের মত রেকাব থেকে ঝুলছে ডাকাতটা। আর বাঁ চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখছে কিয়েভ সহর, তাকিয়ে দেখছে রাজার দিকে।

রাজা ভ্লাদিমির বললেন:

'কী রে ডাকাত, একবার পাখির গলায় শিস দে তো, জন্তুর গলায় গর্জন কর!'

শিসে-ডাকাত সলভেই কিন্তু মুখ ফিরিয়ে রইল, কথা শুনল না।

'তুমি আমায় বন্দী করোনি, হুকুম করা তোমার সাজে না।'

এই শুনে রাজা ভ্লাদিমির ইলিয়ার দিকে ফিরে বললেন:

'হুকুম করো ডাকাতকে, ইলিয়া ইভানভিচ।'

'বেশ মহারাজ, কিন্তু রাগ করবেন না। আমি আপনাকে আর রাণীকে ঢেকে রাখব আমার চাষীর কাফতান দিয়ে, কোনো ক্ষতি যেন না হয়। আর সলভেই রাখমানভিচ, তোকে যা বলা হয়েছে, কর।'

ডাকাত বলল, 'শিস আমি দিতে পারছি না। গলা শুকিয়ে গেছে।'

'আগে দেড় বালতি মিষ্টি মদ দাও শিসে-ডাকাতটাকে আর দেড় বালতি তেতো বিয়র, আর দেড় বালতি মধু, সঙ্গে খাওয়ার জন্যে কিছুটা গমের শাদা রুটিও দিও। তাহলে শিস দেবে, আমাদের সখ মেটাবে...'

সলভেইকে পানাহার করিয়ে শিস-দেওয়ার জন্যে তৈরি করা হল।

ইলিয়া বলল, 'কিন্তু ডাকাত, মনে রাখিস পুরো গলায় শিস দিস না, আধো গলায় শিস দিবি, আধো গলায় গর্জাবি। নয়ত মজা টের পাবি।'

সলভেই কিন্তু ইলিয়ার হুকুম মানল না। ওর মনে মনে ইচ্ছে সারা কিয়েভ সহর ধ্বংস করবে, রাজা রাণী, রুশ বগাতীর সকলকে মেরে ফেলবে। যত

জোর পারে শিস দিয়ে ভীষণ গর্জনে গর্জিয়ে প্রাণপণে হিস্‌হিসিয়ে উঠল সলভেই।

অমনি সে কী কাণ্ড!

বাড়ীর ছাদ টলে পড়ল, গাড়ি-বারান্দা খসে এল দেয়াল থেকে, জানলার কাঁচ ফেটে গেল, আস্তাবল ছেড়ে ছুটে পালাল ঘোড়াগুলো, বগাতীরের দল হুড়মুড়িয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিতে লাগল। স্বয়ং রাজা ভ্লাদিমির প্রায় আধমরা হয়ে টলতে লাগলেন, ইলিয়ার কাফতানের আড়ালে লুকলেন।

ইলিয়া রেগে লাল। বলল:

'আমি তোকে বলেছিলাম রাজা রাণীকে একটু আনন্দ দিতে, আর তুই ঘটালি সর্বনাশ। এবার দফা সারছি। মা বাবার চোখে জল ঝরানো, যুবতীদের বিধবা করা, ছোট ছেলেমেয়েদের অনাথ করা এবার তোর বন্ধ হবে, লুঠতরাজ তোর এবার শেষ।'

এই বলে ইলিয়া একটা ধারালো তলোয়ার দিয়ে সলভেই-এর মাথা কেটে ফেলল। শিসে-ডাকাতের জীবন গেল।

রাজা ভ্লাদিমির বললেন, 'অশেষ ধন্যবাদ তোমায়, ইলিয়া মুরমেৎস, এসো আমার অনুচরদলে, তুমি হবে আমার প্রধান বগাতীর, সব বগাতীরের ওপর তুমি কর্তা। কিয়েভ সহরেই থাকো তুমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।'

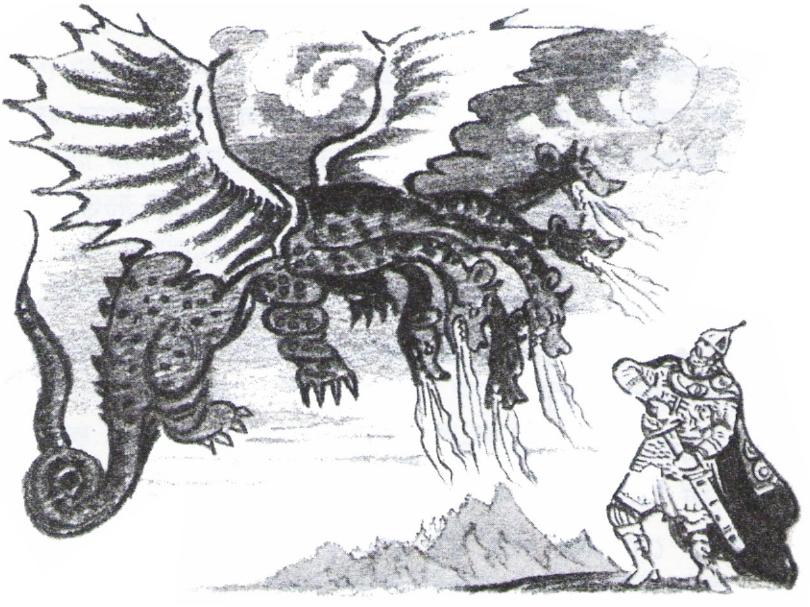

দব্রীন্যা নিকিতিচ আর জ্‌মেই গরীনীচ

কিয়েভের কাছেই এক বিধবা থাকত, তার নাম মামেল্‌ফা তিমোফেয়েভ্‌না। তার এক ছেলে, বগাতীর দব্রীন্যা। দব্রীন্যার মা তাকে খুব ভালবাসত। সারা কিয়েভ সহরশুদ্ধ লোক দব্রীন্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দেখতে সে যেমন লম্বা তেমনি সুঠাম, যেমন শিক্ষাদীক্ষা তেমনি লড়াইয়ে নির্ভীক, উৎসবে ব্যসনেও হাসিখুশি। গান বাঁধত, বাজনা বাজাত, রসিক মন্তব্য করত। স্বভাব ছিল শান্তশিষ্ট মিষ্টি, কখনো কাউকে রূঢ় কথা বলত না, কাউকে অপমান করত না। সেইজন্যে সবাই ওকে ডাকত সুশান্ত দব্রীন্যা বলে।

সেদিন ভীষণ গরম। গ্রীষ্মকাল। দব্রীন্যার ভীষণ ইচ্ছে হল নদীতে গিয়ে নাইবে। মায়ের কাছে গিয়ে বলল:

'মা গো, আমায় আজ পুচাই নদীর ঠাণ্ডা জলে নাইতে যেতে দাও না। গ্রীষ্মের গরমে পুড়ে যাচ্ছি।'

মামেল্‌ফা তিমোফেয়েভ্‌না ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ল। দব্রীন্যাকে বোঝাবার চেষ্টা করল:

'দব্রীন্যা শোনো, পুচাই নদীতে যেও না বাবা। সে নদী ভয়ঙ্করী, চণ্ডমূর্তি। নদীর প্রথম দরিয়ায় আগুন, মাঝ দরিয়ায় আগুনের ফুলকি আর শেষ দরিয়ায় কেবল ধোঁয়া।'

'বেশ, তবে অন্ততঃ পাড়ে যাই, হাওয়া খাব।'

মামেল্‌ফা তিমোফেয়েভ্‌না মত দিল।

বেড়ানোর পোষাকটা পরে, উ'চু গ্রীক টুপি মাথায় এ'টে, তীর, ধনুক, ধারালো তলোয়ার, চাবুকগাছা নিয়ে দব্রীন্যা তৈরী।

তারপর তাজা ঘোড়ায় চড়ে, বাচ্চা চাকরটাকে ডেকে নিয়ে রওনা দিল। একঘণ্টা যায়, দু'ঘণ্টা যায়, দব্রীন্যা চলেছে তো চলেছে। মাথার উপর গ্রীষ্মের সূর্য জ্বলছে। দব্রীন্যা মায়ের নিষেধ ভুলে গিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘোরালে পুচাই নদীর দিকে।

নদী থেকে ঠাণ্ডা আমেজ আসছিল।

দব্রীন্যা ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা বাচ্চা চাকরের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বললে:

'তুই এখানে থাক, ঘোড়াটার উপর নজর রাখিস।'

এই বলে তার জামাকাপড়, গ্রীক টুপি খুলে, অস্ত্রশস্ত্র সব ঘোড়ার পিঠে রেখে দব্রীন্যা ঝাঁপ মারল নদীতে।

দব্রীন্যা সাঁতার কাটে আর অবাক হয়:

"পুচাই নদী সম্বন্ধে কী যে বলে মা! নদীটা ভয়ঙ্করী কোথায়, বরঞ্চ একেবারে বর্ষার জলভরা ডোবার মত শান্ত।"

কিন্তু দব্রীন্যার কথা শেষ হতে না হতেই আকাশ হঠাৎ কালো করে এল। আকাশে মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, কিন্তু বাজের ডাক; ঝড় নেই, কিন্তু আগুন ঝলসায়...

দব্রীন্যা মাথা তুলে দেখে, নাগ ক্রমেই গরীনীচ তার দিকে উড়ে আসছে। সে এক ভয়াবহ নাগ। তিনটে মাথা, সাতটা লেজ, নাক দিয়ে আগুন বেরয়, কান দিয়ে ধোঁয়া। থাবাগুলোর তামা নখ চক্‌চক্ করছে।

দব্রীন্যাকে দেখে বজ্র গর্জনে হেঁকে উঠল নাগ:

'প্রাচীন লোকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল নিকিতার ছেলে দব্রীন্যার হাতেই নাকি আমার মৃত্যু। কিন্তু দেখছি দব্রীন্যাই আমার খপ্পরে পড়েছে। ইচ্ছে হলে এখন জ্যান্ত খেয়ে ফেলতে পারি, ইচ্ছে হলে আবার বন্দী করে গুহায় নিয়েও যেতে পারি। বন্দী রুশ আমার কাছে কম নয়। বাকি কেবল দব্রীন্যাই।'

এই শুনে দব্রীন্যা নরম গলায় বলে উঠল:

'থাম, হতভাগা নাগ, আগে দব্রীন্যাকে ধর, তারপর গর্ব করিস। দব্রীন্যা এখনও তোর হাতে পড়েনি।'

ভালো সাঁতার জানত দব্রীন্যা। এক ডুবে সে নদীর তলায় গিয়ে ডুব সাঁতার কাটতে লাগল। তারপর সাঁতরে একটা খাড়া পাড়ের কাছে গিয়ে, পাড় বেয়ে উঠে চট্‌পট্ ঘোড়ায় চেপে বসবে, কিন্তু কোথায় ঘোড়া? তার চিহ্নমাত্র নেই। নাগের গর্জন শুনে তার বাচ্চা চাকরটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, ঘোড়ায় উঠে একেবারে উধাও। অস্ত্রশস্ত্রও সব তারই সঙ্গে।

নাগের সঙ্গে লড়াই করার মতো কোনো হাতিয়ার নেই।

নাগ এদিকে ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে দব্রীন্যার উপর। আগুনের জ্বলন্ত ফুলকি ঝরিয়ে সে দব্রীন্যার ধবল দেহ পুড়িয়ে দেয়।

বগাতীরের প্রাণ কেঁপে উঠল।

তীরে সে তাকিয়ে দেখল, হাতে নেবার মতো কিছুই নেই। একটা লাঠি নেই, একটা পাথর নেই, খাড়া পাড়ের চারিদিকে কেবল হলুদ বালি। তার ওপর পড়ে আছে তার গ্রীক টুপিটা।

দব্রীন্যা টুপিটাই তুলে নিল, তাতে বালি ভরল কম নয়, বেশী নয় — পুরো পাঁচ পুদ্, তারপর সেটা ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারল জ্মেই গরীনীচের দিকে। জ্মেই গরীনীচের একটা মাথা গুঁড়িয়ে গেল।

দব্রীন্যা তখন হ্যাঁচকা টানে মাটিতে আছড়ে ফেলল নাগকে, বুকের ওপর হাঁটু চেপে বসে অন্য দুটো মাথাও কেটে ফেলতে যাবে...

এমন সময় নাগ কাকুতি-মিনতি করে বলে উঠল:

'দোহাই দব্রীন্যা, দোহাই বগাতীর, আমায় মেরে ফেলো না, এবারের মতো ছেড়ে দাও। তুমি যা বলবে তাই করব। তোমার কাছে এই শপথ করছি, তোমাদের সুবিপুল রাশিয়ায় কোনোদিন আর আসব না, কোনোদিন আর রুশীদের বন্দী করে নিয়ে যাব না। দোহাই দব্রীন্যা, প্রাণে আমায় মেরো না, আমার ছেলেপিলের অনিষ্ট করো না।'

নাগের চালাকিতে ভুলে গেল দব্রীন্যা, তার কথায় বিশ্বাস করে পাষণ্ডটাকে ছেড়ে দিল।

ছাড়া পেয়ে নাগটা মেঘের রাজ্যে উঠতে না উঠতেই সোজা চলল কিয়েভ সহরের দিকে, উড়ে এল রাজা ভ্লাদিমিরের বাগানে। সেই সময় রাজা ভ্লাদিমিরের ভাইঝি জাবাভা পুতিয়াতিশ্না বেড়াচ্ছিল বাগানে।

রাজকুমারীকে দেখতে পেয়ে তো নাগের মহা আনন্দ। মেঘের রাজ্য থেকে নেমে এসে তার তামার নখগুলো দিয়ে ছোঁ মেরে রাজকুমারীকে নিয়ে চলে গেল একেবারে সরোচিনস্ক পাহাড়ে।

এদিকে দব্রীন্যা তার চাকরকে খুঁজে পেয়ে বেড়াবার পোষাকটা পরছে, এমন সময় আকাশ কালি করে এল, বাজ পড়তে লাগল। দব্রীন্যা মাথা তুলে দেখে, জ্মেই গরীনীচ তার থাবার মধ্যে জাবাভা পুতিয়াতিশ্নাকে ধরে কিয়েভের দিক থেকে উড়ে আসছে।

ভারি মন খারাপ হয়ে গেল দব্রীন্যার, ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ল। বাড়ী ফিরে সে মন খারাপ করে চুপ করে বসে রইল একটা বেঞ্চিতে। একটি কথাও কইল না। মা জিজ্ঞেস করল:

'কী হয়েছে দব্রীন্যা? মন খারাপ কেন? কীসের দুঃখু সোনা?'

'দ্বঃখের কিছ্ব নেই, শোকের কিছ্ব নেই, শ্বধ্ব বাড়ীতে বসে থাকতে মন টিকছে না। কিয়েভে রাজা ভ্লাদিমিরের বাড়ীতে আজ এক মস্ত ভোজ আছে, সেখানে যাব।'

'না না বাছা, রাজবাড়ীতে যেও না। আমার মন বলছে অমঙ্গল হবে। আমাদের বাড়ীতেই বরং ভোজ লাগানো যাক।'

দব্রীন্যা মায়ের কথা শ্বনল না। সে চলল কিয়েভে, রাজা ভ্লাদিমিরের কাছে।

কিয়েভে পে'ৗছেই দব্রীন্যা এসে দাঁড়াল রাজার ঘরে। খাবারের ভারে টেবিল ভাঙে ভাঙে, পিপে ভরতি মিষ্টি মধ্ব, কিন্তু অতিথিরা কেউ কিছ্ব ম্বখে দিচ্ছে না, মাথা নীচু করে বসে আছে। আর ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন রাজা, কাউকে খেতে ডাকছেন না। রাণী ম্বখ ঢেকে বসে আছেন। অভ্যাগতদের দিকে চাইছেন না।

রাজা ভ্লাদিমির হঠাৎ বললেন:

'আদরের অতিথিদল, এই ভোজে আজ আনন্দ নেই। রাণীর মনে ভারি শোক, আমার মনেও দ্বঃখ। ম্বখপোড়া জ্মেই গরীনীচ আমাদের আদরের ভাইঝি, তর্বণী জাবাভা প্বতিয়াতিশ্নাকে ধরে নিয়ে গেছে। তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে সরোচিন্স্ক পাহাড়ে গিয়ে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে আনতে পারো?'

কিন্তু কোথায় কী? অতিথিরা এ ওর পেছনে ল্বকোয়, লম্বারা মাঝারিদের পিছনে, মাঝারিরা বে'টেদের পিছনে আর বে'টেরা ম্বখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল।

হঠাৎ তর্বণ বগাতীর আলিওশা পপোভিচ টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে:

'শ্বন্বন রাজা রক্ত-রবি! কাল আমি খোলা মাঠে বেড়াচ্ছিল্বম, দব্রীন্যাকে দেখেছিল্বম প্বচাই নদীর ধারে। জ্মেই গরীনীচের সঙ্গে কী তার ভাব! জ্মেই গরীনীচকে ছোট ভাই বলে সে ডাকছিল। দব্রীন্যাকেই পাঠান নাগের

গুহায়, সে বিনা যুদ্ধেই আপনার আদরের ভাইঝিকে চেয়ে নেবে তার পাতানো ভাইয়ের কাছ থেকে।'

রাজা ভ্লাদিমির রেগে উঠলেন:

'এই যখন ব্যাপার তখন দব্রীন্যা, ঘোড়া ছুটিয়ে যাও সরোচিন্স্ক পাহাড়ে। সেখানে গিয়ে আমার আদরের ভাইঝিকে এনে দাও, নয়ত তোমার গর্দান যাবে।'

দব্রীন্যা তার উ'চু মাথা নীচু করে একটিও কথা না বলে টেবিল ছেড়ে উঠে এল, ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এল বাড়ী।

তার মা দব্রীন্যাকে বরণ করতে এসে দেখে সে দব্রীন্যা আর নেই।

'কী হয়েছে দব্রীন্যা, কী ঘটেছে, বাছা আমার? কী হয়েছে নেমন্তন্ন বাড়ীতে? অপমান করেছে কেউ? মদের পেয়ালা দিতে ভুলে গেছে, ভালো আসনে বসায়নি?'

'না মা, অপমান করেনি, পেয়ালাও বাদ পড়েনি, আসনও ছিল মানমতো, মর্যাদামতো।'

'তবে অমন করে মুখ নীচু করেছো কেন?'

'রাজা ভ্লাদিমির এক কঠিন কাজের ভার দিয়েছেন। জাবাভা পুতিয়াতিশ্নাকে জ্মেই গরীনীচ ধরে নিয়ে গিয়ে সরোচিন্স্ক পাহাড়ে রেখে দিয়েছে। গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনতে হবে আমায়।'

মামেল্ফা তিমোফেয়েভ্নার ভীষণ ভয় হল। কিন্তু দুঃখ করল না সে, চোখের জল ফেলল না। বরং কাজের কথা ভাবতে লাগল।

'এবার শুতে যাও বাছা। ঘুমিয়ে জিরিয়ে গায়ে বল এনো। রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে, কাল সকালে পরামর্শ করা যাবে।'

শুল দব্রীন্যা, ঘুময়। নাক ডাকায় যেন জলপ্রপাতের গর্জন।

কিন্তু মামেল্ফা তিমোফেয়েভনা শুল না, বেঞ্চিতে বসে বসে সারারাত ধরে সে সাতরঙা রেশম দিয়ে সাতগুছি চাবুক বানিয়ে চলল।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সে তার ছেলেকে জাগিয়ে দিয়ে বলল:

'ওঠো ছেলে, উঠে পড়ো। সাজ করো, সজ্জা করো, চলে যাও পুরনো আস্তাবলে। দেখবে তিন নম্বর খোঁয়াড়ের দরজাটা খোলে না। অর্ধেকটা চাপা পড়ে গেছে ময়লার তলায়। কাঁধ লাগিয়ো দব্রীন্যা, দরজা খুলো। দেখবে খোঁয়াড়ের মধ্যে তোমার দাদুর ঘোড়া বুর্কা। পনেরো বছর ধরে ঘোড়াটা ওই খোঁয়াড়ে এক হাঁটু ময়লার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটাকে ভাল করে দলাই-মলাই করে, দানাপানি দিয়ে নিয়ে এসো গাড়ি-বারান্দার কাছে।'

দব্রীন্যা আস্তাবলে গিয়ে দরজা ভেঙে ঢুকে বুর্কাকে নিয়ে এল গাড়ি-বারান্দার কাছে। তারপর লাগাম পরাতে লাগল। প্রথমে ঘোড়ার পিঠে জিনের কাপড় পাতল, তার উপর দিল একটা পশমী আস্তর, তার ওপর চাপাল দামী রেশমের নক্সা-তোলা সোনা-বসানো চেরকেসীয় জিন, বারো গুছি রেশম দিয়ে বাঁধল, সোনার লাগাম পরিয়ে দিল। মামেল্ফা তিমোফেয়েভ্না বেরিয়ে এসে হাতে দিল সেই সাতগুছি চাবুকটা, বলল:

'তুমি যখন সরোচিন্স্ক পাহাড়ে পৌঁছবে, জ্মেই গরীনীচ তখন বাড়ী থাকবে না। ঘোড়া ছুটিয়ে ঢুকে যেয়ো নাগের গুহায়, নাগশিশুদের খুরের চাপে দলে দিয়ো। ওরা তখন বুর্কার পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাবে, তুমি এই চাবুক তুলে বুর্কার দু'কানের মাঝখানে ঘা মারবে। লাফাতে থাকবে বুর্কা, পা ঝেড়ে সবকটাকে মাটিতে ফেলে পিষে মেরে ফেলবে।'

গাছ ভেঙে পড়ল ডালটি, ডাল খসে ফলটি। মায়ের বুক থেকে খসে রক্তঝরা রণে চলল ছেলে।

দিন যায় যেন বৃষ্টির ধারা, সপ্তাহ যায় যেন নদীর স্রোত। চলেছে দব্রীন্যা — আকাশে রাঙা রবি, চলেছে দব্রীন্যা — আকাশে ফুটফুটে চাঁদ, চলতে চলতে এসে পৌঁছল সরোচিন্স্ক পাহাড়ে।

সে পাহাড়ে নাগের গুহায় ছানাপোনায় কিলবিল। বুর্কার পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায় তারা, খুরের গোড়ায় দাঁত বসায়। দৌড়াতে পারে না বুর্কা, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। দব্রীন্যার তখন মায়ের কথা মনে পড়ল, সাতগুছি রেশমী চাবুক দিয়ে বুর্কার দু'কানের মাঝখানে ঘা মারতে লাগল। বলে:

'লাফিয়ে ওঠো বুর্কা, ঝাঁপিয়ে ওঠো, নাগশিশুদের ঝেড়ে ফেলো পা থেকে!'

চাবুক খেয়ে বুর্কার শক্তি বাড়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে সে, ক্রোশ পেরিয়ে পাথর নুড়ি ছিটকে যায়, পা থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে নাগশিশুদের। খুরে দিয়ে চাঁট মারে, দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, দলে পিষে দিল সবকটিকে।

দব্রীন্যা তখন বুর্কার পিঠ থেকে নামল। ডান হাতে তার ধারালো তলোয়ার, বাঁ হাতে বগাতীরের মুগুর। দব্রীন্যা চলল নাগের বাসার দিকে এগিয়ে।

এক পা সবে এগিয়েছে হঠাৎ আকাশ কালি করে এল, বাজ ডাকতে লাগল। উড়ে আসে জ্মেই গরীনীচ, তামার থাবায় মরা মানুষ, মুখ দিয়ে আগুন বেরয়, কান দিয়ে ধোঁয়া, তামার নখ ঝলসাচ্ছে আগুনের মতো...

দব্রীন্যাকে দেখে জ্মেই গরীনীচ মৃত দেহটা মাটিতে ফেলে বাজখাঁই গলায় হেঁকে বলল:

'কেন প্রতিজ্ঞা ভাঙলি দব্রীন্যা, কেন মেরেছিস আমার বাচ্চাদের?'

'বটে রে পাষণ্ড নাগ, কথা রাখিনি, শপথ ভেঙেছি, সে কি আমি? কেন তুই কিয়েভে গিয়েছিলি? কেন জাবাভা পুতিয়াতিশ্নাকে নিয়ে এসেছিস? বিনা যুদ্ধে রাজকুমারীকে ফিরিয়ে দে। তবেই তোকে মাপ করব।'

'দেব না জাবাভা পুতিয়াতিশ্নাকে। তাকে খাব, তোকেও খাব, বন্দী করে আনব সমস্ত রুশকে।'

রাগে জ্বলে উঠল দব্রীন্যা, শুরু হয়ে গেল নির্মম লড়াই।

শিলাপাথর ছিটকে যায়, শিকড়শুদ্ধ উলটে পড়ে ওক গাছ, এক হাত করে ঘাস ডেবে যায় মাটির মধ্যে...

তিনদিন তিনরাত্তির লড়াই চলল। দব্রীন্যা হারে হারে, নাগ তাকে ছুড়ে দেয়, আছড়ে ফেলে... হঠাৎ দব্রীন্যার মনে পড়ল চাবুকটার কথা। চাবুকটা নিয়েই সে নাগের দু'কানের মাঝখানে লাগাল ঘা। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে জ্মেই গরীনীচ আর দব্রীন্যা তাকে বাঁ হাতে মাটিতে চেপে ধরে, ডান হাতে চাবুক মারে। রেশমী চাবুক দিয়ে মেরে ঘোড়া ঠাণ্ডা করার মতো ঠাণ্ডা করল তাকে, সবকটা মাথা কেটে ফেলল।

গলগল করে নাগের কালো রক্ত বেরিয়ে এসে পূব পশ্চিম গড়িয়ে গেল, কোমর অবধি ডুবে গেল দব্রীন্যা।

তিনদিন তিনরাত কালো রক্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল দব্রীন্যা। পাদুটো তার অসাড় হয়ে গেল, বুকে জমল ঠান্ডা। নাগের রক্ত শুষে নিতে চায় না রাশিয়ার মাটি।

দব্রীন্যা দেখল তার কাল ঘনিয়ে আসছে। তখন সে তার সাতগুছি রেশমী চাবুক বার করে মারতে লাগল মাটির ওপর।

'মা ধরণী, দ্বিধা হও, নাগের রক্ত শুষে নাও।'

কাঁচা মাটি দ্বিধা হল, নাগের রক্ত শুষে নিল।

দব্রীন্যা একটু জিরিয়ে নিয়ে, হাতমুখ ধুয়ে, বগাতীরের বর্মটি ঘষে মেজে এগোলে নাগের গুহার দিকে। সারা গুহায় তামার দরজা জোড়া, লোহার খিলে আঁটা, সোনার তালায় বন্ধ।

দব্রীন্যা তালা খুলে, খিল দরজা ভেঙে ঢুকল প্রথম গুহার ভিতরে। চল্লিশ দেশ, চল্লিশ রাজ্যের জার আর জারপুত্র, রাজা আর রাজপুত্র সেখানে। আর কত যে সাধারণ যোদ্ধা তার সংখ্যা করা যায় না।

দব্রীন্যা বলল:

'বিদেশের জার, বিভুঁইয়ের রাজা, আর তোমরা, সাধারণ যোদ্ধারা সব শোনো, খোলা আলোয় বেরিয়ে এসো, ফিরে যাও যে যার দেশে। আর রুশ বগাতীরকে ভুলো না। সে না থাকলে তোমরা চিরকাল এই নাগের কাছে বন্দী হয়ে থাকতে।'

মুক্তি পেয়ে দুনিয়ায় বেরিয়ে এল সবাই, দব্রীন্যাকে অভিবাদন করে বলল:

'রুশদেশের বগাতীর, চিরকাল তোমার কথা মনে রাখব!'

দব্রীন্যা এগিয়ে চলে। একটার পর একটা গুহা খোলে আর বন্দীদের মুক্ত করে দেয়। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, শিশু, বালক, রুশদেশী পরদেশী — সবাই বেরিয়ে আসে, কিন্তু জাবাভা পুতিয়াতিশ্না‌র আর খোঁজ নেই।

দব্রীন্যা এগারোটা গুহা পেরিয়ে গেল। একেবারে শেষের গুহায় এসে দেখে — জাবাভা পুতিয়াতিশ্না: হাতদুটো তার সোনার শিকলে বাঁধা, স্যাঁৎসেঁতে দেওয়াল থেকে সে ঝুলছে। দব্রীন্যা শিকল ভেঙে ফেলে তাকে দেওয়াল থেকে নামিয়ে নিল। তারপর কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল খোলা আলোয়।

জাবাভা পুতিয়াতিশ্না দাঁড়াতে যায়, পা কাঁপে, সূর্যের আলোয় চোখ বোজে। দব্রীন্যাকে চেয়ে দেখে না। দব্রীন্যা তখন তাকে ঘাসের উপর শুইয়ে দিয়ে খাওয়ালে, দাওয়ালে। তারপর তাকে নিজের জোব্বা দিয়ে ঢেকে নিজেও শুয়ে পড়ল।

আকাশের সূর্য পাটে বসল। দব্রীন্যা জেগে উঠে, বুর্কার পিঠে জিন চাপিয়ে, রাজকন্যার ঘুম ভাঙাল। তারপর রাজকন্যা জাবাভাকে সামনে বসিয়ে রওনা হল ঘোড়ার পিঠে। চারপাশে তার লোকের মেলা। গুণে আর শেষ করা যায় না। আভূমি মাথা নুইয়ে সবাই তারা দব্রীন্যাকে ধন্যবাদ জানায়, যে যার দেশের পথ ধরে।

আর দব্রীন্যা জাবাভা পুতিয়াতিশ্নাকে নিয়ে হলদে স্তেপের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল কিয়েভ সহরের দিকে।

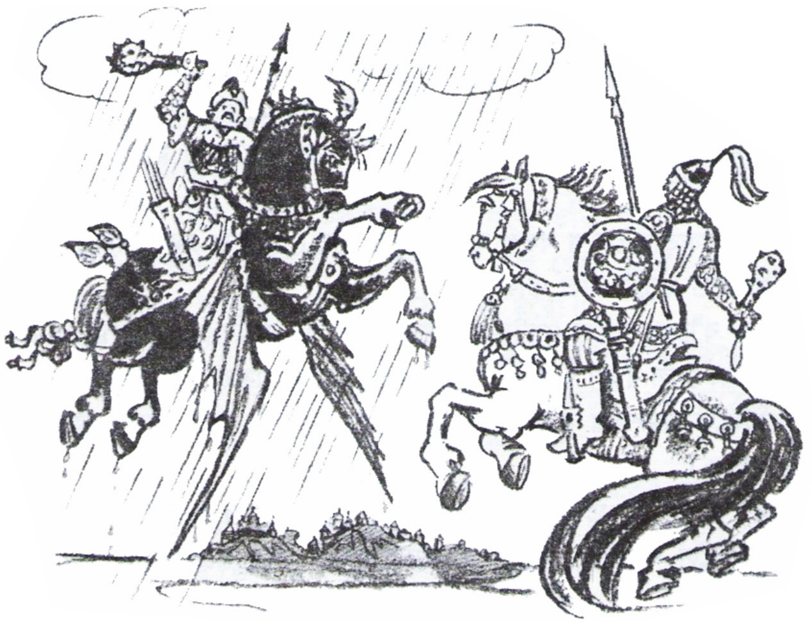

আলিওশা পপোভিচ

আকাশে সে দিন প্রতিপদের রূপোলী চাঁদ, আর মাটিতে গির্জার বুড়ো পুরোহিত লেওন্তির ঘরে জন্ম নিল এক পরাক্রান্ত বীর বগাতীর। নাম দেওয়া হল আলিওশা পপোভিচ। সুন্দর নামটি। খেয়ে দেয়ে মানুষ হয় আলিওশা, অন্যের যেখানে এক সপ্তাহ, আলিওশা তা বেড়ে ওঠে এক দিনেই, অন্যের যেখানে বছর, আলিওশার সেখানে এক সপ্তাহ।

হাঁটাহাঁটি করে আলিওশা, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলে বেড়ায়। কিন্তু আলিওশা যেই কারও হাত ধরে, হাত যায় ভেঙে, যেই কারো পা ছোঁয়, পা যায় মচকে।

আলিওশা যখন জোয়ান তখন বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে সে আশীর্বাদ চাইল খোলা মাঠে বেরবে। বাবা বলল:

'শোনো আলিওশা, খোলা মাঠে যাবে, তোমার চেয়ে ঢের বেশী গায়ে জোর রাখে এমন সব লোক সেখানে আছে। তাই পারানের ছেলে মারীশকোকে সঙ্গে নিয়ো।'

তেজী ঘোড়ায় চেপে বসল তরুণ দুই বীর। ধুলোর মেঘ আকাশে উড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল তারা।

তরুণ বীরেরা এসে পৌঁছল কিয়েভ সহরে। আলিওশা পপোভিচ সেখান থেকে সোজা গেল রাজা ভ্লাদিমিরের শ্বেতপাথরের প্রাসাদে। শাস্ত্রমতে ক্রুশ করল সে, বিধিমতে নমস্কার করল চারদিকে, আর বিশেষ করে কুর্নিশ করল রাজা ভ্লাদিমিরকে।

রাজা ভ্লাদিমির তখন এগিয়ে এসে তরুণ বীরদের স্বাগত জানালেন, ওক কাঠের টেবিলে বসালেন, তরুণ বীরদের ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে খবরাখবর নিতে লাগলেন। তরুণ বীরেরা ভোজন করল স্বাদু ভোজ্য, পান করল মদির সুরা। রাজা ভ্লাদিমির জিজ্ঞেস তখন করলেন:

'কারা তোমরা তরুণ বীর? দুঃসাহসী বগাতীর, নাকি পথচলতি পথিক, সুখের পায়রা?'

আলিওশা জবাব দিল:

'গির্জার বুড়ো পুরোহিত লেওন্তির ছেলে আমি, আলিওশা পপোভিচ। আর সঙ্গী আমার পারানের ছেলে মারীশকো।'

খাওয়া দাওয়ার পর আলিওশা পপোভিচ ইঁটের চুল্লীর উপর শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। মারীশকো বসে রইল টেবিলের সামনেই।

এই সময় রাজা ভ্লাদিমিরের কাছে এল এক নাগপুত্র বগাতীর তুগারিন। এল সে শ্বেতপাথরের কক্ষে রাজা ভ্লাদিমিরের কাছে। তার বাঁ পাটা তখনো চৌকাঠে আর ডান পা গিয়ে পড়ল ওক কাঠের টেবিলের কাছে। গপগপ করে সে গেলে, চোঁচোঁ করে মদ টানে, রাজার মহিষীকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, স্বয়ং রাজা ভ্লাদিমিরকে ঠাট্টা করে, গালি দেয়। এ গালে এক, ও গালে এক — আস্ত

রুটি ঠেসে, একটা আস্ত রাজহাঁস জিভ দিয়ে সাপটে, মস্ত এক পিঠে মুখে পুরে এক গরাসে গিলে নিল সবটা। ইঁটের চুল্লীর উপর থেকে শুয়ে শুয়ে আলিওশা নাগপুত্র তুগারিনকে বলল এই কথা:

'গির্জার পুরোহিত আমার বাবা লেওন্তির ছিল এক পেটুকচাঁদ, ছিল একটা গরু। শুঁড়ীখানায় গিয়ে গিয়ে তলানিসমেত পিপে ভর্তি বিয়র গিলত। গেল গরুটা, গেল পেটুকচাঁদ দীঘিতে। দীঘির সব জল খেয়ে নিল। পেট ফেটেও মরল অমনি। তুমিও তুগারিন টেবিলেই ফেটে না মরো।'

এই কথা শুনে তুগারিন গেল চটে। তার দামাস্ক ইস্পাতের ছোরাটা ছুঁড়ে মারল আলিওশার দিকে, কিন্তু আলিওশা ছিল খুব চটপটে. ওক কাঠের খুঁটির পিছনে আড়াল নিল। আলিওশা তখন বলল এই কথা:

'ধন্যবাদ বগাতীর, নাগপুত্র তুগারিন! দামাস্ক ইস্পাতের ছোরাটা দিলে বটে। তোমার ধবল বুক আমি চিরে দেব, তোমার উজল নয়ন নিভিয়ে দেব।'

এই সময় পারানের ছেলে মারীশকো টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তুগারিনকে জাপটে ধরে আছড়ে ফেলল শ্বেতপাথরের দেয়ালে, ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল জানলার কাঁচ।

আলিওশাকে বলল মারীশকো:

'দামাস্ক ইস্পাতের ছোরাটা আলিওশা আমাকেই দাও, নাগপুত্র তুগারিনের ধবল বুক চিরে দিই, উজল নয়ন নিভিয়ে দিই।'

কিন্তু আলিওশা উত্তর দিল:

'শ্বেতপাথরের পুরীটাকে নোংরা করো না মারীশকো, ওকে ছেড়ে দাও খোলা মাঠে, সেখানে আর যাবে কোথায়? কাল খোলা মাঠে ওর সঙ্গে মোকাবিলা হবে।'

পরদিন ভোর ভোর, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উঠল পারানের ছেলে মারীশকো, তেজী ঘোড়াদুটোকে নিয়ে গেল খর নদীতে জল খাওয়াতে। গিয়ে দেখে তুগারিন আকাশের নীচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর আলিওশা পপোভিচকে খোলা মাঠে মোকাবিলার জন্যে ডাকছে। পারানের ছেলে মারীশকো ফিরে এল আলিওশার কাছে:

'ভগবান তোমার বিচার করবেন আলিওশা, দামাস্ক ইস্পাতের ছোরাটা দিলে না, তাহলে ওর ধবল বুক চিরে দিতাম, উজ্জল নয়ন নিভিয়ে দিতাম। এখন আর ওর কী করবে, আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে!'

আলিওশা তার তেজী ঘোড়া বের করে চেরকেসীয় জিন চাপাল। সে জিনটার বারোটা রেশমের বন্ধনী, সে বন্ধনী শোভার জন্যে নয়, মজবুতির জন্যে। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে খোলা মাঠে গিয়ে দেখে, নাগপুত্র তুগারিন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। আলিওশা আকাশের দিকে তাকায়, বাজডাকা মেঘকে ডেকে বলে, জল ঢেলে তুগারিনের ডানা যেন ভিজিয়ে দেয়।

অমনি কালো মেঘ উড়ে এল, বৃষ্টি ঢেলে তুগারিনের ঘোড়ার পাখা দিল ভিজিয়ে। ভেজা মাটিতে পড়ল তুগারিন, খোলা মাঠের উপর দিয়ে ঘোড়া হাঁকাল।

ধাক্কা লাগল যেন পাহাড়ে পাহাড়ে। আলিওশা পপোভিচের সঙ্গে তুগারিনের বেধে গেল যুদ্ধ। গদা হাঁকাল তারা, কিন্তু ভেঙে গেল গদা। তুলে নিল বল্লম, বল্লম গেল বেঁকে। তারপর তলোয়ার, তলোয়ারের ধার গেল ভোঁতা হয়ে। হঠাৎ আলিওশা টাল সামলাতে না পেরে খড়ের আঁটির মতো জিনের উপর থেকে পড়ে গেল গড়িয়ে। তুগারিনের উল্লাস আর ধরে না, আলিওশাকে মারতে যাবে, কিন্তু আলিওশা ছিল ভারি চটপটে। চট্ করে সে তুগারিনের ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে ঢুকে, উল্টো দিক দিয়ে বেরিয়ে এসে, দামাস্ক ইস্পাতের ছোরা দিয়ে তুগারিনের ডান বুকে বসিয়ে দিল। ধাক্কা দিয়ে তুগারিনকে ঘোড়াটা থেকে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠল আলিওশা:

'নাগপুত্র তুগারিন, দামাস্ক ইস্পাতের ছোরার জন্যে ধন্যবাদ। এইবার তোমার ধবল বুক চিরে দেব, উজ্জল নয়ন নিভিয়ে দেব।'

এই বলে তুগারিনের তাজা মাথা কেটে ফেলল আলিওশা, কেটে নিয়ে গেল রাজা ভ্লাদিমিরের কাছে। ঘোড়ার পিঠে আলিওশা চলে আর খেলা করে মাথাটা নিয়ে। একবার করে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে ফের তাকে লুফে নেয় বল্লমের ডগায়। রাজা ভ্লাদিমির তা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন।

'আসছে তুগারিন, আলিওশার তাজা মাথা নিয়ে আসছে। এবার ও আমাদের সারা রাজ্য গোলাম করে রাখবে।'

পারানের ছেলে মারীশকো বলে উঠল:

'রক্ত-রবি ভ্লাদিমির, কিয়েভ-পতি, দুঃখ করবেন না। যমের অরুচি ঐ তুগারিন যদি না উড়ে মাটিতে ঘোড়া চালায়, তাহলে ওর তাজা মাথাটা দামাস্ক ইস্পাতের বল্লমের ডগায় গেঁথে নিয়ে আসব। দুঃখ করবেন না, রাজা ভ্লাদিমির।'

মারীশকো তখন তার দূরবীন দিয়ে দেখে — আলিওশা পপোভিচ। বললে:

'দেখছি আমি বগাতীরের বিভঙ্গ, তরুণ বীরের রঙ্গ! খাড়া হয়ে বসেছে ঘোড়ায়, মুণ্ডু নিয়ে সে খেলছে, ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিচ্ছে বল্লমের ডগায়। এ সেই যমের অরুচি তুগারিন নয়, মহারাজ, এ আসছে আলিওশা পপোভিচ, নাগপুত্র তুগারিনের মুণ্ডু নিয়ে আসছে সে।'

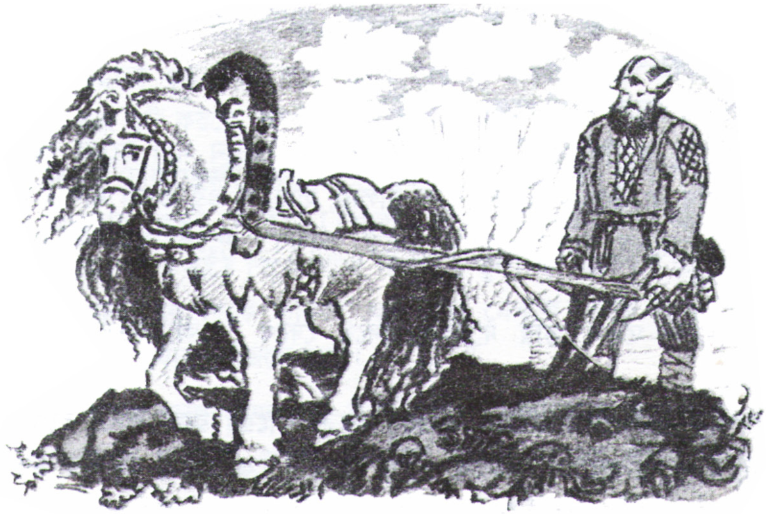

মিকুলা সেল্যানিনভিচ

সাত সকালে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভল্‌গা বেরল সওদাগরী সহর গুর্‌চেভেৎস আর অরেহভেৎস থেকে ভেট নজরানা আদায় করতে।

তেজী বাদামী ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করল সৈন্যসামন্তের দল। খোলা মাঠে ফাঁকা ডাঙায় পেঁছিতে কানে এল হাল দেবার শব্দ। হাল দিচ্ছে চাষী, মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে। তার লাঙলের ফালের মুখে পাথর পড়ে শব্দ তুলছে। মনে হল চাষী যেন কাছেই কোথাও কাজ করছে।

বীররা চলল চাষীর খোঁজে: দিন গিয়ে রাত হয়, কিন্তু চাষীর দেখা মিলল না। শিসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, লাঙলের ক্যাঁচকোঁচ, পাথরের ধুপধাপ — সবই কানে আসছে, চাষীকে কিন্তু আর দেখা যায় না।

পরদিন আবার তারা ঘোড়া ছোটাল, সন্ধে পর্যন্ত এল, তবু চাষীর দেখা মিলল না। অথচ শিসের আওয়াজ আর লাঙলের ক্যাঁচকোঁচ, পাথরের ধুপধাপ সবই শোনা যাচ্ছে।

অবশেষে তৃতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে ভল্‌গা আর তার লোকজন পৌঁছল চাষীর কাছে। লাঙল দিচ্ছে চাষী, তাড়া দিচ্ছে, হেটহেট করছে ঘোড়াকে, ফালের দাগ পড়ছে যেন এক একটা গভীর গড়খাই। বিরাট বিরাট ওক গাছ উপড়ে তুলছে, বড় বড় পাথরের চাঁই পাশে ছুঁড়ে ফেলছে। দুলছে শুধু মাথার কোঁকড়া চুল, রেশমের মতো লুটিয়ে পড়ছে ঘাড়ে।

চাষীর ঘোড়া কিন্তু খুবই সাধারণ জাতের। লাঙলটা মেপল কাঠের, দড়িগুলো রেশমের। চাষীকে দেখে অবাক হয়ে গেল ভল্‌গা, অভিবাদন করে বলল:

'কুশল হোক সুজন, চাষ করছো?'

'কুশল হোক ভলগা ভ্‌সেস্লাভিয়েভিচ, চলেছো কোথায়?'

'গুর্‌চেভেৎস আর অরেহভেৎস সহরে চলেছি, সওদাগরদের কাছ থেকে ভেট নজরানা আদায় করব।'

'এই দুই সহরের সওদাগররা একেবারে ডাকাত। গরিব চাষীদের ওরা চুষে খায়, রাস্তা দিয়ে গেলে কর আদায় করে। আমি একবার নুন কিনতে গিয়েছিলুম। এক এক বস্তায় একশ' পুদ, তিন বস্তা নুন কিনে আমার ছেয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বাড়ী ফিরছি। সওদাগরেরা সব আমায় ঘিরে ধরল। পথ কর দিতে হবে। যত দিই, তত চায়। রাগ হয়ে গেল আমার। ক্ষেপে গিয়ে শোধ মেটালাম এই রেশমের চাবুক কষে। যারা দাঁড়িয়েছিল বসে পড়ল, আর যারা বসেছিল তারা ধরাশায়ী।'

শুনে অবাক হয়ে গেল ভল্‌গা। মাথা নুইয়ে বলল:

'ধন্যি চাষী তুমি, মহাবীর বগাতীর। চলো আমার সঙ্গী হবে।'

'তা বেশ, যাব ভল্‌গা ভ্‌সেস্লাভিয়েভিচ, ওদের একটু সমঝে দেওয়া দরকার, চাষীদের সঙ্গে যেন দুর্ব্যবহার করতে না যায়।'

এই বলে চাষী লাঙল থেকে রেশমের দড়ি খুলে নিয়ে, ছেয়ে ঘোড়ার কাঁধ থেকে জোয়াল নামিয়ে চেপে বসল, যাত্রা করল।

প্রায় অর্ধেক পথ ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে বীরেরা, হঠাৎ ভল্‌গা ভ্‌সেস্লাভিয়েভিচকে চাষী বলল:

'এই রে, একটা ভুল হয়ে গেছে ভল্‌গা, খোলা মাঠে লাঙলটা ফেলে এসেছি। তোমার বীর অনুচরদের পাঠিয়ে দাও। লাঙলটা টেনে তুলে কাদা মাটি ঝেড়েঝুড়ে, যেন ওটা গাছের ঝোপে রেখে আসে।'

ভল্‌গা দলের তিনজনকে পাঠিয়ে দিল।

তারা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কত চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই লাঙলটা তুলতে পারল না।

ভল্‌গা তখন তার দশজন বগাতীরকে পাঠাল। কুড়ি হাতে তারা ঠেলাঠেলি করেও নড়াতে পারল না।

এবার সব লোক নিয়ে এল ভল্‌গা। এক কম ত্রিশজন লোক সবাই মিলে, চারদিক থেকে টানাটানি করে হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল, কিন্তু লাঙলটাকে এক চুলও নড়াতে পারল না।

তখন ঘোড়া থেকে নিজেই নামল চাষী। একহাতে ধরে একটানে সে লাঙলটা মাটি থেকে তুলে ফেলল। ফাল থেকে মাটি ঝেড়েঝুড়ে ছুঁড়ে দিল গাছের ঝোপের দিকে। মেঘের সমান উঁচুতে উঠে ঝোপ পেরিয়ে ভেজা নরম মাটিতে পড়ে হাতল অবধি ঢুকে গেল লাঙলটা।

কাজ হল, আবার পথ ধরল বগাতীরের দল।

এল ওরা গুর্‌চেভেৎস আর অরেহভেৎস সহরের কাছে। ওখানকার সওদাগররা ছিল ধূর্ত। যেই না চাষীকে দেখা, অমনি তারা অরেহভেৎস নদীর পুলে কাঠের পাটাতনগুলোর তলা কুপিয়ে রেখে দিল।

আর যেই অনুচরদল পুলের উপর উঠেছে অমনি পুলটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। নদীর জলে ডুবতে লাগল বীরেরা, মরতে লাগল সাহসী সৈন্য, তলিয়ে যেতে লাগল ঘোড়া মানুষ।

ভল্‌গা আর মিকুলা গেল ভীষণ রেগে। চাবুক কষে ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা

এক লাফে পেরিয়ে গেল নদী। ওপারে পৌঁছেই শিক্ষা দিতে লাগল দুর্বৃত্তদের।

চাবুক চালায় চাষী, আর বলে:

'ছি-ছি, লোভী সওদাগরের দল, চাষীরা তোদের রুটি জোগায়, মধু খাওয়ায়, আর তোরা এক কণা নুন দিতেও নারাজ।'

আর ভল্‌গা তার অনুচরদের, বগাতীরী ঘোড়াদের শোধ তুলতে লাগল গদা দিয়ে।

গুর্‌চেভেৎস নগরের লোকেরা তখন অনুতাপ করতে লাগল। বলল:

'আমাদের অপকর্ম, আমাদের ছলচাতুরী মাপ করুন। আপনার ভেট নজরানা সব দিয়ে দিচ্ছি। চাষীও যেন নিশ্চিন্তে নুন কেনে। আর এক কাণাকড়িও চাইব না।'

বারো বছরের মতো ভেট নজরানা আদায় করল ভল্‌গা, তারপর দুই বগাতীর বাড়ীর দিকে রওনা হল।

ভল্‌গা চাষীকে বলল:

'রুশ বগাতীর, কী বলে তোমায় ডাকে, কী নামে মান্যি করে?'

চাষী বলল, 'আমার বাড়ী চলো, ভল্‌গা ভ্‌সেস্লাভিয়েভিচ, তাহলেই জানতে পারবে লোকেরা আমায় মান্যি করে কোন নামে ডাকে!'

বগাতীররা ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে সেই মাঠে পৌঁছল। চাষী লাঙলটা টেনে তুলে, সারা মাঠ চষে সোনার বীজ পুঁতে দিল...

সূর্য অস্ত যেতে না যেতে ক্ষেতে তার ঝমঝমিয়ে উঠল ফসল।

অন্ধকার রাত ঘনিয়ে আসতেই চাষী সেই ফসল কেটে নিল। সকালে ঝাড়াই করে, দুপুরবেলা মাড়াই করে, খাওয়ার আগেই পিষে, ময়দা বানিয়ে পিঠে গড়ে সন্ধ্যের মুখেই পাড়ার সব লোকজন ডেকে এক মস্ত ভোজ দিল। পিঠে খেতে লাগল লোকে, বিয়র খেতে লাগল, গুণগান করতে লাগল চাষীর:

'অনেক ধন্যবাদ তোমায়, সেল্যানিনপুত্র মিকুলা!'